মুসলিম শাসনামলে বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের প্রয়োগ ও বিকাশ

গবেষক

নাজলী চৌধুরী
রেজিস্ট্রেশন নং-১৮৭
সেশন-২০১১-২০১২
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বধায়ক

ড. নাজমা বেগম
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারি-২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, **"মুসলিম শাসনামলে বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের প্রয়োগ ও বিকাশ"** শিরোনামের এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ডিগ্রীর জন্য প্রণীত। আমার জানামতে, পূর্বে এ শিরোনামে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। অভিসন্দর্ভটি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি, অথবা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে এর কোন প্রকাশ করা হয়নি।

নাজলী চৌধুরী
পি এইচ ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং:১৮৭
সেশন: ২০১১-২০১২
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, নাজলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে পি এইচ ডি ডিগ্রির জন্য আমার তত্ত্বাবধানে **"মুসলিম শাসনামলে বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের প্রয়োগ ও বিকাশ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছেন। গবেষণাটি মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে রচিত। আমি সম্পূর্ণ পান্ডুলিপিটি পাঠ করেছি এবং পি এইচ ডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

ড. নাজমা বেগম
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
অঙ্গীকারপত্র	i
প্রত্যয়নপত্র	ii
মুখবন্ধ	iii
আলোক চিত্রের তালিকা	vi
সংক্ষেপ	xiv
মানচিত্র	xv
প্রথম অধ্যায়: মুসলিম শাসনামলে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা ও সমাজ চিত্র	১
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাক-মুসলিম আমলে বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির ঐতিহ্য	২৪
তৃতীয় অধ্যায়: বাংলার বাইরে মুসলিম স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণ ঐতিহ্য	৪২
চতুর্থ অধ্যায়: সুলতানী আমলে বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণ (১২০৪-১৫৭৬)	৫২
পঞ্চম অধ্যায়: মুঘল আমলে বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির অংলকরণ (১৫৭৬-১৭৫৭খ্রি.)	১৪২
ষষ্ঠ অধ্যায়: মুসলিম শাসনামলে বাংলায় পোড়ামাটির অলংকরণের ধরন	১৮৩
সপ্তম অধ্যায়: পোড়ামাটির শিল্প নির্মাণ কৌশল	২০২
অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার	২১২
পরিশিষ্ট-১: গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র	২১৭
পরিশিষ্ট-২: শিলালিপি	২২২
পরিশিষ্ট-৩: স্থাপত্য পরিভাষা	২২৫
পরিশিষ্ট-৪: বিভিন্ন প্রতীকসমূহ	২৩০
গ্রন্থপঞ্জি	২৩১

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

আবহমানকাল থেকে পোড়ামাটির শিল্পকলা নদীবিধৌত সমভূমি বাংলার সর্বস্তরের মানুষের প্রাণের শিল্প। নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্র, গৃহসজ্জা, খেলনা, ধর্মীয় কার্যে দেব মূর্তি নির্মাণ, স্থাপত্য নির্মাণ বা অলংকরণে মৃৎ শিল্প বাংলার প্রধান শিল্প মাধ্যম হিসাবে আজও জনপ্রিয়। অলংকরণ হিসাবে পোড়ামাটির শিল্প মুসলিম-পূর্ব যুগ হতে বাংলায় চর্চিত হয়ে আসছে। তবে বাংলায় মুসলিম বিজয়ের পূর্ববর্তী কর্ণাটক থেকে আগত সেন বংশীয় রাজাগণ সেই সময়কার জনপ্রিয় স্থাপত্য অলংকরণের মাধ্যম পোড়ামাটির অলংকরণের পরিবর্তে পাথর খোদাই নকশা ও তার সাথে স্টাকোকে তাদের স্থাপত্য সজ্জার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে সেন শাসনামলে ১০৯৭- ১২২৩ খ্রী: পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছর বাংলার শিল্পকলায় পোড়ামাটির অলংকরণের চর্চা ব্যাহত হয়। মুসলিম শাসনামলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মুসলমানগণ বাংলার পোড়ামাটির শিল্প ঐতিহ্যকে শুধু নিজেদের স্থাপত্যে প্রয়োগ করেননি সেই সাথে এর উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। অলংকরণের পরিকল্পনা, প্রয়োগ ও উপস্থাপনে এই সময় পোড়ামাটির শিল্প এমন এক পর্যায়ে উন্নিত হয় যা বিশ্ব শিল্প ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র জায়গা করে নেয়। এইভাবে স্থাপত্য ক্ষেত্রে পোড়ামাটির অলংকরণ মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতায় রীতি ও চিন্তায় এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে ওঠে। এই শিল্পকলার বিকাশে দেশী-বিদেশী প্রভাবের সংমিশ্রণ, শিল্পসৃষ্টিতে স্থানীয় শিল্পীদের নিয়োগ সেই সাথে বাংলার পরিবেশ ও পরিস্থিতি এই শিল্পকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে বাংলার বাইরে থেকে আগত মুসলিম শাসকদের অভিরূচির সাথে মিলে তা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের সূচনা, স্থাপত্য ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ও বিকাশ নিয়ে এ পর্যন্ত খুব কম গবেষণা-কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। এর মধ্যে যে গবেষণাকর্মগুলো গুরুত্বের দাবী রাখে সেগুলোকেও পুর্ণাঙ্গ বলা চলে না। কেননা এই সকল গবেষণায় শুধুমাত্র মুসলিম অথবা শুধুমাত্র অমুসলিম স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের প্রয়োগকে উপজীব্য করা হয়েছে। স্থাপত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন একটি শিল্পের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করতে হলে সব ধরনের স্থাপত্য অলংকরণে এর প্রয়োগের বিশ্লেষণ প্রয়োজন তা না হলে শিল্প বিকাশের পূর্ণাঙ্গ রূপটি তুলে ধরা সম্ভব নয়। মুসলিম স্থাপত্যে এই শিল্পের পুনরুত্থান ঘটেছিল সত্য তবে পোড়ামাটির শিল্পের চরম বিকাশ বাংলার মন্দিরসমূহেই পরিলক্ষিত হয় । তবে উত্থান ও বিকাশ সবকিছুই ঘটেছিল মুসলিম শাসনকালের মধ্যে। বর্তমান গবেষণায় পোড়ামাটির অলংকরণের প্রয়োগ ও বিকাশের এই ধারাটি খোঁজার প্রয়াশ করা হয়েছে। দুটি ভিন্ন ধর্মীয় আদর্শে নির্মিত স্থাপত্য হয়েও একটি অপরটিকে কিভাবে প্রভাবিত করে পোড়ামাটির শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিল,

Dhaka University Institutional Repository

এই শিল্প বিকাশে প্রচলিত অন্যান্য শিল্পকলা (চিত্রকলা, পাথর খোদাই শিল্প) কি ভূমিকা রেখেছিল এ সমস্ত দিকও গবেষণায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি দীর্ঘ চার বছরের মাঠ পর্যায়ের জরিপ (ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ)ও প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নির্ভরযোগ্য গবেষণা কর্ম, দলিল ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। মুসলিম শাসনামলে নির্মিত পোড়ামাটির অলংকার সমৃদ্ধ স্থাপত্যসমূহ যতদূর সম্ভব গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে। তবে গবেষণার সুবিধার্থে এখানে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত প্রতিনিধিত্বকারী স্থাপত্যসমূহ আলোচিত হয়েছে। বাংলার স্থাপত্যের প্রায় সকল আলোকচিত্র যা এই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে তা জরিপ কার্য পরিচালনার সময় তোলা। তবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যবহৃত কিছু আলোকচিত্র প্রকাশিত গ্রন্থ ও উইকিপিডিয়া ফ্রি এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে চিত্র নম্বর (২.১-২.৪, ২.৬, ২.৭, ২.১০, ২.১২, ৩.১-৩.১১, ৬.১-৬.৪,৬.৯-৬.৯ক, ৬.১১ক, ৬.১৪ক) Wikipedia, the free encyclopedia থেকে, চিত্র নম্বর (২.৫) *Chandraketugarh: A Treasure House of Bengal Terracottas,* চিত্র নম্বর (২.৯, ২.১১ ও ২.১৩) *The Art Heritage of Bangladesh* থেকে নেওয়া।

এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে যাদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও বর্তমান গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড.নাজমা বেগমের নাম উল্লেখ করতে চাই যার সার্বিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা ব্যাতীত এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। তাঁর পান্ডিত্বপূর্ণ উপদেশ, সমস্ত খসড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দূর্লভ গ্রন্থ নিজ সংগ্রহ থেকে প্রদানের মত স্বতস্ফুর্ত সহযোগিতা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়নের কারণে সামগ্রিক বিষয়টি সময় মত সম্পাদন সহজসাধ্য হয়েছে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা জানা নাই। সার্বিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতার জন্য তাঁর নিকট চিরঋণী হয়ে থাকবো।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মাহফুজুল ইসলামসহ বিভাগের সকল শিক্ষক বিশেষ করে অধ্যাপক ড. তৌফিকুল হায়দার, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান , অধ্যাপক আতাউর রহমান বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক খাদেমুল হক ও সহযোগী অধ্যাপক সুরাইয়া আক্তার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরামর্শ ও আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

গবেষণা কাজটি সম্পাদনের জন্য আমাকে বেশ কিছু গ্রন্থাগার ও জাদুঘর ব্যবহার ও পরিদর্শন করতে হয়েছে । এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ পাঠাগার, এম আর তরফদার স্মৃতি জাদুঘর, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও এর গ্রন্থাগার, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম ও এর গ্রন্থাগার, মহাস্থানগড় মিউজিয়াম, পাহাড়পুর মিউজিয়াম, ময়নামতি মিউজিয়াম, ইন্ডিয়াম মিউজিয়াম কলকাতা, গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম ও মালদা মিউজিয়াম ও ট্রাডিশনাল ফটো গ্যালারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম ও আর্কাইভ ব্যবহার ও পরিদর্শনের সময় তাদের কাছ থেকে যে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি সে জন্য আমি তাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

জরিপ কাজের জন্য আমাকে বহু দূর-দূরান্তে অবস্থিত স্থাপত্য পরিদর্শন করতে হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এই সকল স্থানে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে মালদহ জেলার এ্যাডভোকেট ও ইতিহাসবিদ আব্দুস সামাদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । সমগ্র গৌড় ও পান্ডুয়ায় যেভাবে তিনি সার্বক্ষণিক সাথে থেকে জরিপ কাজে সহযোগিতা করেছেন তা অসামান্য । আমি তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যাঁদের সার্বক্ষণিক উৎসাহ আমাকে কর্মশক্তি যুগিয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রফেসর ড. এনামুল হক ও জনাব মুহম্মদ মাসুম আলী খান মজলিসের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। এছাড়া সকল সময়ের বিশ্বস্ত বন্ধু ড.মাসুদ রানা খান সর্ব জটিলতায় পাশে দাঁড়িয়েছেন। বন্ধু নাসির উদ্দিন মবিন , বড় ভাই আশরাফুল কবিরের সহযোগিতাও বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি । সকল নিঃস্বার্থ সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার ছোট ভাই অকাল প্রয়াত ফটোসাংবাদিক কাজী বিপ্লবের প্রতি, যিনি আমার জন্য দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অষ্টগ্রামের কুতুব মসজিদের ছবি তুলে এনে দিয়েছিলেন।

ঘরে-বাইরে, গবেষণা কর্ম ও মাঠ পর্যায়ের জরিপ কর্ম যার সহযোগিতা ছাড়া সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিল তিনি আমার জীবনসঙ্গী জনাব বাবু আহমেদ। প্রতিটি জরিপ কার্যে সাথে থেকে আমার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ছবি তুলে এবং গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দিয়ে যে অন্তরিকতার সাথে সার্বক্ষণিক পাশে ছিলেন এজন্য শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। যার কথা না বললে লেখাটি অসম্পূর্ণ থাকবে সে আমার সন্তান ফাইয়াজ আহমেদ । জরিপ কার্যের সঙ্গী হয়ে এবং আমার গবেষণার ব্যস্ততার কারণে কষ্ট ও অবহেলা সহ্য করে হলেও যে সহযোগিতা সে করেছে তা অসামান্য।

নাজলী চৌধুরী
পি. এইচ. ডি গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্রের তালিকা

১.১. বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র

২.১. বার্নি রিলিফ, দেবী ইস্টারের পোড়ামাটির ভাস্কর্য, মেসপটেমিয়া, ১৮০০-১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ

২.২. সার্কোফেগাস অব স্পাউস, পোড়ামাটির তৈরী ইট্রুস্কান ভাস্কর্য, রোম

২.৩. টেরাকোটা সৈনিক, চীন, ২০৯-১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ

২.৪. পোড়ামাটির উঁচু কুঁজযুক্ত ষাঁড়, সিন্ধু সভ্যতা

২.৫. মৌর্য যুগের পোড়ামাটির নারী মূর্তি, খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ-২য় শতক

২.৬. সুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির যক্ষিণী মূর্তি, খ্রিষ্টপূর্ব ১ম-২য় শতক

২.৭. গুপ্তযুগে নির্মিত পোড়ামাটির আবক্ষ মূর্তি, ৪র্থ-৬ষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ

২.৮. ভিতরগাঁও এর ইটের মন্দির, পঞ্চম শতক

২.৯. পোড়ামাটির যুগল মূর্তি সম্বলিত চক্রাকার ফলক, গুপ্তোত্তর যুগ, ৬ষ্ঠ শতক

২.১০. পোড়ামাটির চিত্রফলকে উৎকীর্ণ মহাকাব্য রামায়নের একটি দৃশ্য , বামন পাড়া, গুপ্তোত্তর যুগ, ৬ষ্ঠ শতক

২.১১. পোড়ামাটির চিত্রফলকে উৎকীর্ণ বিদ্যাধরী, ময়নামতি, ৭ম শতক

২.১২. পোড়ামাটির চিত্রফলক সারি, পাহাড়পুর, ৮ম-৯ম শতক

২.১৩. পোড়ামাটির চিত্রফলক, ভাসুবিহার, ১১শ শতক

৩.১. আরব আতার সমাধি, উজবেকিস্তান, ৯৭৭-৭৮ খ্রিষ্টাব্দ

৩.১ক. পোড়ামাটির অলংকরণ, আরব আতার সমাধি, উজবেকিস্তান, ৯৭৭-৭৮ খ্রিষ্টাব্দ

৩.২. মোঘাক-ই-আত্তারি মসজিদ, উজবেকিস্তান, এগার শতক

৩.২ক. পোড়ামাটির নকশাফলক বসানো স্টাকো অলংকরণ, মোঘাক-ই-আত্তারি মসজিদ, উজবেকিস্তান

৩.৩. কারাখানি সমাধি, কিরগিজিস্তান, বার শতক

৩.৩ক. পোড়া মাটির লতানকশা ও আরবী লিপি, কারাখানি সমাধি, কিরগিজিস্তান, বার শতক

৩.৪. সুলতান সানজারের সমাধি, তুর্কিমিনিস্তান, ১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

৩.৪ক. খিলান গ্যালারি, সুলতান সানজারের সমাধি, তুর্কিমিনিস্তান, ১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

৩.৫. আয়শা বিবির সমাধি, কাজাখিস্তান, এগারো শতক

৩.৫ক. সংলগ্ন স্তম্ভ ও দেয়ালের পোড়ামাটির নকশা, আয়শা বিবির সমাধি, কাজাখিস্তান, এগারো শতক

৩.৬. তৃতীয় মাসুদ ও বাহরাম শাহর বুরুজ, গজনী, এগার-বার শতক

৩.৬ক. মাসুদের বুরুজে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির লতা নকশা ও লিপি, গজনী, এগার-বার শতক

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭. বুরুজ-ই-লাজিম,মাজেন্দ্রান,ইরান,একাদশ শতক

৩.৭ক. পোড়ামাটির লিপি , বুরুজ-ই-লাজিম,মাজেন্দ্রান,ইরান,একাদশ শতক

৩.৮. পীর-ই-আলমদারের সমাধি, দামগান, ইরান,১০২১ খ্রি.

৩.৮ক. প্রবেশ পথের উপরের অলংকরণ, পীর-ই-আলমদারের সমাধি, দামগান, ইরান,১০২১ খ্রি.

৩.৯. চেহেল দুখতারানের সমাধি, দামগান, ইরান, ১০৫৮ খ্রি.

৩.১০. প্রবেশ তোরণ, বায়জিদ বোস্তামীর সমাধি, সিমনান, ইরান, ১১২০ খ্রি.

৩.১০ক. পোড়ামাটির ফলক নকশা, প্রবেশ তোরণ, বায়জিদ বোস্তামীর সমাধি, সিমনান, ইরান, ১১২০ খ্রি.

৩.১১. নাতানজের খানকাহ, ইস্ফাহান, ইরান, ১৩১৬ খ্রি.

৪.১. জাফর খান গাজীর মসজিদ, ত্রিবেনী, হুগলী, ১২৯৮ খ্রি.

৪.২ . দক্ষিণ আইলের মধ্যবর্তী অংশে পোড়ামাটির চিত্রফলকে অলংকৃত দেয়াল, জাফর খান গাজীর মসজিদ, ত্রিবেনী, হুগলী,১২৯৮ খ্রি.

৪.৩. অভ্যন্তরীণ চিত্র, বরী মসজিদ, পান্ডুয়া, হুগলী, ১৩০০খ্রি.

৪.৪. প্রধান মিহরাব, বরী মসজিদ, পান্ডুয়া, হুগলী, ১৩০০খ্রি.

৪.৫. মুসলিম-পূর্ব যুগের পাথরের স্তম্ভ নকশার অনুকরণে ইটের তৈরী পোড়ামাটির ফলকযুক্ত স্তম্ভ, বরী মসজিদ, পান্ডুয়া, হুগলী,১৩০০খ্রি.

৪.৬. প্রধান মিহরাব ফ্রেমের উর্ধ্বাংশ. বরী মসজিদ, পান্ডুয়া, হুগলী, ১৩০০খ্রি.

৪.৭. নামাজগৃহের অভ্যন্তরীণ চিত্র, আদিনা মসজিদ, হযরত পান্ডুয়া, মালদহ, ১৩৬৯খ্রি.

৪.৮. নামাজগৃহের বহির্দেয়াল, আদিনা মসজিদ, হযরত পান্ডুয়া, মালদহ, ১৩৬৯খ্রি.

৪.৯. পোড়ামাটির ফলক ও নকশাকৃত ইটের অলংকরণ, কিবলা দেয়লের খিলান-পটহসমূহ, আদিনা মসজিদ, হযরত পান্ডুয়া, মালদহ, ১৩৬৯খ্রি.

৪.১০. পোড়ামাটির ফলক ও নকশাকৃত ইটের অলংকরণ, কিবলা দেয়লের খিলান-পটহসমূহ, আদিনা মসজিদ, হযরত পান্ডুয়া, মালদহ, ১৩৬৯খ্রি.

৪.১১. পোড়ামাটির ফলক ও নকশাকৃত ইটের অলংকরণ, কিবলা দেয়লের খিলান-পটহসমূহ, আদিনা মসজিদ, হযরত পান্ডুয়া, মালদহ, ১৩৬৯খ্রি.

৪.১২. পোড়ামাটির ফলক ও নকশাকৃত ইটের অলংকরণ, কিবলা দেয়লের খিলান-পটহসমূহ, আদিনা মসজিদ, হযরত পান্ডুয়া, মালদহ, ১৩৬৯খ্রি.

৪.১৩. একলাখী সমাধি, হযরত পান্ডুয়া, মালদহ, আনুমানিক ১৪২৫খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৪. দেয়ালের মাঝবরাবর স্থাপিত উদ্গাত ব্যান্ডের উপর ও নিচের অলংকৃত পাড়-নকশা, একলাখী সমাধি, হযরত পান্ডুয়া, মালদহ, আনুমানিক ১৪২৫খ্রি.

৪.১৫. একই সারিতে অবস্থিত উন্নত ও অবনত দেয়ালের নকশার ভিন্নতা, একলাখী সমাধি, হযরত পান্ডুয়া, মালদহ, আনুমানিক ১৪২৫খ্রি.

৪.১৬. অবনত দেয়ালের নিম্নভাগের পাড় নকশা. একলাখী সমাধি, হযরত পান্ডুয়া, মালদহ, আনুমানিক ১৪২৫খ্রি.

৪.১৭. বহির্দেয়ালের আয়তাকার প্যানেল নকশায় ফুলদানী / গহনা সদৃশ্য স্তম্ভ, একলাখী সমাধি, হযরত পান্ডুয়া, মালদহ, আনুমানিক ১৪২৫খ্রি.

৪.১৮. দাখিল দরওয়াজা, গৌড়, মালদাহ, পনের শতকের প্রথমার্ধ

৪.১৯. প্রবেশপথের উপরে বৃহৎ খিলানের অভ্যন্তর দেয়ালের অলংকরণ, দাখিল দরওয়াজা, গৌড়, মালদাহ, পনের শতকের প্রথমার্ধ

৪.২০. অবনত দেয়ালের খিলান নকশার শীর্ষ হতে ঝুলন্ত পেনডেন্ট, দাখিল দরওয়াজা, গৌড়, মালদাহ, পনের শতকের প্রথমার্ধ

৪.২১. দরাস বাড়ি মসজিদের সম্মুখ চিত্র (উপরে) ও দরাস বাড়ি মসজিদের পশ্চাৎ দেয়ালচিত্র (নিচে) , ফিরোজপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ১৪৭৯ খ্রি.

৪.২২. মিহরাব অলংকরণ, দরাস বাড়ি মসজিদ, ফিরোজপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ১৪৭৯ খ্রি.

৪.২৩.তাঁতী পাড়া মসজিদ, গৌড়, মালদাহ, ১৪৮০ খ্রি.

৪.২৪. প্রবেশপথের অলংকৃত খিলান প্যানেল, তাঁতী পাড়া মসজিদ, গৌড়, মালদাহ, ১৪৮০ খ্রি.

৪.২৫. মিহরাব ফ্রেম অলংকরণ. তাঁতী পাড়া মসজিদ, গৌড়, মালদাহ, ১৪৮০ খ্রি.

৪.২৬. ধুনিচক মসজিদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ,পনের শতকের শেষভাগ

৪.২৭. রাজবিবি মসজিদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ,পনের শতক

৪.২৮. বহির্দেয়ালের অলংকৃত প্যানেলে বিচিত্র স্তম্ভযুক্ত খিলান নকশা, রাজবিবি মসজিদ, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ,পনের শতক

৪.২৯. ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট,পনের শতকের প্রথমভাগ

৪.৩০. কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের খিলান প্যানেলের অলংকরণ, ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট,পনের শতকের প্রথমভাগ

৪.৩১. প্রবেশপথের উপরের পাড় নকশা, ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট,পনের শতকের প্রথমভাগ

৪.৩২ মিহরাব ফ্রেমের নকশা, ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট,পনের শতকের প্রথমভাগ

৪.৩৩. বাবা আদমের মসজিদ, রামপাল, মুন্সিগঞ্জ, ১৪৮৩-৮৪ খ্রি.

৪.৩৪. অবনত দেয়ালের প্যানেল অলংকরণ, বাবা আদমের মসজিদ, রামপাল, মুন্সিগঞ্জ, ১৪৮৩-৮৪ খ্রি.

৪.৩৫. ফিরোজ মিনার, গৌড়, মালদাহ, ১৪১০-১১ খ্রি.

৪.৩৬. গুমতি দরওয়াজা, গৌড় মালদাহ, ১৫১২ খ্রি.

৪.৩৭. সংলগ্ন বুরুজের মিনা করা অংলকরণ, গুমতি দরওয়াজা, গৌড় মালদাহ, ১৫১২ খ্রি.

৪.৩৮. বহির্দেয়ালের প্যানেল অংলকরণ, গুমতি দরওয়াজা, গৌড় মালদাহ, ১৫১২ খ্রি.

৪.৩৯. কার্নিশের রঙিন টালি অলংকরণ, গুমতি দরওয়াজা, গৌড় মালদাহ, ১৫১২ খ্রি.

৪.৪০. লোট্টন মসজিদ, গৌড় মালদাহ, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.

৪.৪১. প্রবেশ পথের উপরের ফ্রেম অলংকরণ, লোট্টন মসজিদ, গৌড় মালদাহ, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.

৪.৪২. প্যানেল অংলকরণ, লোট্টন মসজিদ, গৌড় মালদাহ, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.

৪.৪৩. পার্শ্ব বুরুজের কার্নিশ অংলকরণ, লোট্টন মসজিদ, গৌড় মালদাহ, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.

৪.৪৪. মিহরাব, লোট্টন মসজিদ, গৌড় মালদাহ, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.

৪.৪৫. স্তম্ভ ভিত্তির অলংকৃত ফলক, লোট্টন মসজিদ, গৌড় মালদাহ, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.

৪.৪৬. কদম রসূল, গৌড় মালদাহ, ১৫৩১ খ্রি.

৪.৪৭. বহির্দেয়ালে প্যানেল অলংকরণ, কদম রসূল, গৌড় মালদাহ, ১৫৩১ খ্রি.

৪.৪৮. প্যানেল অংলকরণ, কদম রসূল, গৌড় মালদাহ, ১৫৩১ খ্রি.

৪.৪৯. জাহানিয়ান মসজিদ, গৌড় মালদাহ, ১৫৩৫ খ্রি.

৪.৫০. বাঘা মসজিদ, রাজশাহী, ১৫২৩-২৪ খ্রি.

৪.৫১. মিহরাব, বাঘা মসজিদ, রাজশাহী, ১৫২৩-২৪ খ্রি.

৪.৫২. প্যানেল নকশা, বাঘা মসজিদ, রাজশাহী, ১৫২৩-২৪ খ্রি.

৪.৫৩. মিহরাবের খিলান প্যানেল, বাঘা মসজিদ, রাজশাহী, ১৫২৩-২৪ খ্রি.

৪.৫৪. মিহরাবের খিলান স্তম্ভ অলংকরণ, বাঘা মসজিদ, রাজশাহী, ১৫২৩-২৪ খ্রি.

৪.৫৫. দেশীয় ফলদার বৃক্ষ অলংকৃত প্যানেল, বাঘা মসজিদ, রাজশাহী, ১৫২৩-২৪ খ্রি.

৪.৫৬. শুরা মসজিদ, দিনাজপুর, ১৬ শতকের প্রথম দিক

৪.৫৭. বহির্দেয়ালের প্যানেল নকশা, শুরা মসজিদ, দিনাজপুর, ১৬ শতকের প্রথম দিক

৪.৫৮. মজলিশ আওলিয়া মসজিদ, ফরিদপুর, ১৬ শতকের প্রথম দিক

৪.৫৯. প্রবেশ খিলানের প্যানেল নকশা, মজলিশ আওলিয়া মসজিদ, ফরিদপুর, ১৬ শতকের প্রথম দিক

৪.৬০. বহির্দেয়ালের প্যানেল নকশা, মজলিশ আওলিয়া মসজিদ, ফরিদপুর, ১৬ শতকের প্রথম দিক

৪.৬১. পশ্চাৎ দেয়াল, মজলিশ আওলিয়া মসজিদ, ফরিদপুর, ১৬ শতকের প্রথম দিক

৫.১. কুতুব মসজিদ, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ১৫৫৮ খ্রি.

৫.২. আটিয়া মসজিদ, টাঙ্গাইল, ১৬০৯ খ্রি.

৫.৩. সাদীর মসজিদ, কিশোরগঞ্জ, ১৬৫২ খ্রি.

৫.৪. বরাকর দেউল, বর্ধমান, ১৪৬১ খ্রি.

৫.৫. কোদলা মঠ, বাগেরহাট, ১৬ শতক

৫.৬. দেয়ালের লতাযুক্ত পাড় নকশা, কোদলা মঠ, বাগেরহাট, ১৬ শতক

৫.৭. বৈদ্যপুর কৃষ্ণ মন্দির, বর্ধমান, ১৫৯৮ খ্রি.

৫.৮. প্রবেশপথ, বড় দেউল, বৈদ্যপুর কৃষ্ণ মন্দির, বর্ধমান, ১৫৯৮ খ্রি.

৫.৯. বহির্দেয়ালের পাড় নকশা, বৈদ্যপুর কৃষ্ণ মন্দির, বর্ধমান, ১৫৯৮ খ্রি.

৫.১০. প্রবেশ পথের খিলান প্যানেল অলংকরণ, ক্ষুদ্র দেউল, বৈদ্যপুর কৃষ্ণ মন্দির, বর্ধমান, ১৫৯৮ খ্রি.

৫.১১. পূর্ব দেয়ালের বদ্ধ খিলান প্যানেল অংলকরণ, ক্ষুদ্র দেউল, বৈদ্যপুর কৃষ্ণ মন্দির, বর্ধমান, ১৫৯৮ খ্রি.

৫.১২. পার্শ্ব দেওয়ালের পাড় নকশা, বৈদ্যপুর কৃষ্ণ মন্দির, বর্ধমান, ১৫৯৮ খ্রি.

৫.১৩. ক. মথুরাপুর দেউল, ফরিদপুর, ১৬/১৭ শতক

খ. মহাকাব্যিক দৃশ্য সম্বলিত প্যানেলসমূহ, মথুরাপুর দেউল, ফরিদপুর, ১৬/১৭ শতক

গ. হিংস্র শ্বাপদের অলংকরণ সম্বলিত পাড় নকশা, মথুরাপুর দেউল, ফরিদপুর, ১৬/১৭ শতক

ঘ. মন্দির খাঁজের কীর্তিমুখ সম্বলিত অলংকরণ, মথুরাপুর দেউল, ফরিদপুর, ১৬/১৭ শতক

ঙ. মন্দির ভিত্তির নৃত্যগীত পরিবেশনরত নরনারীর চিত্র সম্বলিত প্যানেল, (অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত), মথুরাপুর দেউল, ফরিদপুর, ১৬/১৭ শতক

চ. মন্দির ভিত্তির নৃত্যগীত পরিবেশনরত নরনারীর চিত্র সম্বলিত প্যানেল, (অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত), মথুরাপুর দেউল, ফরিদপুর, ১৬/১৭ শতক

৫.১৪. শ্যামরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর, ১৬৪৩ খ্রি.

ক. বহির্দেয়ালের প্যানেল অলংকরণ, শ্যামরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর, ১৬৪৩ খ্রি.

খ. রাসলীলার দৃশ্য, শ্যামরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর, ১৬৪৩ খ্রি.

গ. বহির্দেয়ালের প্যানেল অলংকরণ, কৃষ্ণলীলা, শ্যামরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর, ১৬৪৩ খ্রি.

ঘ. প্যানেল অলংকরণ, কৃষ্ণলীলা, শ্যামরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর, ১৬৪৩ খ্রি.

ঙ. প্রবেশ খিলানের প্যানেল নকশা, কৃষ্ণলীলা, শ্যামরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর, ১৬৪৩ খ্রি.

চ. রাম-রাবনের যুদ্ধ দৃশ্য, শ্যামরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর, ১৬৪৩ খ্রি.

ছ. মন্দির ভিত্তি প্যানেল, শ্যামরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর, ১৬৪৩ খ্রি.

৫.১৬. কেষ্ট-রায় জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণপুর, ১৬৫৫ খ্রি.

৫.১৭. ক. খিলান প্যানেল নকশা, কেষ্ট-রায় জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণপুর, ১৬৫৫ খ্রি.

খ. চালা ছাদের নীচে ফ্রিজ অলংকরণ, কেষ্ট-রায় জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণপুর, ১৬৫৫ খ্রি.

গ. মন্দির ভিত্তির প্যানেল অলংকরণ, কেষ্ট-রায় জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণপুর, ১৬৫৫ খ্রি.

ঘ. মন্দির ভিত্তির প্যানেল অলংকরণ, কেষ্ট-রায় জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণপুর, ১৬৫৫ খ্রি.

ঙ. মন্দির ভিত্তির প্যানেল অলংকরণ, কেষ্ট-রায় জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণপুর, ১৬৫৫ খ্রি.

চ. বহির্দেয়ালের প্যানেল অলংকরণ, কেষ্ট-রায় জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণপুর, ১৬৫৫ খ্রি.

ছ. মন্দির ভিত্তির প্যানেল অলংকরণ, কেষ্ট-রায় জোড়বাংলা মন্দির, বিষ্ণপুর, ১৬৫৫ খ্রি.

৫.১৮. কান্তজী মন্দির, দিনাজপুর, ১৭০৪-১৭৫২ খ্রি.

৫.১৯. ক. তিন খিলান প্রবেশ পথের প্যানেল অলংকরণ, কান্তজী মন্দির, দিনাজপুর, ১৭০৪-১৭৫২ খ্রি.

খ. শিকার দৃশ্য ও কৃষ্ণ উপাখ্যানের দৃশ্য, কান্তজী মন্দির, দিনাজপুর, ১৭০৪-১৭৫২ খ্রি.

গ. শিকার দৃশ্য ও শুভাযাত্রা, কান্তজী মন্দির, দিনাজপুর, ১৭০৪-১৭৫২ খ্রি.

৫.২০. স্তম্ভ অলংকরণ, কান্তজী মন্দির, দিনাজপুর, ১৭০৪-১৭৫২ খ্রি.

৫.২১. ইউরোপিয় যুদ্ধ জাহাজের চিত্র সম্বলিত ফলক, কান্তজী মন্দির, দিনাজপুর, ১৭০৪-১৭৫২ খ্রি.

৫.২২. ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া, রাজশাহী, ১৭২২ খ্রি.

৫.২৩. ক. দোচালার নীচের ত্রিকোণাংশে স্থাপিত হিংস্র শ্বাপদের চিত্র সম্বলিত ফলক, ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া, রাজশাহী, ১৭২২ খ্রি.

খ. বহির্দেয়ালের প্যানেল অলংকরণ, ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া, রাজশাহী, ১৭২২ খ্রি.

গ. বহির্দেয়ালের প্যানেল অলংকরণ, ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া, রাজশাহী, ১৭২২ খ্রি.

ঘ. বহির্দেয়ালের প্যানেল অলংকরণ, ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া, রাজশাহী, ১৭২২ খ্রি.

ঙ. বিভিন্ন দেব-দেবীর ভাস্কর্য সম্বলিত প্যানেল, ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া, রাজশাহী, ১৭২২ খ্রি.

চ. নৃত্যরতা রমণীর চিত্র সম্বলিত ক্ষুদ্র ফলক, ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া, রাজশাহী, ১৭২২ খ্রি.

ছ. প্রবেশ খিলানের উপরোস্থিত প্যানেল অলংকরণ, ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া, রাজশাহী, ১৭২২ খ্রি.

৫.২৪. কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা বর্ধমান, ১৭৫১ খ্রি.

৫.২৫. স্তম্ভ ভিত্তির অলংকরণ, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা বর্ধমান, ১৭৫১ খ্রি.

৫.২৬. মন্দির ভিত্তি অলংকরণ, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা বর্ধমান, ১৭৫১ খ্রি.

৫.২৭. মন্দির ভিত্তি অলংকরণ, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা বর্ধমান, ১৭৫১ খ্রি.

৫.২৮. মন্দিরকোণে স্থাপিত 'মৃত্যুলতা' অলংকরণ, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, কালনা বর্ধমান, ১৭৫১ খ্রি.

৬.১. সারিবদ্ধ অলংকৃত ফলক, পাহাড়পুর বৌদ্ধ মন্দির, অষ্টম শতক

৬.২. বহুলাড়া দেউল, বাঁকুড়া, ১১ শতক

৬.৩. মল্লবীরের চিত্র সম্বলিত ফলক, বহুলাড়া দেউল, বাঁকুড়া, ১১ শতক

৬.৪. পারসিক লতা অলংকরণ, মাসুদের বুরুজ, গজনী, ১০৯৯-১১১৫ খ্রি.

৬.৫. বহির্দেয়ালের ঝুলন্ত মালা ও টারসেল অলংকরণ পাড়, আদিনা মসজিদ, মালদাহ, ১৩৬৯ খ্রি.

৬.৬. ফ্রিজের ঝুলন্ত মালা ও টারসেল অলংকরণ পাড়, বহুলাড়া দেউল, বাঁকুড়া, ১১ শতক

৬.৭. মুসলিম-পূর্ব যুগের পাথরের স্তম্ভের ঝুলন্ত মালা ও টারসেল অলংকরণ, বরী মসজিদ, পান্ডুয়া, ১৩০০ খ্রি.

৬.৮. বহির্দেয়াল, আদিনা মসজিদ, পান্ডুয়া, ১৩৬৯ খ্রি.

৬.৯. বহির্দেয়াল, ধর্মযোগী মন্দির, পাগান, মায়ানমার, ১১ শতক

৬.৯ ক. বহির্দেয়াল, ধর্মযোগী মন্দির, পাগান, মায়ানমার, ১১ শতক

৬.১০. অলংকৃত খিলান হতে ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা, আদিনা মসজিদ

৬.১১ ক. মন্দির শীর্ষে বহির্দেয়ালে বৌদ্ধ মূর্তি সম্বলিত খিলান প্যানেল নকশা, আনন্দ মন্দির, পাগান, মায়ানমার

৬.১১ খ. বহির্দেয়ালের ঝুলন্ত প্রদীপ সম্বলিত খিলান প্যানেল নকশা, আদিনা মসজিদ

৬.১১ গ. বহির্দেয়ালের ঝুলন্ত প্রদীপ সম্বলিত খিলান প্যানেল নকশা, আদিনা মসজিদ

৬.১২. মিহারাব কুলঙ্গিতে ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা, ঈমামজাদে মসজিদ, ভেরামিন, ইরান, ১২৬৪ খ্রি.

৬.১৩. বহির্দেয়ালের প্যানেলে প্রান্তহীন ফিতার বুনোট নকশা সম্বলিত ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা, আদিনা মসজিদ

৬.১৩ ক. বহির্দেয়ালের প্যানেলে প্রস্ফুটিত পদ্ম নকশা সম্বলিত ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা, আদিনা মসজিদ

৬.১৩ খ. বহির্দেয়ালের প্যানেলে পদ্মের পার্শ্ব নকশা সম্বলিত ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা, আদিনা মসজিদ

৬.১৩ গ. বহির্দেয়ালের প্যানেলে মঙ্গল ঘট নকশা সম্বলিত ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা, আদিনা মসজিদ

৬.১৩ ঘ. বহির্দেয়ালের খিলান নকশায় পদ্ম ফুলের নকশায় নির্মিত ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা, আদিনা মসজিদ

৬.১৩ ঙ. বহির্দেয়ালের প্যানেলে মঙ্গলঘট নকশা সম্বলিত ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা, আদিনা মসজিদ

৬.১৪. মন্দির ভিত্তি প্যানেলে সিমূর্গের চিত্র সম্বলিত প্যানেল অলংকরণ, কৃষ্ণরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর

৬.১৪ ক. মুঘল চিত্রকলায় সিমুর্গের চিত্র

৬.১৫. পারসিক পোষাক পরিহিত মানব চিত্র, কৃষ্ণরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর

৬.১৬. অতি সুক্ষ্ম নকশায় অলংকৃত প্যানেল, শ্যাম রায় মন্দির, বিষ্ণুপুর

Dhaka University Institutional Repository

৬.১৭. খিলানযুক্ত প্যাভিলিয়নে দন্ডায়মান দেব মূর্তি, কান্তজী মন্দির, দিনাজপুর

৬.১৮. শোভাযাত্রা, মন্দির ভিত্তি, কান্তজী মন্দির, দিনাজপুর

৬.১৯. বাজপাখী হাতে দন্ডায়মান রাজপুরুষ, কান্তজী মন্দির, দিনাজপুর

৬.১৯ ক. বাজপাখী হাতে দন্ডায়মান রাজপুরুষ, মুঘল চিত্রকলা

৬.২০. মৃত্যুলতা, লালজী মন্দির, কালনা বর্ধমান, ১৭৩৯ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষেপ

সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত সাময়িকীসমূহের পূর্ণ নাম:

ASI-	*Archaeological Survey of India*
ASIAR-	*Archaeological Survey of India, Annual Reports*
ASIR-	*Archaeological Survey of India Reports*
BPP-	*Bengal Past & Present*
JASB-	*Journal of the Asiatic Society of Bengal*
JASP-	*Journal of the Asiatic Society of Pakistan*
JIBS-	*Journal of the Institute of Bangladesh Studies*
JISOA-	*Journal of the Indian Society of Oriental Art*
JPASB-	*Journal of the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*
JRASB-	*Journal of Royal Asiatic Society of Bengal*
JVRM-	*Journal of the Varendra Research Museum*
PASB-	*Proceedings of Asiatic Society of Bengal*

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম শাসনামলে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা ও সমাজ চিত্র

যে কোন দেশের সামাজিক সংস্কৃতিক ইতিহাস এর ভৌগোলিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। একটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক সীমা অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং জলবায়ু সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, আচরন এবং আশা-আকাঙ্খাকে প্রভাবিত করে। তাই মুসলিম শাসনামলে বাংলার শিল্পকলা নিয়ে গবেষণা করতে হলে সেই সময় এই অঞ্চলের ভৌগলিক সীমারেখা নিয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়।[১] এই সময় 'বাংলা' বা 'বাঙালা' নামে একক শাসিত কোন দেশ ছিল না।[২] বখতিয়ারের প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই- সিরাজ[৩] বরেন্দ্র , রাঢ় এবং বঙ্গ নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল চিহ্নিত করেন।[৪] মিনহাজের বর্ণনায় বাংলা সম্বন্ধে তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লখনৌতি ও বঙ্গকে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং যথাক্রমে উত্তর ও পশ্চিম বাংলা এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে বুঝিয়েছেন। তিনি বঙ্গের সাথে সমতট (সকানত) এর উল্লেখও করেন।[৫]

ঐতিহাসিক জিয়া-উদ-দীন বারানী (১২৬৬-১৩৫৭) সর্ব প্রথম দেশের অংশবিশেষ হিসাবে 'বাঙ্গালা' শব্দের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সমগ্র দেশ নয় , এর অংশ বিশেষের উল্লেখ প্রসঙ্গে যথা - 'ইকলিম লখনৌতি' বা 'দিয়ার লখনৌতির' পাশাপাশি 'ইকলিম বাঙ্গালা' বা 'দিয়ার বাঙ্গালা'র উল্লেখ করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি পূর্ব বাংলাকেই নির্দেশ করেছেন।[৬] তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ সুলতান শামস্-উদ-দীন ইলিয়াস শাহকে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা' 'শাহ্-ই-বাঙ্গালিয়ান' বা 'সুলতান-ই-

---

১. Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204- 1760*, Delhi, Oxford University Press, 1994, p.32

২. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ.১

৩. মীনহাজ-ই-সিরাজ এর পুরো নাম আবু উমর মিনহাজ-উদ-দীন ওসমান বিন সিরাজ-উদ-দীন মোহাম্মদ আল জোয্জানী। মিনহাজ তাঁর লিখিত *তবকাত-ই-নাসিরী* গ্রন্থে বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে একটি অধ্যায় সংযোজন করেন। তিনি মালিক ইউজ-উদ-দীন তুগরল তুগান খানের সময় (১২৩৩-১২৪৪) বাংলায় আগমন করেছিলেন এবং বখতিয়ার খলজির সময়কার সৈনিকদের মধ্যে মুতামিদ-উদ-দৌলা নামক এক ব্যক্তির নিকট হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। বাংলার মুসলিম শাসনের লিখিত ইতিহাসের মধ্যে মিনহাজের *তবকাত-ই নাসিরী* সর্ব প্রাচীন।

৪. মীনহাজ-ই-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনুদিত ও সম্পাদিত), ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০৭ (প্রথম প্রকাশ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩) পৃ. ৭৩-৭৪; আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১

৫. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৬.*প্রাগুক্ত* .

বাঙ্গালা' রূপে আখ্যা দিয়েছেন।[১] ইলিয়াস শাহ্ই সর্বপ্রথম তিনটি শাসন কেন্দ্র লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও - এ নিজ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন । সুতরাং একথা বলা চলে যে আফীফ 'বাঙ্গালা' বলতে এই তিনটে শাসন কেন্দ্রের অধীনে থাকা অঞ্চলকেই বুঝিয়েছেন । ইলিয়াস শাহের সময়ই বাঙ্গালা তার ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । ইতোপূর্বে , এমনকি মুসলিম-পূর্ব যুগে,এই ব্যাপক অর্থে 'বাংলা' বা 'বাঙ্গালা'র ব্যবহার পাওয়া যায় না। ঐ সময় 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গাল' দ্বারা বাংলার অংশ বিশেষকে নির্দেশ করা হতো।[২]

মুঘল আমলে এই ভূভাগই 'সুবা বাঙ্গালা' বলে চিহ্নিত হয়েছিল। আবুল ফজল এই প্রদেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে, অর্থাৎ উত্তরে পর্বত মালা হতে দক্ষিণে হুগলী জেলার মান্দারান পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এই 'সুবা' পূর্বে ও উত্তরে পর্বত বেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্র বেষ্টিত ছিল। এর পশ্চিমে ছিল সুবা বিহার । কামরূপ ও আসাম সুবা বাংলার সীমান্তে অবস্থিত ছিল।[৩]

ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই ভূখন্ডের একটি আঞ্চলিক সত্তা ছিল এবং ভূগোলবিদগণও এই উপমহাদেশের মধ্যে 'বাংলা'কে একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বলে স্বীকার করেছেন।[৪] প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা; উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপালের তরাই অঞ্চল; পশ্চিমে রাজমহল ও ছোটনাগপুর পর্বতরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই বিস্তৃত সমভূমির দক্ষিণদিক সাগরাভিমুখে ঢালু এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার জলরাশি দ্বারা বয়ে আনা বিপুল পরিমাণ পলি সাগরে উৎসারিত। সমুদ্রোপকূলবর্তী নিম্নভূমি জঙ্গালাকীর্ণ। এর পেছনেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল সমভূমি, যার গঠনে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা প্রবাহের অবদান রয়েছে। এই বিস্তৃত সমভূমির মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চল (৩০০০ বর্গমাইল) নিকটবর্তী প্লাবন ভূমির তুলনায় গড়ে ৬ ফুট উঁচু এবং এর মাঝামাঝিই রয়েছে ময়নামতি পাহাড়। সিলেট অঞ্চলও গড়ে প্রায় ১০ ফুট উঁচুএবং এরই দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত প্লাইস্টোসিন যুগে সুগঠিত মধুপুর উচ্চভূমি। এই উচ্চভূমির উত্তর পশ্চিম বিস্তৃতিই হচ্ছে 'বরেন্দ্র' বা 'বারিন্দ' এলাকা। ব্রহ্মপুত্র নদী (যমুনা প্রবাহ)

---

১. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত.*

২. *প্রাগুক্ত.*

৩. H. S.Jarrett (tr.), *Ain-i-Akbari*,vol-2, Calcutta, 1948-49, p.116

৪. O.H. Spate, A.T.A. Learmonth & B.H. Farmer, *India, Pakistan and Ceylon,* London, The Regions, 1972, pp. 571-599.

বরেন্দ্রের পূর্ব সীমা এবং এর প্রবাহই এই উচ্চভূমিকে মধুপুরের উচ্চভূমি থেকে ভাগ করেছে। পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পাহাড় সংলগ্ন উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত প্লাইস্টোসিন ভূভাগ রয়েছে।[১] নদীমাতৃক বাংলাদেশে , বিশেষত নিম্নবঙ্গে নদীর সংখ্যা এত বেশী যে, এই অঞ্চলের প্রতি ২৫ মাইলের মধ্যে ছোট বড় নদী দেখতে পাওয়া যায়। বৃহৎ নদীগুলি বাংলাদেশকে স্বাভাবিক ভাবে চার ভাগে ভাগ করেছে। গঙ্গা নদীর (পদ্মা) উত্তরে এবং ব্রক্ষ্মপুত্রনদের পশ্চিমে বিরাট ভূখন্ড,যা এখন রাজশাহী বিভাগের সথে অভিন্ন। প্রাচীনকালে তা পুন্ড্রবর্ধন নামে এবং মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গা নদীর ভাগীরথী শাখার পশ্চিম এলাকা রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। ভাগীরথীর পূর্বে এবং ব্রক্ষ্মপুত্র ও মেঘনা বিধৌত এলাকা, অর্থাৎ খুলনা এবং ঢাকা বিভাগ বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল; মেঘনার পূর্বে বর্তমান চট্টগ্রাম বিভাগকে নিয়ে সমতট এলাকা বিস্তৃত ছিল।[২]

একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত হলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ভৌগোলিক অবস্থার সাদৃশ্য ছিল না। বরেন্দ্র এলাকা অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং সেখানে খরস্রোতা নদীর সংখ্যা কম। আবহাওয়ার দিক দিয়ে উত্তর ভারতের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। রাঢ় এলাকাও বরেন্দ্রের মত উঁচু এবং সেখানেও পূর্ব বাংলার তুলনায় নদীর সংখ্যা কম। কিন্তু বঙ্গ ও সমতট এলাকা নীচু ও অসংখ্য নদী-নালা বেষ্টিত। বছরের অধিকাংশ সময় বঙ্গ ও সমতট এলাকা পানির নীচে ডুবে থাকে। এ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেশী। বাংলার বিস্তীর্ণ ভূভাগ নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত এবং পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব বাংলার কিছু অংশ ছাড়া বাংলার প্রায় সবটাই ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে নতুন ভাবে সৃষ্ট। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বদিকের সীমান্তবর্তী পর্বতমালা ছাড়া বাকি সবটাই সমতলভূমি এবং সমস্ত ভূভাগই নদী বিধৌত বদ্বীপ। বাংলার বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম এবং মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ, ছোটনাগপুর পর্বত শাখারই বিস্তৃতি। এই ভূভাগের অন্তঃস্থলে কঠিন এবং উপরিভাগে সামান্য পলি। মেদিনীপুরের পূর্বাংশ 'পিডমন্ট' সমভূমি। উত্তরে তরাই অঞ্চল থেকে দক্ষিণে পদ্মার প্রবাহ এবং পশ্চিমে গঙ্গা-পদ্মা থেকে পূর্বে ব্রক্ষ্মপুত্র পর্যন্ত ভূভাগ, কিংবা ব্রক্ষ্মপুত্র- সুরমা অন্তর্বর্তী ভূভাগ মূলত পাললিক প্রকৃতির, তবে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। উত্তর পূর্ব ও পূর্বে অবস্থিত সিলেট- ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম পর্বতমালা 'টারশিয়ারী' পাহাড়। উত্তরে পদ্মা, পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বে মেঘনা এবং দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ মূলতঃ প্লাবন সমভূমি এবং গঙ্গা-ব্রক্ষ্মপুত্র দ্বারা গঠিত বদ্বীপ। তাই প্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বাংলাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় – ১. উত্তর

১. আবদুল মমিন চৌধুরী, 'বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়', *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, আনিসুজ্জআমান (সম্পা.), প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১২

২. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

বাংলার পাললিক সমভূমি, ২. ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মধ্যবর্তী ভূভাগ, ৩. ভাগীরথী ও মেঘনার অন্তর্বর্তী বদ্বীপ, ৪. চট্টগ্রামাঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্য এলাকা এবং ৫.বর্ধমানাঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্য এলাকা।[১]

বাংলার ভূপ্রকৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এখানকার নদ-নদীসমূহের। প্রধান নদীগুলো এই অঞ্চলকে মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত করেছে : উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বভাগ। প্রত্যেকটি ভাগেরই যেমন রয়েছে নিজ নিজ ভৌগোলিক সত্ত্বা, তেমনি আছে তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

নদনদী

বাংলাদেশের প্রধান নদী দুইটি গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র। এই নদী দুইটি তার শাখা-প্রশাখা দিয়ে সমগ্র বাংলাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে রেখেছে। নদীর প্লাবনের ফলে বিস্তর পলি মাটি পড়ে; এতে একদিকে যেমন জমি উর্বর হয় এবং অধিক শস্য ফলে তেমনি প্লাবনের ফলে ফসলের ক্ষতিও হয়। এই নদীগুলো বিভিন্ন সময় তাদের গতি পরিবর্তন করে । এই গতি পরিবতনের কারণে শহর-বন্দর নদীগর্ভে বিলীন হয় আবার নতুন গতিপথ অনুসারে গড়ে ওঠে নতুন শহর-বন্দর। বাংলার নদীসমূহ সতত গতি পরিবর্তনশীল। ষোল শতকের জ্যা ডি বারসের, সতের শতকে ফনডেন ব্রুকের[২] এবং আঠারো শতকে রেনেলের মানচিত্রে বাংলার নদীগুলোর গতিপথ অনেকটা স্পষ্ট। তবে এর পূর্বের অবস্থা সম্বন্ধে জানার জন্য আমাদের কাছে খুব বেশী নির্ভরযোগ্য তথ্য নাই।

গঙ্গা : গঙ্গা বাংলার নদীগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। এই নদী রাজমহলের নিকট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এর পাশেই অবস্থিত তেলিয়াগড় ছিল সেই সময়ে বাংলার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক সুদৃঢ় ঘাঁটি। সম্ভবত এই কারণেই মুসলিম বাংলার সকল রাজধানী এই গঙ্গা নদীর গতি অনুসারেই স্থাপিত হয়েছিল। গৌড় , লখনৌতি, পান্ডুয়া, তান্ডা, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি গঙ্গা তীরবর্তী শহরগুলো পর্যায়ক্রমে রাজধানী শহরে পরিণত হয়। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত গঙ্গা নদীর গতিপথ বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে। মুসলমান আমলে গঙ্গা নদী বর্তমান গতিপথ হতে আরও উত্তরে এবং উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত ছিল এবং গৌড় গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তা ক্রমে দক্ষিণ দিকে সরে বর্তমান গতি পথে প্রবাহিত হয়। গৌড়ের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলার ছবঘাটির নিকট বর্তমান গঙ্গানদী দুইটি শাখায় বিভক্ত হয় - এর একটি শাখা ভাগীরথী নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এবং এর দ্বিতীয় শাখা পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। ত্রিবেণীতে ভাগীরথী তিনটি শাখায়

১. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

২. R.C. Majumdar (ed.), *History of Bengal*, vol. I, Dacca, The University of Dacca, 1943, p.4

বিভক্ত হয়েছে - এর একটি সরস্বতী যা সাতগাঁও এর পাশ দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত। সরস্বতীর তীরে অবস্থিত সাতগাঁও সুলতানী আমলে একটি বর্ধিষ্ণু বন্দর ছিল। বিদেশী বণিকেরা এই বন্দরে কেনাবেচা করতেন। কিন্তু নদী খাত ভরাট হয়ে যাওয়ায় ষোল শতকের শেষ দিক হতে সাতগাঁও এর পূর্ব মর্যদা হারিয়ে ফেলে। ভাগীরথীর দ্বিতীয় শাখা যমুনা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং মূলধারাটি হুগলী নাম নিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত পদ্মা ও কয়েকবার তার গতি পরিবর্তন করেছে । ঐতিহাসিক আবুল ফজল এর বিবরণ ও আনুমানিক ১৫৫০ সালে অঙ্কিত জ্যা ডি ব্যারসের মানচিত্র অনুসারে পদ্মা নদী চট্টগ্রামের নিকট সমুদ্রে পতিত হয়। কিন্তু এর একশ বছর পরে অঙ্কিত ফনডেন ব্রুকের মানচিত্রে দেখা যায় যে, পদ্মা এখন আর চট্টগ্রামের নিকট সমুদ্রে পতিত না হয়ে ফরিদপুরের কাছে এসে দক্ষিণে মোড় নিয়েছে এবং বাখরগঞ্জ জেলায় (বরিশাল) অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে।[১] পদ্মার আর একটি শাখা ধলেশ্বরী নাম ধারণ করে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় এবং উত্তর দিক থেকে আগত যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। ধলেশ্বরী ও যমুনার মিলিত ধারা আবার বুড়ীগঙ্গার সাথে মিশে 'কত্‌রাব' নামক স্থানে লক্ষ্যা নদীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং আরও কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে উত্তর দিক থেকে আসা ব্রক্ষ্মপুত্রের সঙ্গে মিলে যায়। এই নদীগুলোর মিলিত ধারা মেঘনা নামে শাহবাজপুর খাতে সমুদ্রে পতিত হয়।[২]

ব্রক্ষ্মপুত্র : বাংলার নদী সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান প্রবাহ ব্রক্ষ্মপুত্র নদ। তিব্বতের মানস সরোবরে এর উৎপত্তি। বাংলার উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এ নদী প্রবাহিত হচ্ছে। রংপুর ও কুচবিহারের সীমান্ত দিয়ে ব্রক্ষ্মপুত্র নদ বাংলায় প্রবেশ করেছে। এরপর গারো পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে ব্রক্ষ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করে এবং দক্ষিণে দেওয়ানগঞ্জ ও জামালপুর এবং উত্তরে শেরপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরপর ঢাকা জেলায় প্রবেশ করে পূর্ব দিকে লাঙ্গলবন্দের নিকট এবং সোনারগাঁও এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্রক্ষ্মপুত্র নদ ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়। আনুমানিক ষোল শতক পর্যন্ত ব্রক্ষ্মপুত্রের এই গতি অব্যহত থাকে কিন্তু পরে গতি পরিবর্তন করে ভৈরববাজারে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়।

মেঘনা : বাংলার পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী প্রবাহ মেঘনা,গঙ্গা-পদ্মা বা ব্রক্ষ্মপুত্রের তুলনায় মেঘনা আকারে ছোট নদী। খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পর্বতমালা হতে এই নদীর উদ্ভব। এর উত্তর প্রবাহের নাম সুরমা। সুরমা

---

১. R.C. Majumdar (ed.), *Ibid*., p. 4
২. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৫

মাকুলির নিকট হতে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নামে পরিচিত হয়। মেঘনা নদী সিলেট, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ হয়ে ভৈরববাজারের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মিলিত ধারা মেঘনা নামে সমুদ্রে পতিত হয়েছে।

করতোয়া : উত্তরবঙ্গে করতোয়া নদী প্রাচীনকাল হতেই একটি বড় নদী হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। হিমালয় পর্বতে উৎপন্ন হয়ে করতোয়া ভূটান সীমান্তের কাছ দিয়ে দার্জেলিং, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। করতোয়ার উত্তরাংশ তিস্তা নামে পরিচিত। জলপাইগুড়ি হতে তিস্তা তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত সর্ব পূর্বের শাখাটি করতোয়া নামে, মধ্যের ধারাটি আত্রেয়ী এবং পশ্চিমের ধারাটি পুনর্ভবা নামে পরিচিত।[১]

কুশী ও মহানন্দা : বর্তমানে কুশী এবং মহানন্দা নদী দুটি পুর্ণিয়া জেলার ভিতর দিয়ে গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অতীতে বিভিন্ন সময় এই নদীগুলোও তাদের গতি পরিবর্তন করেছে। কুশী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত ছিল এবং ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে কুশী নদীর পূর্ব ধারার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। নদীর গতি পরিবর্তন বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে বাংলায় বহু শহর-বন্দরের যেমন উত্থান হয়েছে তেমনি বিলীন হয়েছে বহু জনপদ, নিশ্চিহ্ন হয়েছে অনেক শহর বিরান হয়েছে বহু বন্দর।

জলবায়ু

ঐতিহাসিক আবুল ফজল বাংলাদেশের জলবায়ু সম্পর্কে বলেন যে, গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে গরম খুব প্রখর নয় এং শীতকালও বেশীদিন টিকে না। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সাধারণত বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ মাসে বৃষ্টিপাত শুরু হয় , প্রায় ছয় মাসের বেশী সময় বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকে এবং ঐ সময়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা জলমগ্ন থাকে।[২] আবুল ফজলের বিবরন বাংলার আবহাওয়া সম্বন্ধে এখনও প্রযোজ্য।

বাংলায় মুসলিম শাসনের বিস্তার ও প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহ

উত্তর ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার (১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) এক দশকের মধ্যে বাংলায় মুসলমানদের আগমন ঘটে (১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)। মুসলিম বিজয়ের পর প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলায় মুসলিম শাসন এর উত্তর ও পশ্চিমাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনাকারী বখতিয়ার খলজী লক্ষণাবতীকে (যা প্রাচীন বাংলায় গৌড় নামে প্রসিদ্ধ ছিল) তার শাসনকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই লক্ষণাবতীই

১. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
২. Abul Fazal, *Ain-i-Akbari*, H. S. Jarrett (tr.), vol-2, Calcutta, Asiatic Society, 1949, p.132

মুসলমানদের লাখনৌতি।[১]এর পর দেবকোট (বর্তমান দিনাজপুর জেলার দেবীকোট) আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে। মুসলিম সম্প্রসারণের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় এবং পরে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বিস্তার লাভ করে। বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী থেকে আলী মর্দান খলজী (১২০৪- ১২১০ খ্রি.) পর্যন্ত বাংলার পূর্বসীমা বরেন্দ্র, এর উত্তরে দেবকোট ও পূর্বে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২] গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী এর সময় (১২১২-১২২৭ খ্রি.) বীরভূম জেলার অজয় নদী পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম রাজ্য সীমা বিস্তার লাভ করে। বাংলায় বলবানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ বুগরা খানের পুত্র সুলতান রুকন-উদ-দীন কাইকাউস (১২৯১-১৩০০ খ্রি.) এর শাসনামলে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয় এবং হুগলী জেলার সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম মুসলিম শাসন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে। চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকেই সুলতান শামস-উদ-দীন ফীরুজ শাহ (১৩০১-১৩১৬ খ্রি.) বঙ্গ অধিকার করেন।[৩] এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এই অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে সোনারগাঁও। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ সোনারগাঁও এ নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষনা করেন। তাঁর আমলেই (১৩৩৮- ১৩৪৯ খ্রি.) চট্টগ্রামে মুসলিম শাসন বিস্তৃত হয়। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম একশত বছরের মধ্যে এই অঞ্চলে তিনটি শাসনকেন্দ্র গড়ে উঠে ১. উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় লাখনৌতি ২. দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় সাতগাঁও এবং ৩. পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সোনারগাঁও। ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলায় তার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এই তিনটি শাসন কেন্দ্র কখনও একই শাসকের অধীনস্ত ছিলনা।[৪] সুলতান ইলিয়াস শাহই সর্ব প্রথম এই তিনটি শাসন কেন্দ্রেকে একই প্রশাসনের আওতায় এনে ভারত উপমহাদেশের এই অঞ্চলটিকে বাঙ্গালা নামে পরিচিত করান।[৫] মুঘল আমলে বাংলার এই সীমারেখা অক্ষুন্ন থাকে।

সুলতানী আমলে বাংলার মূল কেন্দ্র হিসাবে উপরোক্ত তিনটে অঞ্চলেরই প্রাধান্য ছিল। তবে শাসন কাজের সুবিধার জন্য আরও কিছু ভাগের সৃষ্টিকরা হয়েছিল। সুলতানী আমলের আবিস্কৃত বিভিন্ন মুদ্রা

১. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
২. আব্দুল করিম,*প্রাগুক্ত*, পৃ.৯২
৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৫
৪. আব্দুল মুমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
৫. *প্রাগুক্ত*

হতে এই সময় বাইশটি টাকশালের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুঘল আমলে সুবা বাঙ্গালা চব্বিশটি সরকারে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে উনিশটি সরকার বাংলায় এবং বাকী পাঁচটি উড়িষ্যার অন্তর্গত।[১]

মুসলিম শাসনামলে বাাংলায় যে প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলো বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল সেগুলো হল:

লখনৌতি: রাজমহল থেকে ২৫ মাইল দূরে গঙ্গা-মহানন্দার সঙ্গমস্থলে এই নগর গঙ্গার তীরে প্রায় ১৪-১৫ মাইল বিস্তৃত ছিল। সেন শাসনামলের শেষ দিকে সেন সম্রাট লক্ষণসেন লক্ষণাবতী নামে গঙ্গার তীরে যে শহর গড়ে তুলেন তুর্কী সুলতানদের আমলে সেটাই গৌড়-লাখনৌতি শহর গড়ে উঠে।[২] মুসলিম শাসনের প্রথম পর্যায়ে এই শহরই ছিল সুলতানী শাসনের কেন্দ্র।

সাতগাঁও: দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার বিখ্যাত বন্দর নগরী ছিল সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম। ভাগীরথী থেকে যমুনা ও সরস্বতী নদীদ্বয় বেরিয়ে যাওয়ার স্থান থেকে ত্রিবেনী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সপ্তগ্রাম শহর।[৩] ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে সাতগাঁও - ত্রিবেনীতে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল এবং পরবর্তী কালে সাতগাঁও এ আঞ্চলিক প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কাল (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল সাতগাঁও । ষোল শতকের শেষভাগে সরস্বতী নদীর প্রবাহ ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার কারণে সাতগাঁও তার সমৃদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং এর স্থলে হুগলী এই অঞ্চলের প্রধান বন্দর হিসাবে বহির্বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করে।[৪]

সোনারগাঁও: সোনারগাঁও মধ্যযুগে বঙ্গের একটি প্রধান নগর । ইতোপূর্বে বিক্রমপুর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নগর হিসাবে পরিগণিত হত। বিক্রমপুর হতে প্রকাশিত সর্বশেষ তাম্রশাসন ছিল দুনুজ মাধব দশরথ দেবের আদাবাড়ি তাম্রলিপি।[৫] আবদুল মমিন চৌধুরী এই দনুজ মাধব দেবকে সোনারগাঁও এর রাজা রায় দনুজের সাথে অভিন্ন হওয়ার সম্ভবনার কথা বলেছেন।[৬] এই অনুমান সঠিক হলে তেরো শতকেই সোনারগাঁও নগরের উত্থান হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। ১২৮১-৮২ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন যখন বাংলার তৎকালীন বিদ্রোহী শাসক তুঘরীলকে দমন করার উদ্দ্যেশে বাংলা আক্রমন করেন তখন তিনি সোনারগাঁও-এর রাজা রায় দনুজের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। চতুর্দশ শতকের প্রথমদিক থেকেই সোনারগাঁও মুসলিম সুলতানদের টাকশাল হিসাবে মুদ্রায়

---

১. Abul Fazal, *Ibid*., p.141
২. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪০
৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
৪. *প্রাগুক্ত*,
৫. N.G. Majumdar, *Inscriptions of Bengal*, vol. III, Rajshahi, The Varendra Research Society, 1929, pp.181-182
৬. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪০

উল্লেখিত রয়েছে।[১] মুঘল আমলে সোনারগাঁও ছিল সুবা বাঙ্গালার উনিশটি সরকারের একটি । সপ্তদশ শতকে সোনারগাঁও বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খান ও মুসা খানের রাজধানী হিসাবে পরিচিতি লাভ **করে।** পরবর্তী কালে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর গতি পরিবর্তন ও মুঘল আমলে ঢাকাকে সুবা বাঙ্গালার রাজধানীতে পরিণত করার প্রেক্ষিতে সোনারগাঁও এর গুরুত্ব ক্রমেই হারিয়ে যায়।[২]

তান্ডাঃ বর্তমান মালদহ শহর হতে ২৪.১৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গঙ্গানদীর পশ্চিমতীরে গৌড় ও লক্ষণাবতীর প্রায় উল্টোদিকে অবস্থিত তান্ডা ছিল ষোড়শ শতকে প্রতিষ্ঠিত কররানী সুলতানদের রাজধানী। 'তান্ডা' অর্থ উচ্চভূমি। শের শাহ শূররের শাসনামলে ১৫৪৪ সালে তান্ডা টাকশালের মর্যদা লাভ করে। কররানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খান কররানীর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই সুলাইমান খান কররানী (১৫৬৫-৭২ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলা, বিহারের স্বাধীন সুলতানে পরিণত হন ও গৌড়ের পরিবর্তে তান্ডাকে বাংলার রাজধানীতে পরিণত করেন। মুঘল সেনাপতি মুনিম খান কর্তৃক ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তান্ডা জয়ের আগ পর্যন্ত তা কররানী শাসকদের রাজধানী হিসাবে টিকে ছিল। পরবর্তীতে মুঘল সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক রাজমহলে শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরের ফলে তান্ডা রাজধানী মর্যদা হারায়। পরবর্তীতে গঙ্গা নদীর গতি পরিবর্তন ও ১৮২৬ সালের বন্যায় তান্ডা শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা): প্রাক-মুঘল সময় হতে বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত ঢাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে পরিচিত ছিল। ঢাকা হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপি থেকে মুঘল-পূর্ব যুগ হতে এই স্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের সময়ের অন্ততঃ দুটি মসজিদের শিলালিপি ঢাকা হতে আবিস্কৃত হয়েছে। যার একটি নারিন্দায় অবস্থিত মুসাম্মত বখ্‌তে বিনত বা বিনত বিবির মসজিদ (১৪৫৭ খ্রি.)।[৩] অপরটি নসওয়ালা গলির একটি প্রাচীন মসজিদ হতে প্রাপ্ত শিলালিপি, যা ১৪৫৯ সালে নির্মিত হয়েছিল বলে শিলালিপি সাক্ষে জানা যায়।[৪] ঢাকার সর্ব প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় সম্ভবত সুলতান রুকন-উদ-দীন বরবক শাহ্‌র সময়কার একটি শিলালিপি হতে (১৪৬০ খ্রি.)। শিলালিপিতে ঢাকাকে 'কসবা ঢাকা খাস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রস্তুতকৃত জ্যা-ডি-ব্যারোসের ম্যাপেও ঢাকার উল্লেখ রয়েছে। টোডরমলের রাজস্ব জরিপে ঢাকা বাজুকে 'সরকার বাজুহার' একটি পরগনা

---

১. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৫

২. Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2009, p.162

৩. A. Karim, *Corpous of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, p. 130-133

৪. *Ibid*. p. 134-37

৫. *Ibid*. p.150-51

হিসাবে দেখানো হয়েছে। এছাড়া আবুল ফজল রচিত *আকবর নামা* ও মীর্জা নাথান রচিত *বাহারীস্থান-ই-গায়বী* এর বিভিন্ন জায়গায় ঢাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সময় ঢাকাকে একটি থানা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] তবে মুঘল সুবাদার ইসলাম খান কর্তৃক ১৬১০ সালে এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পরই ঢাকা অধিক পরিচিতি পায়। সুবাদার ইসলাম খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগর। রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর খুব দ্রুত ঢাকার পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। পর্তুগীজ ধর্মযাজক সেবস্টিন ম্যনরিকের বিবরণ হতে জানা যায় ১৬৪০ সালে ঢাকা পশ্চিমে মনেশ্বর থেকে পূর্ব নারিন্দা পর্যন্ত এবং উত্তরে ফুলবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২] ঢাকার দক্ষিণ সীমানা বড়িগঙ্গা নদী দিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক ট্যাভারনিয়ার যখন ঢাকায় আসেন তখন তিনি ঢাকাকে একটি বড় ও জনবহুল শহর হিসাবেই বর্ণনা করেছেন।[৩] সুবা বাংলার রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে প্রায় একশত বছর ঢাকা রাজধানী হিসাবে বহাল ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে ঢাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইমারত যেমন - দূর্গ , প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি , কাটরা,সেতু ইত্যাদি নির্মাণের মধ্য দিয়ে এটি একটি আকর্ষনীয় ও উন্নত নগরে পরিণত হয়। অষ্টদশ শতকে সুবাদার আজিম-উশ-শান এর সময় মুর্শিদকুলী খান বাংলার 'দিওয়ান' নিযুক্ত হন (১৭০৪ খ্রি.) এবং সুবাদারের সাথে মত বিরোধের জের ধরে দিওয়ানী কার্যালয় ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭ খ্রি.) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলে সুবা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয় । ঢাকা শুধুমাত্র নায়েব-এ-নাযিমের কার্যালয়ের স্থান হিসাবে বহাল থাকে।

মুর্শিদাবাদঃ ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ অষ্টদশ শতকে সুবা বাংলার রাজধানীর মর্যদা লাভ করে। এর পূর্ব নাম ছিল 'মকসুদাবাদ'। মুর্শিদাবাদ প্রায় সত্তর বছর সুবা বাংলার রাজধানী ছিল। সপ্তদশ শতক থেকে এই অঞ্চলটি রেশম ও রেশমীবস্ত্রের জন্য পরিচিত ছিল। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি (১৬৬০ সালে) মুর্শিদাবাদকে পরগনায় রূপান্তরিত করা হয়। এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর নবাব মুর্শিদকুলী খান এই শহরটিকে বাংলার নবাবদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেন। রাজকীয় দরবার, সামরিক বাহিনী , শিল্পী-সাহিত্যিক, এবং ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে মুর্শিদাবাদ সম্পদে ও শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। নবাবগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে প্রাসাদ, মসজিদ , কাটরা , দূর্গ, উদ্যান, জলাশয় ইত্যাদি নির্মিত হয় এবং শহরের জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদাবাদে শুধু নবাবদেরই নয়

---

১. H. Blochmann, *Contributions of the Geography and History of Bengal*, Calcutta, Asiatic Society, 1968, p. 8

২. ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ঢাকা, চিশতিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯০ (২য় সংস্করণ), পৃ. ৬৪

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

ইউরোপীয় বণিকদেরও কুঠি ছিল। ইংরেজ গভর্ণর ও অন্যান্য সাধারণ ইংরেজ অধিবাসীগণ ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই শহরে বসবাস করেছেন। বিদেশী পরিব্রাজকগণ তৎকালীন মুর্শিদাবাদকে লন্ডন শহরের সাথে তুলনা করেছেন।[১] অষ্টদশ শতকের শেষ পর্যায়ে সুবা বাংলার দেওয়ানী কলকাতায় স্থানন্তরিত হওয়ার পর থেকে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব কমতে থাকে এবং পরবর্তীতে কলকাতা রাজধানীর মর্যদা লাভ করলে মুর্শিদাবাদের পতন সুনিশ্চিত হয়।

সমাজ চিত্র

ত্রয়োদশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলায় মুসলিম শক্তির আগমন সত্যিকার অর্থেই একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উর্বর ভূমি মুসলিম বিজয়ের প্রাথমিক কাল হতে ভাগ্যান্বেষী মুসলমানদের এই অঞ্চলের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। উন্নততর জীবনের আশায় বহু তুর্কী, আফগান, মুঘল, ইরানী, আরব মুসলমানগণ বাংলায় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এই সমস্ত ভাগ্যান্বেষী বহিরাগত মুসলমানদের আগমনের ফলে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বহিরাগত এই মুসলিম শক্তি তাদের সঙ্গে যে উন্নততর জীবন ব্যবস্থা ও দর্শন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল তা পরবর্তীকালে বাংলার স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থার সাথে মিশে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করে।

অধিবাসী: প্রাক মুসলিম যুগে বাংলার জনসাধারণ প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্ত্যজ শ্রেনীর অধিবাসী ও কিছু সংখ্যক জৈনদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তবে সংখ্যাধিক্যতায়, রাজনৈতিক শক্তিতে, সামাজিক মর্যদা ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিতে হিন্দুরাই ছিল সর্বেসর্বা।[২] এ সময় বৌদ্ধরা সংখ্যায় একেবারে নগন্য না হলেও তৎকালীন রাজশক্তির অধিকারী হিন্দুদের দ্বারা তারা ছিল অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। হিন্দু সমাজও ছিল বর্ণপ্রথার দ্বারা শতধা বিভক্ত । ব্যাক্ষনদের অবিচার ও অন্যায়, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের কলুষতা ও নীতিহীনতায় বাংলার সমাজ ছিল বিভ্রান্ত। এই ধরনের সামাজিক প্রেক্ষাপটে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সাম্যের আদর্শে বিশ্বাসী মুসলিম শক্তির সামরিক বিজয় বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা করেনি বরং তাদের নতুন চিন্তাধারায় বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ভীষণভাবে আন্দোলিত হয়।

---

১. K.M. Mohsin, "Murshidabad", in *Banglapedia*, vol. 7, Sirajul Islam (ed.), Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2003, p.143

২. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩- ১৫৭৬)*, ১ম খন্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনুদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ৩০

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম শাসনের সূচনার সাথে সাথে বাংলায় বহিরাগত মুসলমানদের আগমনের যে ধারা সূচিত হয় অষ্টাদশ শতকে বাংলায় বৃটিশ শক্তির প্রাধান্য বিস্তারের পূর্ব পর্যন্ত তা চলতে থাকে।[১] এর পাশাপাশি বাংলার তৎকালীন হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে শতধা বিভক্ত বর্ণপ্রথা, ব্রাহ্মনদের অবিচার, অনাচার, স্থানীয় জনগণকে ইসলামের সাম্যের আদর্শের দিকে আগ্রহী করে তোলে এবং বিপুল সংখ্যায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এছাড়া সুফী সাধকদের প্রচারণা, বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার এবং এর সাথে সম্পৃক্ত আরো কিছু নিয়ামক বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[২] এভাবে মুসলিম শাসনামলে বাংলার মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় মুসলমানগণ। হিন্দু ও মুসলমান ছিল এসময়ের দুটি প্রধান সম্প্রদায়, এর পাশাপাশি মুসলিম শাসনামলে এই অঞ্চলে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ, জৈন ও জরথুস্ত্রবাদী সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস ছিল। ষোড়শ শতকে পর্তূগীজ ও আর্মেনীয় এই দুটি সম্প্রদায় বাংলার জনসংখ্যার সাথে যুক্ত হয়।

বাঙ্গালী মুসলমানদের সামাজিক জীবনঃ বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে আলোচ্য চার শ্রেণীর মানুষ ছিলেন ।

১.শাসক শ্রেণী ২. অভিজাত শ্রেণী ৩. মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ৪. সাধারণ শ্রেণী।

বাংলায় মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে শাসনকর্তা সমাজের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতেন। শাসকের সহকারী হিসাবে নায়েব বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা একই ভাবে তার এলাকার জনসাধারণের সামাজিক জীবনের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। প্রজাদের শান্তি ও নিরাপত্তাবিধান, তাদের উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি তাঁর কর্তব্য ছিল। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোক তাঁর নিকট নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করতো এবং অন্যায়ের প্রতিকার ও অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতো। বাংলার মুসলমান শাসনকর্তাগণ অত্যন্ত আড়ম্বর ও জাকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। বিশেষ করে মুসলিম শাসনের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ সুলতানী আমলে বাঙ্গালী শাসকগণ দিল্লীর সুলতান ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলতেন। তাঁরা নিজেরা জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদে বসবাস করতেন, যাদের ঐশ্বর্যের বর্ণনা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায়।[৩] দেশের বড় বড় শহরগুলোতে তাঁরা প্রাসাদ মসজিদ মাদ্রাসাসহ আরও বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য নির্মাণ করে শহরের সৌন্দর্য্য ও সুবিধাদি বর্ধনের ব্যবস্থাও তাঁরা করতেন।

---

১. Md. Akhtaruzzaman, *op,cit.,* p.181

২. *Ibid,* pp. 181-198

৩. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২২-২২৬

শাসকের দরবারের আমির-ওমরাহগণ ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের খুব গুরুত্বপূর্ণ মর্যদার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের সমর্থন ও আনুগত্যের উপর শাসকের স্থায়ীত্ব নির্ভরশীল ছিল। মুসলিম শাসনামলে বাংলায় অভিজাত সম্প্রদায় বংশগত ছিল না। বংশগত মর্যদার চেয়ে ব্যক্তিগত প্রতিভা অভিজাত শ্রেণী গঠনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। অভিজাত ও আমির-ওমরার মর্যদা কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা । মেধা ও প্রতিভার গুণে হিন্দুরাও উচ্চ মর্যদার রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত হতেন। মুসলমান শাসকগণ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর গুনী ও যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য সরকারি চাকুরি উন্মুক্ত রেখেছিলেন। অভিজাতদের মধ্যে সৈয়দ, উলেমা ও পীর-দরবেশগণ ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যদার অধিকারি। খান, মালিক, ওমরাহ, সদরগণ দ্বিতীয় শ্রেণী ও জমিদার ও অন্যান্যগণ তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত অভিজাত বলে গণ্য হতেন। আমির, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জমিদারদের নিজস্ব ক্ষুদ্রাকৃতির দরবার ছিল । এসব দরবারে কবি, শিল্পী,গায়ক, প্রতিভাশালী ও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের আবাস স্থল ছিল। মুসলিম বাংলার অভিজাত শ্রেণী একটি সংস্কৃতিবান ও প্রগতিশীল সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন। তারা বিদ্যানুশীলন করেন , শিল্প ও প্রতিভার উৎসাহ দেন, শিষ্টাচার ও আদব কায়দার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, নতুন রুচী র উন্নতি বিধান করেন এবং শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[১]

সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি, যেমন - নিম্নপদস্থ কর্মচারী , কেরানী, চিকিৎসক, শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, কবি, সঙ্গিত- শিল্পী ও বণিকগণ এসময় মুসলিম সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। শিল্পী, কারিগর, স্থপতি এবং উৎপাদনকারী ও এই শ্রেণীভুক্ত বলে বিবেচিত হতেন। মুসলমানদের মধ্যে ক্ষুদ্র জমিদার ও জোতদারগণ সামাজিক মর্যদার দিক দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তভূক্ত ছিলেন। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বণিক, হাওলাদার ও জোতদারগণের আর্থিক প্রতিপত্তি ছিল কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকায় তারা অভিজাত শ্রেনীর অর্ন্তভূক্ত হতেন না। তবে তারা স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করতেন। কৃষক, ছোট ছোট কারিগর ও উৎপাদক এবং শ্রমিকগণ সমাজের সাধারণ শ্রেণীর লোক ছিলেন।

হিন্দুদের সামাজিক জীবন: বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সময় হিন্দু সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল - ১. ব্রাক্ষণ, কায়স্থ , বৈশ্য ও শুদ্র। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সামাজিক বাঁধা নিষেধ বিদ্যমান ছিল ।

ব্রাক্ষণগণ সমাজের সর্বোচ্চশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের সাম্যবাদী সামাজিক আদর্শের কারণে ব্রাক্ষণদের একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুন্ন হয়। ফলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে

১. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২৮-২৩৩

তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অন্যান্য বর্ণের হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কায়স্থগণ হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতেন। এরা মূলতঃ উচ্চ শ্রেনীর ব্যবসায়ীগোষ্ঠী। মুসলিম শাসনামলে তারা বিদ্যাবুদ্ধিতে পারদর্শীতা অর্জন করে রাষ্ট্র ও সমাজে মর্যদাসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত হয়। বৈশ্যগণ ছিল বেশীভাগই কৃষক ও ব্যবসায়ী। বৈশ্যরা তাদের পেশা অনুসারে শহর বা গ্রমের একাংশে বসবাস করত। তাদের মধ্যে নানা শ্রেণীর শিল্পকার ও কারিগর ছিল।

সমাজে শুদ্ররা ছিল শ্রমিকশ্রেণী। পেশার ভিত্তিতে তারা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। জেলে নাপিত, তাঁতী , কামার, কুমার সূত্রধর, কুম্ভকার, ধোপা ইত্যাদি পেশায় শুদ্রগণ নিয়জিত ছিলেন। গ্রাম বা শহরের সর্বশেষ প্রান্তে তারা বাস করতেন।

বর্ণ ও উপ-বর্ণে বিভক্ত হওয়া ছাড়াও সেসময় হিন্দুগণ অসংখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। সম্প্রদায়গুলো বিশেষ দেব-দেবীর পুজার প্রতি প্রধান্য দিয়ে , স্রষ্টাকে লাভ করার ও আত্মার মুক্তিলাভের আদর্শ ও পন্থার ভিত্তিতে, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম পালনের উপর গুরুত্ব দিয়ে গড়ে উঠে। মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে সমাজে শিব ও শক্তি পুজা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে পনের-ষোল শতকে বাংলায় বিভিন্ন দেবী যেমন- মনসা, চন্ডী, শীতলা, ষষ্ঠি ইত্যাদি পুজা জনপ্রিয়তা লাভ করে।[১] এগারো শতক হতে সমাজে দূর্গা পুজা প্রচলিত ছিল। ষোল শতকের মধ্যে দূর্গাপূজা বাঙালী হিন্দু সমাজের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। ষোল ও সতের শতকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় ।

সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক: বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকে পাশাপাশি অবস্থানকারী দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি সংস্কৃতির ধারক হয়েও পরস্পরকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। সরকারি কাজে উভয় সম্প্রদায় হতে লোক নিয়োগ, যোগ্যতানুসারে কর্ম প্রাপ্তি এবং সমাজে শাসক শ্রেণী কর্তৃক বর্ণপ্রথাকে অগ্রাহ্যকরণ ইত্যাদি হিন্দু সমাজে মুসলিম প্রভাবকে সুগম করে । হিন্দু উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা মুসলিম সংস্কৃতি , পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণে প্রভাবিত হয়। হিন্দু জমিদারগণ তাদের দরবারে মুসলিম দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করতেন এবং মুসলিম পদবি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতেন। হিন্দুগণ মুসলিম পীর-দরবেশদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং তাদের মান্য করে চলতেন। মুসলমানদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে বিশেষ করে মোহররমের অনুষ্ঠানে

১. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৮

হিন্দুদের যোগদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] অপর দিকে মুসলমানগণও হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবাদি যেমন হোলী উৎসবে যোগদানে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মুসলমানদের মধ্যে ও কিছু হিন্দু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্য হতে জানা যায় যে, সে সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ কেউ সাপের আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মনসা দেবীর পুজা দিতে দ্বিধাবোধ করতো না।[২] বহু মুসলমান হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন। নবাব মীর কাশিম ব্রাহ্মণ জ্যোতির্বিদদের দ্বারা তার নবজাত সন্তানের ঠিকজী বা কুলজী প্রস্তুত করিয়ে ছিলেন।

বাংলার অর্থনৈতিক জীবন: মুসলিম শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে অগ্রগতি সাধিত হয়। অসংখ্য নদীনালা, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক সেচ ব্যবস্থার ফলে বাংলার মাটি স্মরণাতীতকাল থেকে উর্বর। তাই প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। মুসলিম শাসনামলে বিভিন্ন পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের লেখনী থেকে কৃষিক্ষেত্রে বংলার সমৃদ্ধির উদাহরণ পাওয়া যায়। কৃষি ক্ষেত্রে প্রধানত চাল, চিনি, পাট, গুটি পোকা চাষ হত। এই সময় বাংলায় নানা ধরনের চাল শুধু উৎপন্নই হতোনা এটি একটি রপ্তানী পণ্যও ছিল।[৩] চৌদ্দ শতক হতে বাংলায় পাট উৎপাদনের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাট ও পাটজাত বস্ত্রের উল্লেখ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে প্রচুর উল্লেখিত হয়েছে।[৪] তবে ষোল শতক পর্যন্ত পাট ও পাট জাত দ্রব্য রপ্তানী যোগ্য পণ্য হয়ে উঠেনি। সতের শতকের পর থেকে পাটের বস্তা বিদেশে রপ্তানী হত। মুসলমানগণ সম্ভবত চীন থেকে বাংলায় তুঁতগাছ ও গুটিপোকার আমদানী করেন। বাংলায় গুটিপোকা থেকে প্রচুর পরিমাণ রেশমের কাঁচামাল উৎপাদিত হত এবং তা সমগ্র ভারতসহ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, জাপান ও হল্যান্ডে রপ্তানী হত। ঢাকা অঞ্চলে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট কার্পাস হতে প্রস্তুত সুক্ষ সুতা দিয়ে তৈরী হত বিশ্ববিখ্যাত মসলিন কাপড়। এছাড়া গম, আখ, নীল, আফিম , লাক্ষা বাংলা অঞ্চলে ভাল জন্মাত।

মুসলিম শাসনের প্রারাম্ভ থেকে এ অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। এর মধ্যে প্রধান ছিল বস্ত্র শিল্প। বিশেষ করে রেশমী ও পোশমী বস্ত্রের জন্য বাংলা বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করে। চৈনিক দূতগণ বাংলার সুতী বস্ত্র বয়নেরও উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন।[৫] মুসলিম আমলে চিনি উৎপাদন একটি প্রধান শিল্পে উন্নীত হয়। এ সময় চিনি বাংলা হতে বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানী হত বলে বারথেমার বিবরণ হতে

---

১. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৪
২. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৫
৩. ওয়াকিল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*., পৃ. ১১
৪. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৪
৫. অসীম কুমার রায়, *বঙ্গ বৃত্তান্ত*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ১১১-১২৪

জানা যায়।[১] জাহাজ শিল্পে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য ছিল। নদী বহুল বাংলার জনগণ নৌকা তৈরীতে পারদর্শী ছিল। সমসাময়িক সাহিত্যে ও বিভিন্ন পর্যটক ও বণিকদের বিবরণি হতে এই বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। ইতালীয় বণিক বারথেমার বিবরণ হতে জানা যায় যে বাংলার লোকেরা বিভিন্ন প্রকারের প্রকান্ড জাহাজ ব্যবহার করত।[২] কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের প্রাচুয্য এবং সমুদ্র যাত্রায় মুসলমানদের আগ্রহ বাণিজ্য ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেছিল। মুসলিম শাসনামলে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও বড় সমুদ্র বন্দর হিসাবে বিখ্যাত ছিল। এসব বন্দরে আরব, চীনা, পুর্তগীজ , ওলন্দাজ, ফরাসী ,ও ইংরেজ বণিকেরা বাণিজ্য পণ্য নিয়ে আসতো। এছাড়া বার্মা, মালয়, সিংহল, পেগু, মালাক্কা , সুমাত্রাসহ আরও বহু দেশের সাথে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল । তবে তোমে পিরেসের বর্ণনানুসারে অন্ততঃ ষোল শতকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙালী বণিকগণ পশ্চিম ভারতীয় ও পশ্চিম এশিয় বণিকদের তুলনায় দূর্বল অবস্থানে ছিল।[৩] বাংলা হতে মূলত সুতী ও রেশমী বস্ত্র, চাল , চিনি ইত্যাদি রপ্তানী হত।

উৎসব, অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি: মুসলিম শাসনামলে বাংলার জনগোষ্ঠি প্রধানত হিন্দু ও মুসলিম এই দুটি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও সমাজিক উৎসব, অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিতে পার্থক্য ছিল। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ছিল 'ঈদ-উল ফিতর' ও 'ঈদ-উল-আযহা' । এই দিন মুসলমানগণ সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রা করে ঈদগাহে যেতেন। এ সময় গরিবদের মধ্যে দান-খয়রাত এর প্রথা ছিল। এই ধরনের বড় উৎসবের দিনে সৌজন্য মূলক সাক্ষাত ও একত্রে আনন্দ উৎসব করার জন্য মুসলমানগণ বন্ধুবান্ধব ও আত্মিয়-স্বজনদের বাড়ি যেতেন। 'ঈদু-উল-আযহার' দিনে ঈদের নামাজ শেষে কোরবানী করা হত। কোরবানী করতে অসমর্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ভোজের ব্যবস্থা করা হত। উপহার বিতরণ ও আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হত। মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে রাসুলের জন্মদিন 'ঈদে মিলাদ-উন-নবী', 'শব-ই-বরাত', ও 'মোহর্‌রম' বিশেষ ভাবগাম্ভীর্য্যের সাথে পালিত হত। শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা 'মোহর্‌রম'কে কারবালায় ইমাম হোসেনের শাহাদাতের বাৎসরিক স্মরণিকা হিসাবে পালন করতেন । ষোল শতকে বাংলা সাহিত্যে শিয়াদের ইমামবাড়ার বহু উল্লেখ আছে।[৪] ইমামবাড়া 'মোহর্‌রম' উৎসবের কেন্দ্র ছিল। এখান থেকেই তাজিয়া মিছিল শুরু হত। ষোল শতকের সাহিত্যে ইমামবাড়া, তাজিয়া ইত্যাদির উল্লেখ থেকে মনে হয় সেই

---

১. অসীম কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫

২. *প্রাগুক্ত*

৩. মমতাজুর রহমান তরফদার, 'তোমে পেরেসের বিবরণে বাংলাদেশ', সালাহউদ্দীন আহমেদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ১৯৯১, পৃ. ১৮৪-২০৮

৪. মকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চন্ডীকাব্য*, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় (সম্পা.), কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, পৃ. ৩৪৪; Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybi*, M. I. Borah (tr.), Gauhati, Government of Assam, 1936, p.158-170

সময়ও মুসলমানগণ ধুমধামের সাথে মোহর্‌রমের উৎসব পালন করতেন। এছাড়া পয়গম্বর খোয়াজ খিজিরের সম্মানার্থে বাঙালী মুসলমানগণ 'বেড়া' উৎসব পালন করতেন। খোয়াজ খিজিরকে সকল জলরাশির অভিভাবক বলে বিশ্বাস করা হত। নবাব মুর্শিদকুলী খান বিরাট আড়ম্বরের সাথে এই উৎসব পালন করতেন। কলাগাছ এবং বাঁশের তৈরী নৌকার উপর ক্ষুদ্রাকায় গৃহ ও মসজিদ নির্মাণ করে তাতে আলোক সজ্জা করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া ছিল 'বেড়া' উৎসবের বৈশিষ্ট্য।[১]

হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে শিব ও কালী পুজা ছিল প্রধান। পনের শতক হতে হিন্দু সমাজে মনসা ও চন্ডী পুজা প্রাধান্য পায় । এই পুজা উপলক্ষে 'মনসামঙ্গল' ও ' চন্ডীমঙ্গল' পাঁচালী পাঠ করা হত এবং সমস্ত গ্রামবাসী তা শুনতো। মনসা সর্পের দেবী ও চন্ডী ধন-দৌলতের দেবী হিসাবে পুজিত হত।[২] ষোল শতকে হিন্দুদের মধ্যে দূগাপুজা জনপ্রিয়তা লাভ করে । বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভগবত" হতে জানা যায় যে, সেই সময় বাংলার ঘরে ঘরে দূর্গা পুজা উজ্জাপিত হত।[৩] এছাড়া হিন্দু সমাজে লক্ষী পুজা,সরস্বতী পুজা, বাসলী পুজা, ষষ্ঠী পুজা প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের মধ্যে 'দশহারা ' গঙ্গাস্নান ও ব্রক্ষ্মপুত্রে স্নান অষ্টমীস্নান নামে পরিচিত ছিল ও উৎসাহের সাথে পালিত হত। দোলযাত্রা, রথযাত্রা ও হোলী উৎসব খুবই প্রচলিত ও জনপ্রিয় উৎসব হিসাবে বিপুল আমোদ-প্রমোদের সাথে পালিত হত। রঙ ছড়ানো ও গৃহ আলোক সজ্জা ছিল হোলীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সেই সময় নবজাত শিশুর জন্ম উৎসব, নামকরণ উৎসব ধুমধামের সাথে পালিত হত। এছাড়া মুসলমানগণ শিশুর আকিকা, বিসমিল্লাহখানি ও খাৎনা অনুষ্ঠান পালন করতেন। হিন্দু মসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান জাঁকজমকের সাথে সম্পন্ন হত।

পোষাক-পরিচ্ছদঃ সমসাময়িক বিবরণ থেকে তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা পাওয়া যায়। চৈনিক বিবরণ[৪] হতে জানা যায় যে, তৎকালীন মুসলমান সম্ভ্রান্ত পুরুষগণ পায়জামা এবং গোলাকৃতির কলারের ঢিলা পোষাক পরতেন। পোষাকটি রঙ্গিন রুমাল দিয়ে কোমরে বাঁধা থাকত। তারা মাথায় সাদা সুতীর পাগড়ি ব্যবহার করতেন। সাধারণ লোকেরা খাটো সাদা কুর্তা, পায়জামা ও তিন প্যাচের ছোট পাগড়ি পরতেন। মুসলিম অভিজাত মহিলারা সালোয়ার কামিজ বা ঘাগড়া পরতেন। হিন্দুদের সাধারণ পোষাক ছিল ধুতি। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা 'অঙ্গরাখা', চাদর ও পাগড়ি ব্যবহার

---

১. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫

২. এস. কে. সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, কলকাতা, সাহিত্য একাডেমী, ১৯৬৫, পৃ. ১৫৫-৫৬

৩. সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), *চৈতন্যভগবত*, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭-৩৮

৪. ওয়াকিল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১.৩৭ ও ৪২

করতেন। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে শাড়ির প্রচলন ছিল। অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়েরা কাঁচুলী ও ওড়না পরতেন।

হিন্দু- মুসলিম নারী-পুরুষ উভয়েই মুল্যবান আংটি ব্যবহার করতেন। মহিলাদের অলংকারের মধ্যে হার, কঙ্কন, বালা, নুপুর, কিঙ্কিনী ইত্যাদি প্রচলিত ছিল।

দাস প্রথাঃ মুসলিম শাসনামলে বাংলার সমাজে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। বণিকগণ বিদেশ থেকে বিশেষ করে আবিসিনিয়া থেকে ক্রীতদাস আমদানী করত। সুলতান রুকন-উদ্দীন-বরবক শাহ্ তাঁর সেবার জন্য কয়েক হাজার হাবশী ক্রীতদাস আমদানি করেছিলেন। চৌদ্দ শতকে ইবনে বতুতা যখন বাংলায় আসেন তখন তিনি বাজারে বহু ক্রীতদাস-দাসী কেনা-বেচা হতে দেখেছিলেন।[১] পুর্তগীজ বণিক বারবোসাও বাংলায় দাস ব্যবসার কথা উল্লেখ করেন। তার বর্ণনা অনুসারে শহরের মুরদেশীয় বণিকগণ দেশের অভ্যন্তর থেকে ছেলে-মেয়েদের ক্রয় করে দাস রূপে বাজারে বিক্রি করত।[২] আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে শ্রীহট্ট ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল হতে বহু খোজা সরবারহ করা হত।[৩]

সতী প্রথাঃ মৃত স্বামীর চিতায় তার বিধবা পত্নীর আত্মাবসর্জন 'সতী প্রথা' নামে পরিচিত। ইবনে বতুতা , আবুল ফজল, বার্ণিয়ারসহ অন্যান্য লেখকগণ উত্তর ভারতের হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথাটি কড়াকড়ি ভাবে প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথাটি হিন্দু পুরান দ্বারা সমর্থিত হলেও পনের-ষোল শতক পর্যন্ত বাঙালী হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। বরং মুসলমান আমলে হিন্দুদের মধ্যে 'সতী প্রথা' ছিল স্বেচ্ছামূলক। চৈনিক বিবরণ হতে জানা যায় যে, হিন্দু রমনী স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা হয়ে জীবন কাটাত এবং পুনরায় বিয়ে করা থেকে বিরত থাকত।[৪]

শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থাঃ বারো শতকের শেষ পর্যায়ে উত্তর ভারতে মুসলিম বিজয় ভারত ভূখন্ডে এক বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর আগমনের সূচনা ঘটায়। এই বহিরাগত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান পুরুষ। এই শিক্ষিত সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক তেরো শতক থেকে বাংলায় আগমন করেন এবং এখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাই বাংলায় মুসলিম শাসনামলের প্রাথমিক যুগ হতে শিক্ষাকেন্দ্র বা মাদ্রাসা নির্মাণের উল্লেখ সমসাময়িক ইতিহাসে পাওয়া যায়।[৫] এসময় মুসলিম শাসকগণ শুধু শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না তাদের অনেকেই ছিলেন

---

১. *'ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনী* , এইচ.এ. আর গিব, (বাংলা ভাষান্তর খুররম হোসাইন), টাঙ্গাইল, ক্যাবকো, ২০০০, পৃ. ১৬২

২. অসীম কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯

৩. আবুল ফজল, *আইন-ই- আকবরী*, প্রথম খন্ড, ব্লকম্যান অনুদিত, কলকাতা, এশিয়টিক সোসাইটি, ১৮৭৩, পৃ. ১৩৬

৪. ওয়াকিল আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৫. মীনহাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

উচ্চ শিক্ষিত ও জ্ঞানী। সুলতান গিয়াস-উদ্দীন আযম শাহ্ চারটি সুন্নী মাজহাবের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনায় মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। আযম শাহ্ নিজেও ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ও খ্যাতনামা কবি। তাঁর রচিত কবিতার দুটি চরণ তিনি পারস্যের কবি হাফিজের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। কবি হাফিজ উক্ত চরণ দুটি পূর্ণাঙ্গ করে একটি কবিতা সুলতানের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।[১] শিক্ষার প্রসারের জন্য মুসলিম শাসকগণ বাঙলার বিভিন্ন শহরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐতিহাসিক বিবরণ ও শিলালিপি হতে এই তথ্যের সমর্থন মেলে। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী লাখনৌতির সর্বত্র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাহীসুনে মওলানা তকীউদ্দীন আরাবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠীত একটি মাদ্রাসা ছিল। মওলানা আবু তাওয়ামা এবং সরফুদ্দীন মানারী সোনারগাঁও এ যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন সময় তা খুবই বিখ্যাত ছিল। তেরো শতকের শেষ পর্যায়ে সুলতান রুকন-উদ্দীন কায়কাউসের শাসনামলে সাতগাঁও এ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা শিলালিপির সাক্ষে জানা যায় । বাংলায় মুসলিম শাসনামলে সুফী দরবেশদের খানকাহও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময়ের প্রায় সকল সুফী দরবেশগণ অত্যন্ত জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। পান্ডুয়ার আলাওল হককে 'মারদে দানিশমন্দ ও আলীজাহ' বা 'সবচেয়ে জ্ঞানী ও সম্মানীয় ব্যক্তি' বলা হত। বিখ্যাত সুফী নুর কুতুবুল আলম ও গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্ সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরা উভয়ই শেখ হামিদউদ্দীন গুঞ্জনাসীন নাগরীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। শেখ জালাল উদ্দীন তাঁর তিনশত অনুসারীসহ সিলেটে আগমন করেন ও শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সেখানে খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সুলতানী শাসনামলে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে লাখনৌতি, মাহিসুন, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, নাগর, মান্দারান, পান্ডুয়া, বাঘা, রংপুর,চট্টগ্রাম ইত্যাদি প্রধান ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে মুঘল আমলে ইসলাম খান জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা) সুবা বাঙালার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলে জাহাঙ্গীরনগর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংস্কৃতিক জীবনের বিখ্যাত কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠে। নবাবদের অধীনে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উচ্চমর্যদা লাভ করে। নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল।

মাদ্রাসাগুলোতে কোরাআন, হাদীস. ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়ের পাশাপাশি লোকায়ত সাধারণ বিজ্ঞান যেমন- যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ,অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যামিতি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রসায়নশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইরানি, ইউনানি ও বৈদিক এই তিনটি উৎস থেকে চিকিৎসা জ্ঞান

১. গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পা.), ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০৭ (দিব্য প্রকাশ সংস্করণ), পৃ. ৮৮

আহরণ করতেন। মাদ্রাসাগুলোতে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার অঙ্গ ছিল। এটা অঙ্কশাস্ত্র, কারিগরি শিক্ষা ও সঙ্গিত বিদ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই বিষয়গুলোকে একত্রে 'রিয়াজী' বিজ্ঞান বলা হত।

মুসলমানগণ সব সময় একটি ব্যাপক ও কার্যকর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রথম যুগের ইংরেজ প্রশাসকগণও বাংলার মাদ্রাসাগুলোতে অধ্যায়নের ব্যাপক ও ধারাবাহিক পদ্ধতি লক্ষ্য করেছিলেন।

স্থাপত্য শিল্পঃ মুসলিম-পূর্ব সময় হতেই বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাস ছিল গৌরবময়। যদিও ঐ সময়ের প্রায় সকল স্থাপত্যই আজ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে । তবে সমসাময়িক বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও প্রাপ্ত ইমারতগুলির বর্তমান ধ্বংসাবশেষ সেই গৌরবময় ইতিহাসকে সমর্থন করে। পঞ্চম শতকে ফাহিয়েন এবং হিউয়েন সাং, ইৎ সিঙ এবং সেঙ চির লেখনীতে বাংলার অসাধারণ ইমারতগুলোর বর্ণনা লিপি বদ্ধ আছে।[১] পর্যটকগণ পুণ্ড্রবর্ধণ (মহাস্থানগড়), কর্ণসূবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) সমতট (ময়নামতি), তাম্রলিপ্ত (মেদেনীপুর) তে অবস্থিত বহু বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরের উল্লেখ করেছেন, যেগুলো একাধারে বৃহৎ ও সুউচ্চ কাঠামো সম্বলিত ছিল। এ সময় লৌকিক ইমারতের মধ্যে ছিল স্তুপ, বিহার, এবং মন্দির। স্তুপগুলো অর্ধগোলাকার, বিহারসমূহ বর্গাকার বা প্রায় বর্গাকার, এবং মন্দির নির্মাণে ক্রুশাকৃতির পরিকল্পনা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে। যদিও মুসলিম-পূর্ব যুগের প্রায় কোন ইমারতই অক্ষত অবস্থায় দাড়িয়ে নেই (স্বল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ্য ও জৈন দেউল ছাড়া) তবে সমসাময়িক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে উপস্থাপিত মন্দিরের চিত্র হতে মনে হয় বিহারগুলির ছাদ ক্রমপূরণ পদ্ধতিতে নির্মিত চোঙাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত ছিল।[২] অলংকরণ ছিল নির্মাণমূলক ও অঙ্গসজ্জামূখ্য, গাত্রালংকারে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হত।

বাংলায় মুসলিম শাসনামলে স্থাপত্য শিল্প এদেশের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক ধারার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এই উপমহাদেশের আগমনের আগেই মুসলমানদের একটি নিজস্ব স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে খিলান, গম্বুজ, মিনার, মিহরাব ইত্যাদি ছিল প্রধান। সংযোজক হিসাবে ব্যবহৃত হত চুন, বালি ও পানি মিশ্রিত মর্টার। মুসলিম-পূর্ব বাংলার স্থাপত্যে সুচালো খিলান স্বল্প পরিসরে নির্মিত হলেও এর নির্মাণ কৌশল হিসাবে ক্রমপূরন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। মুসলমানগণই প্রথম এদেশে খিলান পদ্ধতির নির্মাণ কৌশল এর প্রবর্তন করেন। এরপর থেকে এই অঞ্চলের স্থাপত্যে সর্বত্রই খিলান পদ্ধতিই

১. অসীম কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০০- ১০৫; R.C. Majumdar (ed.), *op.cit.*, p.480

২. এ.বি.এম. হোসেন (সম্পা.), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২ স্থাপত্য*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ১৩

ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, রাজনৈতিক পটভূমি ও দেশজ সংস্কৃতি মুসলিম শাসনামলের স্থাপত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং বাংলার স্থাপত্যের ধরন ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।

সমতল নদী বহুল ভৌগোলিক অবস্থান ও পাথরের দুস্প্রাপ্যতার কারণে বাংলার স্থাপত্যের নির্মাণ উপাদান হিসাবে সব সময়ই ইটের প্রাধান্য ছিল। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার বাংলার স্থাপত্য পরিককল্পনায় এর সুস্পস্ট প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম ঐতিহ্যের আদর্শ মসজিদগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল সামনে ঘেরা উন্মুক্ত অঙ্গন রেখে কিবলার দিকে প্রার্থনাগৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা। এদেশের আবহাওয়াকে বিবেচনায় রেখে বাংলার মসজিদ পরিকল্পনায় সযত্নে মসজিদ স্থাপত্যের এই আদর্শ পরিকল্পনাটির পরিবর্তন আনতে হয়। এদেশে বছরের বেশীভাগ সময় বৃষ্টিপাত হওয়ায় উন্মুক্ত ধরনের মসজিদ এই অঞ্চলের জন্য অনুপযুক্তও বিবেচিত হয়। এই কারণে আচ্ছাদিত মসজিদ পরিকল্পনা এখানকার প্রায় সকল মসজিদে অনুসৃত হয়। এমনকি বৃষ্টির ছাট থেকে মসজিদের অভ্যন্তরভাগকে রক্ষা করার জন্য প্রবেশপথগুলো নিচু করে নির্মাণ করা হয়। আবহাওয়ার অপর একটি প্রভাব লক্ষ্য করা যায় স্থাপত্যের ছাদ নির্মাণে। বন্যা প্রবন ও বৃষ্টিবহুল অঞ্চল বলে বাংলার গ্রামাঞ্চলের জনসাধারন স্থায়ী উপাদানের পরিবর্তে হালকা ধরনের স্থানান্তরযোগ্য গৃহ বেশী পছন্দ করতেন। বৃষ্টির পানি যাতে ছাদে জমতে না পারে এই জন্য এই সব গৃহের ছাদ দুই বা চার দিকে ঢালু করে নির্মাণ করা হত। শুধু ছাদের ধারগুলোই নয় বাঁশের কাঠামোর এই সব গৃহের ছাদের শীর্ষদেশেও থাকতো সুস্পস্ট বাঁক যা বাংলার স্থাপত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য । মুসলিম আমলে এই বৈশিষ্ট্যটি স্থায়ী উপাদানে পরিবর্তিত করে স্থাপত্যে সংযুক্ত করা হয়। মুসলিম শাসনামলের প্রথম পর্যায়ে বাংলা দিল্লীর অধীনস্ত ছিল এবং কেন্দ্রের অনুকরণে এখানেও স্থাপত্য নির্মাণে দেশীয় নির্মাণ-শ্রমিক ও পূর্বে ব্যবহৃত স্থাপত্য উপাদানসমূহ নিজেদের প্রয়োজনে পুনরায় ব্যবহার করেছেন। ফলে মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে দেশীয় নির্মাণ কৌশল অনুসৃত হয়েছে। পাল আমলে পাথরের খোদাই নকশার উৎকর্ষ ও সেন রাজাদের পাথরের স্থাপত্যে প্রতি দূর্বলতার কারণে মুসলমানগণ এদেশে এসে পাথরের এই শিল্প ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হন। দেশীয় কৌশল ও মুসলমানদের স্থাপত্য চিন্তার ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ ইট ও পাথরের যৌথ নির্মাণ কৌশলের প্রবর্তন করেন। ইটের নির্মাণকে অলংকৃত পাথরের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার রীতিটি মুসলিম শাসনের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ সুলতানী স্থাপত্যের একটি জনপ্রিয় বৈশিষ্ট্য ছিল। মুসলিম বিজয়ের পর থেকে প্রাথমিক ইলিয়াসশাহী সময় কাল পর্যন্ত স্থাপত্য নির্মাণ কৌশলে খুব বেশী পরিবর্তন সাধিত হয়নি তবে স্বাধীন

বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান সিকান্দার শাহের নির্মিত আদিনা মসজিদের বিশালত্ব ও অলংকরণ বহুল উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। সুলতানী আমলে স্বাধীন বাংলার স্থাপত্য ধারায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং এক পর্যায়ে বাংলার স্থাপত্য ধারা স্পষ্ট ভাবেই একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। বাংলায় প্রাপ্ত ইমারতগুলোর মধ্যে মুসলিম শাসনামলে স্থাপত্যে বাংলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রথম যে ইমারতটি মনোযোগ আকর্ষণ করে তা সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ নির্মিত একলাখী সমাধি (পনের শতক)। সুলতান জালাল-উদ্-দীন মুহাম্মদ শাহ (যদু) ছিলেন বাংলার বিখ্যাত ভাতুরিয়া পরগনার জমিদার ও ইলিয়াসশাহী সুলতানদের একজন প্রভাবশালী আমীর রাজা গনেশের ধর্মান্তরিত পুত্র। সেই সূত্রে সুলতান জালাল-উদ্-দীন ছিলেন বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক যিনি একজন স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং বাংলার সংস্কৃতির সাথে মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। এর প্রমাণ তাঁর নির্মিত একলাখী সমাধির নির্মাণ পরিকল্পনায় লক্ষ্য করা যায়। চার কোণে চারটি পার্শ্ব বুরুজ,বাঁক যুক্ত কর্নিশ , পুরু দেয়াল, নিচু ও দ্বিকেন্দ্রীক প্রবেশপথ, নিচু ও অর্ধগোলাকৃতির গম্বুজ, দেওয়ালে পোড়ামাটির ও রঙিন টালির অলংকরণ সম্বলিত ইটের ইমারতটি বাংলার বৃষ্টি বহুল আবহাওয়া, রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতা ও স্থানীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক মাইল ফলক। এই সময় বাংলার স্থাপত্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো সংযুক্ত হয় পরবর্তী স্বাধীন সুলতানী আমলে তা আরও পরিশীলিত আকারে বাংলার নিজস্বধারা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।ভারত অথবা ভারত বহির্ভূত অন্যান্য মধ্যযুগীয় সাথাপত্য হতে যা ছিল স্বতন্ত্র । একে যৌক্তিকভাবে বাংলারীতি হিসাবে আখ্যাযিত করা যায়।

বাংলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত স্থাপত্য রীতিটি স্বাধীন সুলতানী আমলের পতনের সাথে সাথে মুসলিম স্থাপত্য থেকে ক্রমশ হারিয়ে যায়। বাংলায় আগত নব্য মুঘল শাসকগণ স্বাধীন বাংলার পতন ঘটিয়ে বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন এবং মুঘল শক্তির কেন্দ্র দিল্লী, আগ্রা ও ফতেহপুর সিক্রির স্থাপত্যের আদলে এখানে স্থাপত্য চর্চা করেন। তবে আকারে কি আড়ম্বরে এই ইমারতগুলো কোন ভাবেই উত্তর ভারতের ইমারতগুলোর সমকক্ষ ছিল না। নির্মাণ উপাদান হিসাবে এখানে ইটের প্রাধান্য বজায় থাকে। স্থাপত্য পরিকল্পপনায় উত্তর ভারতে বিকশিত আনুষ্ঠানিক প্রবেশপথ, জাঁকালো, উচ্চতা সম্পন্ন স্কন্ধ যুক্ত গম্বুজ, ইমারতের চারকোনায় উঁচু মিনার , চতুর্কেন্দ্রীক ও খাঁজকাটা খিলান,অনুচ্চ ছাদ প্রাচীর, দেওয়ালের খোপ নকশা ইত্যাদি প্রবেশ করে। মুসলিম স্থাপত্য থেকে সুলতানী

যুগের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যগুলো বিলুপ্ত হলেও মুঘল আমলে নির্মিত মন্দিরগুলোতে এর চর্চা অব্যহত থাকে এবং আরও বিকশিত হয়ে মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ধ্রুপদি যুগের সুচনা করে ।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলিম শাসনামলে বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটে। মুসলমানগণ বাংলার স্থানীয় জনগণের সাথে ঐক্য স্থাপন করেন এবং সমগ্র বাংলাকে একই রাজনৈতিক সূত্রে গেঁথে স্বাধীন বাংলার অগ্রগতিকে তরান্বিত করেন। একই সাথে বহিরাগত মসুলমানদের আগমনের প্রবাহ অব্যহত থাকে এবং সমাজে মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে । রাজনৈতিক ঐক্যের সাথে সাথে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যকার ভাষা, শিক্ষা , শিল্পকলা সর্বোপরি সংস্কৃতির মধ্যে একটা একতার বন্ধন সৃষ্টি হয় যা বাংলার পরবর্তী ইতিহাসের ধারাকে পরিচালিত করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক-মুসলিম আমলে বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির ঐতিহ্য

বিশ্বের প্রাচীন শিল্পমাধ্যমগুলোর মধ্যে পোড়ামাটির শিল্পকলা প্রাচীনতম। মিনিয়, মিশরীয়, মেসপটেমিয়, পারসিক, চৈনিক ও ভারতীয় সভ্যতার মত প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে ভাস্কর্যসহ অন্যান্য শিল্পসৃষ্টিতে পোড়ামাটির ব্যবহার দেখা যায়। আকার দানে সক্ষম উপাদানগুলোর মধ্যে মাটি সবচাইতে সহজলভ্য উপাদান হিসাবে প্রাচীনকাল থেকে জনপ্রিয় শিল্প-মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মাটির তৈরী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রোদে শুকিয়ে ব্যবহারের প্রচলন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু হয়েছে। মেসপটেমিয়ায় প্রাচীন সুমেরীয়গণ খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে হতে কাদা-মাটির ফলকে কিউনিফর্ম লিপির মাধ্যমে বহু সাহিত্য, রাজকীয় দলিল, ব্যবসা বানিজ্যের রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ করতেন। বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মেসপটেমিয়ায় প্রাপ্ত খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০০-১৭৫০ অব্দের একটি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ দেবী ইস্টারের ভাস্কর্যটি (বার্নি রিলিফ/Burney relief নামে পরিচিত)[১] এ সময়ের টেরাকোটা শিল্প-উন্নয়নের এক উজ্জ্বল নিদর্শন (চিত্র: ২.১)।

চিত্র: ২.১

প্রাচীন মিশরের 'ইউসাব্‌তি' (ushabti) সমাধি ক্ষেত্র হতে বহু পোড়ামাটির মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। গ্রীকগণ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য অলংকরণে প্রচুর টেরাকোটা ব্যবহার করেছেন। অলিম্পিয়া (Olympia) ও সেলিনাসের (Selinus) এর ভগ্ন মন্দিরগুলোতে এর উদাহরণ মেলে।[২] এখানে পাথরের ইমারতের উপর টেরাকোটা ফলক বসিয়ে দেয়াল অলংকরণের রীতিও প্রচলিত ছিল। গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে পোড়ামাটির বিচিত্র ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন শিল্প নিদর্শন যেমন- একক ভাস্কর্য, গুচ্ছ ভাস্কর্য (group sculpture) পোড়ামাটির দ্বারা নির্মিত হত। গ্রীকদের অনুসরণ করে রোমানগণও ভাস্কর্য, রিলিফ ও স্থাপত্য অলংকরণে টেরাকোটার ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন রোমের

১. 'Burney Ralief', Wikipedia, the free encyclopedia, E:/Burney_Relief TERRACOTTA. htm
২. On line (Walter Geer, "Terra Cotta in Architecture"), file:/// E: Terra Cotta in Architecture _National Building Art Center. htm, 11/13/2016, 7:57 PM

প্রতিষ্ঠাতা ইট্রুস্কানগণ প্রায়শই পাথরের পরিবর্তে পোড়ামাটির ভাস্কর্য তৈরী করতেন। এদের মধ্যে ‘sarcophagus of the spouses’ এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য (চিত্র: ২.২)।[১]

চিত্র: ২.২

বার্লিন, ল্যুভর, বৃটিশ মিউজিয়াম ও ইটালীর অনেক স্থানে গ্রেকো-রোমান টেরাকোটা নিদর্শনের সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে। রোমানগণ স্থাপত্যের ফ্রিজ ও স্তম্ভ অলংকরণে প্রায়ই পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করতেন। চৈনিক সভ্যতায়ও পোড়ামাটির শিল্পের প্রভূত ব্যবহার দেখা যায়। ২০৯-২১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট কিন-সি- হুয়াং এর সময় তৈরী হাজার হাজার টেরাকোটা সৈনিকের প্রাপ্ত নিদর্শন চীনে পোড়ামাটির শিল্পের জনপ্রিয়তার একটি উদাহরণ (চিত্র: ২.৩)। দুহাজার বছর আগেও চীনে পোড়ামাটির রিলিফ স্থাপত্য অলংকরণের (সমাধি ও অনান্য স্থাপনায়) একটি প্রচলিত মাধ্যম ছিল ।[২]

চিত্র: ২.৩

ভারতের ইতিহাসেও সুপ্রাচীনকাল হতে পোড়ামাটির শিল্পের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমাংশ তথা বর্তমান পাকিস্তানের কিছু অংশ ছিল মাটির তৈরী শিল্পকর্মের সূতিকা-গৃহ। এর প্রাচীনতম নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে বেলুচিস্তানের মেহেরগড়ে। এই স্থান হতে সাত হাজার থেকে পাঁচ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পোড়ামাটির নিদর্শন পাওয়া গেছে।[৩] এখান থেকে প্রাপ্ত মনুষ্য ও পশু মূর্তির মধ্যে কুকুর, কুঁজযুক্ত ষাঁড় এবং ক্ষুদ্র প্রতিমা মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রিষ্টপূর্ব তিনহাজার বছর আগে

১ .‘Terracotta’, Wikipedia, the free encyclopedia, 11/13/2016, 7:09PM
২ ‘Terracotta’, Wikipedia, the free encyclopedia, 11/13/2016, 7:09PM
৩. B.N. Mukherjee, Aspects of Indian Terracotta, *Indian Museum Bulletin*, vol-36, Calcutta, p.5

কুল্লি ও ঝোবের কৃষিভিত্তিক সভ্যতা হতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির বিভিন্ন নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় যে, পোড়ামাটির ব্যবহার সেই প্রাচীনকাল থেকে সাধারণ মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

এ অঞ্চলে আড়াআড়ি ভাবে রঙ করা হাতে তৈরী উঁচু কুঁজ ও স্থুলপদ যুক্ত ষাঁড়ে মূর্তি এত অধিক পরিমাণে পাওয়া গেছে যে পন্ডিতগণ ধারণা করেন যে, এগুলো সম্ভবত কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নৈবদ্যরূপে ব্যবহৃত হতো (চিত্র: ২.৪)।

চিত্র: ২.৪

দক্ষিণ ভারতের কিছু প্রত্নস্থল হতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিছু পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে।[১] তবে এদের সমসাময়িক পাথর, কাঠ বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রস্তুত কোন শিল্প নিদর্শন এখনও আবিস্কৃত হয়নি। পরবর্তীকালে হরপ্পার নগর সভ্যতা হতে বহু পোড়ামাটির মনুষ্য ও প্রাণীর ভাস্কর্য আবিস্কারের মধ্যে দিয়ে শিল্পকলায় পোড়ামাটির ব্যবহারের উজ্জ্বল উদাহরণ মেলে। এ সময়ের টেরাকোটা

ভাস্কর্যগুলো হতো হাতের চিমটির সাহায্যে বা আঙ্গুলের প্রয়োজনীয় চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে। ভাস্কর্যের চোখ, ঠোঁট, স্তন্য, অলংকার ইত্যাদি মাটির দলা আলাদা ভাবে বসিয়ে চিহ্নিত করা হত। সিন্ধু সভ্যতা হতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও খেলনাগুলোর পাশাপাশি কিছু পাথর ও ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য আবিস্কৃত হয়েছে তবে তাদের মডেলিং পোড়ামাটির ভাস্কর্যের মডেলিং থেকে ছিল বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। যদিও পাথরের তৈরী শিল্পের তুলনায় পোড়ামাটির শিল্পের গ্রহনযোগ্যতা নিতান্তই নগণ্য তবুও পোড়ামাটির শিল্পের বহুবিধ ব্যবহার যেমন- দৈনন্দিন ব্যবহার্য বাসনপত্র , গৃহসজ্জার উপকরণ সৃষ্টি, খেলনা, ধর্মীয় কাজে ব্যবহার্য বস্তু ও প্রশাসনিক কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক-সংস্কৃতিক কর্মসম্পাদনে পোড়ামাটির তৈরী বস্তু ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর থেকে ভারতবর্ষে পোড়ামাটির শিল্পচর্চা অব্যহত থাকে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের নিকট পোড়ামাটির শিল্পকলা সর্বাধিক জনপ্রিয়তা

১. C.C. Das Gupta, *Origin and Evolution of Indian Clay Sculpture*, Calcutta, University of Calcutta,1961, p.259

লাভ করে।[১] ভারতের বিভিন্ন প্রত্নস্থল বিশেষ করে সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রাপ্ত উদাহরণ এই মতকে আরও জোড়ালো করেছে । বস্তুত সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী পর্যায়ে মৌর্য পূর্বযুগে পোড়ামাটি ছিল একমাত্র শিল্প মাধ্যম।[২]

মৌর্যযুগ

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ-দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্যযুগের পোড়ামাটির শিল্প – মুখাবয়ায়ব ও প্রকাশ ভঙ্গির দিক দিয়ে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অধিকার করে আছে। মৌর্য ফলকগুলো ছিল অন্যান্য যুগের পোড়ামাটির ফলক হতে আকারে বড়। ফলকগুলো তৎকালীন প্রস্তর ভাস্কর্যের তুলনায় অমার্জিত, নীরস ও আদিম বৈশিষ্ট্য মন্ডিত।[৩]

চিত্রঃ ২.৫

মৌর্যযুগের পোড়ামাটির ভাস্কর্যগুলোর দেহ তৈরী করা হতো হাতে এবং এদের মুখোমন্ডল তৈরী হতো ছাঁচে। ভাস্কর্যগুলো ছিল পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার শোভিত (চিত্রঃ ২.৫) । মৌর্যযুগের পোড়ামাটির ফলকগুলোর বেশীরভাগ মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্র এবং তক্ষশীলা হতে পাওয়া গেছে। এছাড়া বুলান্দিবাগ, বিকনাপাহাড়, গোলকপুরসহ বিহারের বক্সার ও বাংলার তমলুক থেকে প্রাপ্ত কিছু ফলকের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় মৌর্যযুগের বলে ধারণা করা হয়। মৌর্যযুগের বেশীরভাগ ফলকগুলোতে ধর্মীয় চরিত্র যেমন-মাতৃকা দেবী বা ভূ-দেবী উপস্থাপিত হয়েছে।

সুঙ্গ যুগ

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতাব্দিতে সুঙ্গ যুগে ভারতীয় পোড়ামাটির শিল্পকলার ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময় মৌর্যযুগের বৃহদাকার ফলকের পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকৃতির এক বা একাধিক ভাস্কর্যযুক্ত ফলকের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। ভাস্কর্যগুলোতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নারীমূর্তি ও প্রাত্যহিক জীবনের আলেখ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সুঙ্গযুগে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলোর একটি বড় অংশ উপরিভাগে ছিদ্রযুক্ত যা থেকে ধারণা করা যায় যে, এগুলো দেয়ালে ঝোলাবার জন্য তৈরী করা হয়েছিল।[৪] ভাস্কর্যগুলো

---

১. S.K. Saraswati, *A Survey of Indian Sculpture*, Calcutta, Farma K.L., 1957, p. 97
২. C.C. Das Gupta, *Op.cit.*, p. 259
৩. E.J. Rapson (ed.), *Cambridge History of India*, vol. I, (reprint.),Delhi: S. Chand & Co., 1962, p. 5
৪. Stella Kramrisch, 'Indian Terracottas', *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, vol. VII, 1939, p.105

অধিকাংশই সমপদস্থানক ভঙ্গিতে দন্ডায়মান সেই সাথে এদের কেশবিন্যাসের আতিশয্য ও ভারী গহনায় বিভূষিত হতে দেখা যায় (চিত্র: ২.৬)। শিল্প সমালোচকগণ এই নারী মুর্তিগুলোকে যক্ষিণী রূপে বর্ণনা করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রত্নস্থল হতে সুঙ্গ যুগের টেরাকোটা আবিস্কৃত হয়েছে।

চিত্র: ২.৬

এর মধ্যে উত্তর প্রদেশের ভিটা, বিহারের লরিয়া-নন্দনগড়, মথুরা, বাংলার মহাস্থানগড় (বগুড়া), বানগড় (দিনাজপুর), গীতগ্রাম (মুর্শিদাবাদ) ও চন্দ্রকেতুগড় (উত্তর চব্বিশ পরগনা) এর নাম উল্লেখযোগ্য। সুঙ্গ যুগে একক-স্বাধীন মূর্তি ও রিলিফ দুই ধরনের টেরাকোটাই আবিস্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহস্থানগড় হতে প্রাপ্ত সুঙ্গ যুগের চিত্র ফলকগুলো আকারে ক্ষুদ্র (২" × ১.৫"-৩"× ১") হালকা রিলিফে উৎকীর্ণ। ফলকে উৎকীর্ণ নারী ভাস্কর্যগুলো যৌবন সমৃদ্ধ, অলংকার ও কেশ বিন্যাশের আতিশয্যে শোভিত। প্রতিমাগুলোর দেহের উর্দ্ধাংশে কোন বস্ত্র ব্যবহৃত না হলেও দেহের নিম্নাংশে (কোমর থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত) বস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলার চন্দ্রকেতুগড় হতে এই ধরনের টেরাকোটার প্রচুর নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে।[১] আবিস্কৃত প্রায় সবগুলো প্রতিমাই দন্ডায়মান অবস্থায় একহাত কোমরে ও অপর হাত কখনো দেহের পাশে সাধারণভাবে প্রলম্বিত অথবা কোমরবন্ধনী বা কানের দুল ধরা অবস্থায় উৎকীর্ণ হয়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দুই পা সমপদস্থানক ভঙ্গিতে উৎকীর্ণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমায় ও নৃত্যরত প্রতিমাও উৎকীর্ণ হয়েছে। সুঙ্গ যুগের কিছু বর্ণনামূলক টেরাকোটা আবিস্কৃত হয়েছে । এই সকল দৃশ্যের মধ্যে শিকার দৃশ্যও রয়েছে। সুঙ্গ যুগের টেরাকোটাগুলো ধর্মীয় ও লৌকিক উভয়

১. Enamul Haque, *Chandraketugarh: A Treasure-House of Bengal Terracottas*, Dhaka , ICSBA, 2001

উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তেই প্রস্তুত হত বলে মনে করা হয়। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত ফলক ও মূর্তিসমূহ ভারহুত, সাঁচী , বোধগয়া, মথুরা ও অমরাবতীর পাথরের ভাস্কর্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে শিল্পগুণ বিচারে মাটির তৈরী মূর্তিগুলো পাথরের মূর্তিগুলো হতে ছিল উন্নততর।[১]

শক-কুষাণ যুগ

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী-চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শক-কুষাণ শিল্প-বৈশিষ্ট্য উত্তর ভারত ছাড়িয়ে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে দেখা যায়। কুষাণগণ বাণিজ্যিক বিস্তৃতির সাথে সাথে এ অঞ্চলে তাদের শিল্প বৈশিষ্ট্যের প্রসার ঘটায়। কুষাণ শিল্পীগণ মডেলিং ও মোল্ডিং উভয় কৌশলেই পোড়ামাটির ফলক তৈরী করতেন। কখনো কখনো একটি ফলক তৈরীতে এ দুটি কৌশলের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বিহারের বাশার, উত্তর প্রদেশের ভিটা, সংকিমা, মথুরা ও মধ্যপ্রদেশের বেসনগর ও কোশাম হতে কুষাণ যুগের মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। বাংলার বানগড় (দিনাজপুর), চন্দ্রকেতুগড়, বেড়াচম্পা, আটঘরা, হরিনারায়ণপুর (চব্বিশ পরগনা), বাহেরি ও তমলুক (মেদনীপুর) হতে কুষাণযুগের টেরাকোটা মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। বাংলার পোড়ামাটির শিল্পীরা কুষাণ শিল্পীদের শিল্প-কৌশলগুলি রপ্ত করেছিলেন। আবার কোন কোন শিল্প ঐতিহাসিক এই সময় বাণিজ্য বিস্তারের পাশাপাশি ভাগ্যান্বেষী কুষাণ শিল্পীদের বাংলায় অভিবাসনের সম্ভাবনার কথাও ব্যক্ত করেছেন।[২] উত্তর ভারতে শকদের আগমন ও এই সময় রোম পর্যন্ত ভারতীয় বাণিজ্য বিস্তার বাংলার শিল্পকলায় হেলেনেষ্টিক[৩] শিল্প প্রভাবের সূচনা করে। ভারতীয় শিল্পকলায় হেলেনেষ্টিক শিল্পকলার আকার, মোটিফ ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারনার সংমিশ্রণে ভাস্কর্যের পিছনে হ্যালোর ব্যবহার, মুখে স্মীত হাসি যুক্ত প্রশান্তিময় অভিব্যক্তি যুক্ত হয়ে পোড়ামাটির ফলকগুলোকে আরো প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলে। এ সময়ের ফলকে উৎকীর্ণ রিলিফ ভাস্কর্যগুলি পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় আরো উন্নত ও প্রায় ত্রিমাত্রীক আবহ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এ সময় থেকে ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিমাগুলোকে প্রায়শই স্তম্ভযুক্ত প্যাভিলিয়নের মধ্যে দন্ডায়মান অবস্থায় উপস্থাপিত হতে দেখা যায় যাকে প্রাচীন বাংলার স্তম্ভ ও সর্দল ভিত্তিক নির্মাণ কৌশলের একটি অনন্য উদাহরণ বলা যায়। চন্দ্রকেতুগড় হতে টেরাকোটা

১. cf. *Archaeological Survey of India Annual Reports*, 1911-12, p.35

২. Enamul Haque, *op.cit*., p. 88

৩. সম্রাট আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারীদের সময় থেকে (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩-১০০ অব্দ) হেলেনেস্টিক শিল্পকলার সূচনা ধরা হয়। এটি মিশর থেকে ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত আলেকজান্ডার কর্তৃক বিজিত অঞ্চলে বিকশিত শিল্পরীতি। ব্যারোক (Baroque) থেকে আর্কাইস্টিক (Archaistic) পর্যন্ত সকল শিল্পরীতি এর অন্তর্ভূক্ত। (Edward Lucie-Smith, *The Thames and Hudson Ditionary of Art Terms*, London, Thames and Hudson, 1984, p. 98-99)

রিলিফে এই ধরনের বহু ফলক আবিস্কৃত হয়েছে। এ সময়ের ফলকগুলোতে গৃহস্থালী দৃশ্যসহ জনপ্রিয় গাঁথাগুলো সংযুক্ত হতে দেখা যায়।

গুপ্তযুগ

চতুর্থ-ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত গুপ্ত যুগকে ভারতীয় শিল্পকলার ধ্রুপদী যুগ বলা হয়। সারনাথ ছিল গুপ্ত যুগের শিল্পকলা বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু এর প্রভাব ও ঐতিহ্য বিস্তৃত ছিল পূর্বে তেজপুর হতে পশ্চিমে গুজরাট, মহারাষ্ট্র পর্যন্ত এবং উত্তরে কাশ্মীর হতে দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত। গুপ্তযুগে ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পকলার এই তিনটি শাখাতেই চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের সাথে সাথে পোড়ামাটির শিল্প ক্ষেত্রে প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। এসময় টেরাকোটা শিল্প অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং তা সেই সময় 'লেপাকর্ম' নামে পরিচিতি লাভ করে।[১] গুপ্তযুগে পোড়ামাটির শিল্পস্থাপত্যের সাথে সংযুক্ত হয়।[২] এরপর থেকে ভারতীয় পোড়ামাটির শিল্প দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। একটি ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্প অপরটি স্থাপত্য শিল্প।[৩] উপরোক্ত দুটি ধারাই ভারতীয় শিল্পে প্রচুর ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিশেষ করে গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রত্নস্থলগুলো হতে পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শন অধিক পরিমাণে আবিস্কৃত হয়েছে।

বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থল হতে গুপ্তযুগের পোড়ামাটির দ্রব্যাদি ও অলংকৃত ফলক আবিস্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশের পুন্ড্রবর্ধনভুক্তির বিভিন্ন স্থানে গুপ্তযুগের পোড়ামাটির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় হতে প্রাপ্ত মাটির সীল, পোড়ামাটির নারী মস্তক ও কিছু অলংকৃত ফলককে গুপ্ত যুগের নিদর্শন বলে মনে করা হয়।[৪] পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর জেলার বানগড় হতেও গুপ্ত যুগের বেশ কিছু পোড়ামাটির মূর্তি ও খেলনা পাওয়া গেছে। এছাড়া মেদনীপুরের তমলুক, মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি, গীতাগ্রাম, ও চব্বিশ পরগনা জেলার চন্দ্রকেতুগড় হতেও গুপ্তযুগের উল্লেখযোগ্য পোড়ামাটির নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে।

গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিমার অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলা । ভরাট মুখমন্ডল পুরু ঠোঁট, টিকালো নাক ইত্যাদি গুপ্তরীতির পরিচায়ক। ভাস্কর্যের অর্ধনিমীলিত চোখ ও ঠোটের কোনার মৃদু হাসির রেখা মুর্তির অভ্যন্তরীণ পরিতিপ্ত আত্মার মার্জিত প্রকাশ। গুপ্তযুগের পোড়ামাটির নিদর্শনগুলোর

---

১. Muhammad Hafizullah Khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture in Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1988, p. 57

২. A.K. Coomaraswamy, *History of Indian and Indonesian Art*, New York, Dover Publications Inc.1965, p.71

৩. Muhammad Hafizullah Khan, *op.cit*., p. 57

৪. Nazimuddin Ahmed, *Mahasthan*, Dhaka, Departmant of Archaeology and Museums, 1975, p. 35; মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ৯২

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এতে উপস্থাপিত ভাস্কর্যগুলো সমসাময়িক রুচি অনুযায়ী সুবিন্যাস্ত হয়েছে। নারী মূর্তিগুলোর পোষাক-পরিচ্ছদ, কেশবিন্যাশ অত্যন্ত আকর্ষণীয়, পুরুষ ভাস্কর্যগুলোর কোঁকড়ানো কেশ বিন্যাস যেন জর্জিয় পরচুলার কথাই মনে করিয়ে দেয়। কেশ বিন্যাসের এই রীতি ভাস্কর্যগুলোতে একটি রাজকীয় ভাব ফুটিয়ে তুলেছে (চিত্র: ২.৭) ।[১]

চিত্র: ২.৭

গুপ্তযুগে প্রস্তর মূর্তিকলার ন্যায় পোড়ামাটির শিল্পে কোন বিশেষ ধারা গড়ে উঠেনি। বিশেষ করে লৌকিক বিষয়বস্তু চিত্রণে শাস্ত্রীয় রীতি অনুসৃত না হয়ে বরং শিল্পীগণ তাদের কল্পনাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। পূর্ব যুগের ভারী গহনার সজ্জার মাধ্যমে কৃত্রিম সৌন্দয ফুটিয়ে তোলার পরিবর্তে গুপ্ত শিল্পীগণ প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তৎকালীন কাব্য সাহিত্যের অনুসরণে প্রতিকৃতির দৈহিক সৌন্দর্যের দিকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।[২] ভারতের উত্তর প্রদেশের কাসিয়া, কোশাম ও ভিটা, বেনারসের রাজঘাট, বিহারের বসার ও মধ্য প্রদেশের বেসনগর হতে গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে।

গুপ্ত যুগে অলংকৃত সৌধ নির্মাণের যে ধারা শুরু হয় তার প্রভাবে পোড়ামাটির শিল্পকলারও প্রসার ঘটে। এ যুগে ইটের তৈরী স্থাপত্যগুলো পোড়ামাটির চিত্রিত ফলক দ্বারা সজ্জিত করা হত যাতে ধর্মীয় ভাস্কর্য ছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণিক কাব্যের দৃশ্য , জনপ্রিয় কাহিনীর ও প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপিত

১. *Archaeological Survey of India Annual Reports*, 1909-10, p.41
২. cf. *Ancient India*, 4(1947-48), pp.137-38

হয়েছে। ফুল, লতা-পাতা, জীব-জন্তু ও মনুষ্য ভাস্কর্য সমৃদ্ধ এ যুগের বহু ফলক ভারতের বিভিন্ন প্রত্নস্থল হতে আবিস্কৃত হয়েছে। ভারতে ইটের তৈরী মন্দিরের মধ্যে কানপুর জেলার ভিতরগাঁও এর মন্দিরটি সর্বপ্রাচীন (পঞ্চম শতক) (চিত্র: ২.৮)। ভোগেল (Vogel) এই মন্দির থেকে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক আবিস্কার করেছেন।[১] এ.কে. কুমারেস্বামী (A.K. Coomaraswamy) এই ফলকগুলোর সময় গুপ্ত যুগ বলে নির্ধারণ করেছেন।[২]

চিত্র: ২.৮

কানিংহামের ধারণা, যেহেতু উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সমতলে পাথর সহজলভ্য ছিল না সেহেতু এই অঞ্চলে হিন্দু বৌদ্ধ উভয় স্থাপত্যই সন্দেহাতীতভাবে ইট দিয়ে তৈরী হয়েছিল। যার উদাহরণ মেলে প্রতিটি প্রাচীন প্রত্নস্থল হতে প্রাপ্ত প্রচুর খোদিত ও ছাচে নির্মিত ইট হতে। তাঁর ধারণা অনুযায়ী , ভারতে মুসলমানদের আগমনের সময় উত্তর ভারতে নিশ্চয়ই বহু পোড়ামাটির অলংকরণ শোভিত ইটের স্থাপত্য টিকে ছিল। মুলতানের সূর্য মন্দির, থানেশ্বরের জগসোম মন্দির, থানকিসা, কোসাম্বী ও শ্রাবস্তির বৌদ্ধ স্থাপত্য এবং উত্তর প্রদেশের বিলসার, ভিতরগাঁও, গড়োয়া ও ভিটারি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একই কারণে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ বাংলা ও বিহারেও প্রচুর ইটের মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। যার কিছু উদাহরণ বোধগয়া ও নালন্দার বৌদ্ধ স্থাপনাগুলো হতে পাওয়া যায়। এমনকি রূপবাস ও চুনারের পাথরখনির কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত মথুরা ও বেনারসে খোদিত ও ছাঁচে নির্মিত ইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া

১. *ASIAR*, 1908-09, p. 10, fig.-2
২. A.K. Coomaraswamy, *op.cit.*, p.87

গেছে।[১] স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের সূচনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মার্শাল বলেছেন যে, 'আমরা জানিনা কতদিন পর্যন্ত স্থাপত্যে ইটের এই অদ্ভুত শৈলীটি প্রচলিত ছিল তবে এ কথা বলা যায় যে এর সূচনা হয়েছিল গুপ্ত আমলেই'।[২]

ভিতরগাঁও মন্দিরের গায়ে যে পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায় তাতে দেব-দেবীর মুর্তি, নারী-পুরুষ, জীব-জন্তু, পাখি ও জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। জ্যামিতিক নকশার মধ্যে দাবার ছক ও প্যাঁচানো নকশাই প্রধান।[৩] কানিংহাম মন্দিরটির পোড়ামাটির ফলকগুলো বিশ্লেষণ করে এটিকে একটি বিষ্ণু মন্দির বলে ধারণা করেছেন।[৪] ভিতরগাঁও এর মন্দিরের ফলকগুলো ছিল ১৭ ইঞ্চি x ১০.৫ ইঞ্চি x ৩ ইঞ্চি পরিমাপের। ভিতরগাঁও ছাড়াও উত্তর প্রদেশের পারাউলি ও বার এ প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকযুক্ত মন্দির রয়েছে। এরা আকারে ভিতরগাঁও এর ফলকগুলো হতে ক্ষুদ্র (১৩ ইঞ্চি x ৮ ইঞ্চি x ২ ইঞ্চি)। ক্ষুদ্রাকৃতির অলংকৃত ইট গাঙ্গেয় সমতলে প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। নেপালের লুম্বিনী উদ্যান ও সারানাথে আবিস্কৃত বৌদ্ধ বিহারে এই ধরনের অলংকৃত ইটের উদাহরণ পাওয়া যায়। সারানাথে অলংকৃত ইটগুলো সর্ব নিম্ন ৮.৫ ইঞ্চি x ৭.৫ ইঞ্চি x ২ইঞ্চি থেকে সর্বোচ্চ ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত। মধ্য প্রদেশের শ্রীপুরে অবস্থিত গুপ্তযুগের লক্ষণ মন্দিরের (পঞ্চম শতক) ইটের ভাস্কর্য সম্বলিত প্যানেলগুলো উলম্বভাবে সাজানো। এই অঞ্চলের আরও অনেক ইটের মন্দির রয়েছে যেগুলো পোড়ামাটির অলংকরণ দ্বারা শোভিত। এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির অলংকরনের মধ্যে চক্রের মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্ম, বুনোট নকশা, মা ও শিশু উপস্থাপনসহ পত্রাদির নকশার প্রাচুর্য রয়েছে। উত্তর প্রদেশের অহিচ্ছত্র ও গুজরাটের দেবনিমুরী হতে স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক পাওয়া গেছে। উত্তর প্রদেশের সাহেথ-মাহেথ এর একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হতে প্রাপ্ত ফলকগুলোতে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনীর উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়। ১২ ইঞ্চি উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি চওড়া প্যানেলগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে ভোগেল ধারণা করেন, এগুলো ধারাবাহিকভাবে বসানো ছিল।[৫] এছাড়া বিকানির, বড়পাল, কাশাই, কুশীনগর,কাশ্মিরের হারওয়ান ও বিহারের চৌসা হতেও গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে।

---

১. A. Cunningham, *Archaeological Survey of India Report of Tours in the Gangetic Provinces from Badaon to Bihar in 1877-78*, New Delhi, Archaeological Survey of India, 2000, p.40
২. *ASIAR*, 1908-09, p.6
৩. *Ibid.*, p. 10
৪. A. Cunningham, *op.cit.*, p. 42
৫. *ASIAR*, 1907-8, p.96

এ সময় অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে বাংলার খোদাই শিল্পে সমসাময়িক উত্তর ভারতের শিল্পধারার ধারাবাহিকতাই লক্ষ্য করা যায়। তবে এর সাথে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলোও সমানভাবে উপস্থিত। এসময়ের যে কয়টি নিদর্শন বাংলা হতে পাওয়া গিয়েছে তার অধিকাংশই উত্তরবঙ্গ বা প্রাচীর পুন্ড্রবর্ধন হতে। তবে সমগ্র অঞ্চলে এ সময় মধ্য ভারতীয় গুপ্ত শিল্পধারার আঞ্চলিক রূপেরই প্রকাশ ঘটেছে।[১]

গুপ্তোত্তর যুগ

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতকে গুপ্তোত্তর যুগের পোড়ামাটির ফলকগুলোর প্রাপ্তি স্থানের মধ্যে নালন্দার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উত্তর প্রদেশের সেহেথ-মেহেথ ও কাশ্মীরের অবন্তিপুর হতেও গুপ্তোত্তর যুগের পোড়ামাটির ফলক আবিস্কৃত হয়েছে। বাংলায় গুপ্তোত্তর যুগের কিছু পোড়ামাটির ফলক মহাস্থানের গোবিন্দ ভিটা হতে পাওয়া গেছে। ফলকগুলোর মধ্যে দম্পতি যুগল (চিত্র: ২.৯) ও মায়ার স্বপ্নদৃশ্যের চিত্রযুক্ত ফলক রয়েছে।

চিত্র: ২.৯

ফলকগুলোর শিল্প বৈশিষ্ট্য বিচারে এস. কে. সরস্বতী (S.K. Saraswati) এদের গুপ্তোযুগের বলে মনে করেন।[২] অলংকৃত ইটে দন্ত নকশা, ছক নকশা, যুক্তপত্র, ত্রিকোণ নকশা, খিলান নকশা, ফুলের নকশা (সূর্যমুখী, পদ্ম, লিলি) ইত্যাদি নকশা দেখা যায়। মহাস্থানের অপর একটি প্রত্নস্থল গোকুল মেড় হতেও এই সময় কিছু ফলক চিত্র আবিস্কৃত হয়েছে। বাংলার পোড়ামাটির শিল্প তথা বাংলার শিল্পকলা

১. নীহারঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৪, পৃ. ৬৪৮-৬৪৯

২. S.K. Saraswati, *Early Sculptures of Bengal*, Calcutta, Sambadhi Publication pvt. Limited, 1962, p.107

সাধারণভাবে গুপ্ত আমল পর্যন্ত উত্তর ভারত ও গাঙ্গেয় উপত্যকার শিল্পের সাথে সংযুক্ত ছিল।[১] ধারণা করা হয় বাংলার শিল্পকলা গুপ্তোত্তর যুগ হতে উত্তর ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বকীয়তা অর্জন করে।[২] এই বিচ্ছিন্নতা পোড়ামাটি ও প্রস্তর উভয় ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকাল হতে বাংলার মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্যের জন্য মাটির তৈরী দ্রব্যাদির উপর নির্ভরশীল ছিল। এসব দ্রব্যাদির পাশাপাশি গৃহসজ্জার জন্য কুমারগণ মাটির চিত্রিত ফলক তৈরী করতে শুরু করেন। নীহারঞ্জন রায় একে 'কালধর্মী' শিল্প বলে অভিহিত করেছেন।[৩] এই ফলকগুলো কোন শিল্পশাস্ত্র অনুসরণে তৈরী হত না। ধর্মীয় বিষয়াদির পরিবর্তে প্রাত্যহিক জীবন চিত্রণের মাধ্যম ছিল এই শিল্প। সাধারণ মানুষের নিকট এই ধরনের পোড়ামাটির অলংকৃত ফলকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এই শিল্পকে কালজয়ী করে রেখেছে। মুসলিম-পূর্ব যুগে পোড়ামাটির শিল্প বানিজ্যিকভাবেও প্রস্তুত করা হত এবং বাংলার বাইরে তা রপ্তানী করা হত এর প্রমাণ রয়েছে।[৪] আরাকান,মায়ানমার ও নালন্দা হতে একাদশ শতকের বাংলা লিপি সম্বলিত এই ধরনের ফলক পাওয়া গেছে।[৫]

চিত্র: ২.১০

গুপ্তোত্তর যুগে ব্যা-রিলিফ (bas-relief) টেরাকোটা পূর্ব-ভারত তথা বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এই অঞ্চলে বিকশিত হয়ে স্থাপত্য শিল্প সজ্জার অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সময় স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলক চিত্রের উদাহরণ পাওয়া যায় – বামনপাড়া (বগুড়া), ময়নামতি ও

১. *Ibid*., p.63
২. Muhammad Hafizullah Khan, *Op.cit*, p. 63
৩. নীহারঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩৬
৪. N.K.Bhattasali, *Iconography of the Buddhist and Brahmonical Sculptures in the Dacca Museum*, Dacca, Dacca Museum Committee, 1929, p. XXII
৫. *প্রাগুক্ত*.

পাহাড়পুরের স্থাপত্যসমূহে। এর মধ্যে বামনপাড়ার নিদর্শনগুলো সপ্তম শতকের শেষ ভাগের।[১] বাংলায় নির্মিত মন্দির স্থাপত্যে প্রথম মহাকাব্যিক (রামায়ণ) দৃশ্যের উপস্থাপন এই ফলকগুলোতে দেখা যায়। ফলকগুলোর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলো লিপিযুক্ত। ফলকে চিত্রিত বিভিন্ন চরিত্রের পরিচয় ফলকের গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে। ফলকগুলো ৩০X ২০ সে.মি. আয়তনের (চিত্র: ২.১০) ।

দেব যুগ

ময়নামতির বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরগুলোতে পোড়ামাটির প্রচুর ফলকচিত্র প্রথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ময়নামতিতে প্রাপ্ত বৌদ্ধবিহারগুলোর মধ্যে সমতটের 'দেব' বংশের চতুর্থ রাজা ভবদেব কর্তৃক নির্মিত শালবন বৌদ্ধ বিহারটি সবচেয়ে বড়। বিহারটি উৎখননের ফলে ৭ম-১২শ শতকের বিভিন্ন প্রত্নবস্তু আবিস্কৃত হয়েছে। প্রায় বর্গাকারে নির্মিত বিহারটির মাঝখানে একটি মন্দির রেখে বিশাল অঙ্গনের চারদিকে এর কক্ষগুলো বিন্যাস্ত। বিহারের ভেতরের মন্দিরটি ক্রুশাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। ইটের তৈরী মন্দিরটির ভিত্তিভূমি জুড়ে অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকগুলো তৎকালীন বাংলার লোকায়ত শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন (চিত্র: ২.১১)। উপরুক্ত ফলকগুলোর বেশকিছু ইতস্তত পড়ে থাকতেও দেখা যায়। ফলকচিত্রগুলোতে উচ্চস্তরের শৈল্পিক দক্ষতার তেমন পরিচয় না থাকলেও তৎকালীন সমাজের জীবন ও সভ্যতার জীবন্ত চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে।[২] শালবন বিহারে প্রাপ্ত টেরাকোটা চিত্রফলকগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নর-নারীর মূর্তি, বিভিন্ন প্রাণী, স্বর্গীয় ও আধা স্বর্গীয় চরিত্র (কিন্নর-কিন্নরী), গাছ, ফুল-লতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র: ২.১১

১. Gouriswar Bhattacharya, *Essays on Buddhist, Hindu, Jain Iconography*, ICSBA, Dhaka, 2000, p.269
২. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, *মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুর*, ঢাকা, প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৬৭

ময়নামতির আনন্দ বিহার হতেও বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক উদ্ধার করা হয়েছে। বিহারটি সপ্তম শতকে নির্মিত। বর্গাকার এই বিহারের মাঝখানে রয়েছে একটি স্তুপের ক্রুশাকার ভিত্তি ভূমি। ভিত্তিভূমির চারধারের দেয়ালে এক সারি পোড়ামাটির চিত্রিত ফলক স্থাপন করা হয়েছে। ফলকগুলো বর্তমানে নিরাপত্তা জনিত কারণে ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[১] আনন্দ বিহারে প্রাপ্ত ফলকগুলি আকারে সবগুলো সমান নয় তবে ১৯ x ১১ x ৫ সে.মি. থেকে ৪০ x ২১ x ৬ সে. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। আনন্দ বিহার হতে প্রায় ৪৫টি চিত্র ফলক পাওয়া গেছে। ফলকগুলোতে ঘোড়সাওয়ার, কীর্তিমুখ, যোদ্ধা, ধনুরবিদ, বানর লড়াই, হাতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু চিত্রিত করা হয়েছে।

ময়নামতির রূপবান কন্যার বাড়ি ও ভোজ বিহার হতেও কিছু পোড়ামাটির ফলক আবিস্কৃত হয়। এদের মধ্যে উপ-দেবতা, কীর্তিমুখ, জীবজন্তু, মানুষ , লতা-পাতাসহ বিভিন্ন মটিফ উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলো আকারে বড় এবং একেবারে লোকায়ত পদ্ধতিতে তৈরী। এ সকল ফলক নির্মাণে কোন শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান বা কোন আদর্শ শিল্পরীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না।

পাল ও সেন যুগ

মুসলিম-পূর্ব বাংলায় সবচেয়ে বেশী পোড়ামাটির চিত্রিত ফলক আবিস্কৃত হয়েছে নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার (সোমপুর মহাবিহার) হতে। বিহারটি পাল সম্রাট ধর্মপাল কর্তৃক অষ্টম শতকে নির্মিত হয়েছিল। ধারণা করা হয় সোমপুর বিহার ছিল ভারতের বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার।[২] উৎখননের ফলে এই বিহারের মাঝখানে যে মন্দিরটি পাওয়া গিয়েছে সেটি ক্রুশাকার ভূমি পরিকল্পনার উপর ক্রমহ্রাসমান ধাপে অনেকটা পিরামিড আকারে নির্মিত। বর্তমানে এর তিনটি ধাপসহ প্রদক্ষিণপথ পাওয়া যায়। প্রদক্ষিণপথগুলোর প্রথমটি হতে দ্বিতীয়টি ১৬ ফুট উঁচু এবং দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টি ৭ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। পাহাড়পুর মন্দিরের বহির্দেয়াল অলংকরণে পোড়ামাটির চিত্র ফলকগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় দুই হাজার পোড়ামাটির চিত্র ফলক এখনও মন্দিরের গায়ে বিদ্যমান এবং আরও প্রায় আটশো ফলক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সংগৃহীত হয়েছে।[৩] ফলকগুলোর বেশীভাগ তাদের আদি অবস্থানে থাকলেও বর্তমানে ফলকগুলি দেয়ালগাত্র থেকে তুলে পাহাড়পুর জাদুঘরের স্টোরে রাখা হয়েছে।[৪] ফলকগুলো স্থাপনের ক্ষেত্রে কোন পরম্পর্য রক্ষা করা হয়নি। এরা আকারেও ভিন্ন। কিছু কিছু ফলক আকারে ১৬ ইঞ্চি

১. Abu Imam, *Excavations at Mainamoti an Exploratory Study*, International Centre for Study of Bengal Art, Dhaka, 2000, p.88
২. *ASIAR*, 1927-28, p. 106
৩. K.N. Dikshit, 'Excavations at Paharpur', Bengal, *MASI*, no.55, New Delhi, ASI, 1938, p.56
৪. *Ibid.*

x ১২ ইঞ্চি x ২.৫ ইঞ্চি আবার কিছু ফলক আকারে মাত্র ৬ বর্গইঞ্চি । প্রথম ও দ্বিতীয় তলে অন্তত দুই সারিতে ফলকগুলো সাজানো।

ফলকচিত্রগুলোর বিষয়বস্তু হিসাবে দেবতা, উপ-দেবতা, বিভিন্ন লোককাহিনী, জীব-জন্তু ,মানুষ, লতা-গুল্ম ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের দেবতাদের উপস্থাপন চোখে পরে। ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের মধ্যে শিব মূর্তি বিভিন্নরূপে সর্বাধিক ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে উৎকীর্ণ হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু , গণেশ ও সূর্য মূর্তি ।[১] বৌদ্ধ দেবতাদের মধ্যে বিভিন্ন আসনে সমাসীন বৌদ্ধ, বোধীসত্ত্ব, পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, মৈত্রেয়, তারা ইত্যাদি দেবতাগণ উপস্থাপিত হয়েছে। উপ-দেবতাদের মধ্যে রয়েছে গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরীর চিত্রফলক। ধর্মীয় দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কীর্তিমুখ, নাগ-নাগিনী, গড়ুর, চন্দ্র, ময়ূর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাহাড়পুর টেরাকোটায় কিছু মিশ্র প্রতিকৃতির জীবের উপস্থাপন চোখে পরে। এদের মধ্যে পাখির মাথা ও ডানাযুক্ত মনুষ্য দেহ, মানুষের মাথাযুক্ত পাখি অথবা ছাগলের শিং ও চিতার মত ছোপযুক্ত দেহের উপস্থাপন এখানে উল্লেখযোগ্য। পাহাড়পুরের মন্দিরের ফলকচিত্রগুলোতে বেশ কিছু প্রচলিত গল্পের দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের ‘কীলোৎপাটি বানরের গল্প’, ‘সিংহ ও খরগোসের গল্প’,‘কথা বলা গুহার গল্প’, ‘বন্ধুত্বের গল্প’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ঈশপের কিছু প্রচলিত গল্প স্থানীয় ধারায় উপস্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে ‘ইদুর ও সিংহের গল্প’ এর মত ‘হাতি ও ইদুরের গল্প’ এর দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। জঙ্গলী আদিবাসী শবর-শবরী এখানে বেশ কিছু ফলকে উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়।

চিত্র: ২.১২

১. K.N. Dikshit, Excavation at Paharpur, Bengal, *MASI*, no.55, New Delhi, ASI, 1938, republished in *Paharpur alias Sompur Mahavihara: A World Cultural Heritage Site*, ed. By Enamul Haque, ICSBA, Dhaka, 2014, p.185

বিচিত্র বিষয়বস্তুতে সজ্জিত এ মন্দিরের ফলকচিত্রগুলো লোকায়ত শিল্পের প্রাণ-আবেগপূর্ণ উপস্থাপন। শিল্পীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যমান সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই শিল্পের বিষয়বস্তু করে নিয়েছিলেন। রাজকীয় আড়ম্বরপূর্ণ সুক্ষ শিল্পবোধ অপেক্ষা লোকমানসের চরিত্র চিত্রণই পাহাড়পুর পোড়ামাটির ফলকচিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[১] তাই নর ও নারীর দৈনন্দিন কর্মের বিচিত্র উপস্থাপন ফলকগুলোর একটি বড় অংশ জুড়ে চিত্রিত হয়েছে। এর পাশাপাশি যোদ্ধা ও সন্ন্যাসীর উপস্থাপনও বাদ পরেনি। জীবজন্তুর মধ্যে ষাঁড়, হরিণ, বানর, বাঘ, সিংহ, ময়ূর, সাপ, হাতি, কুমির, গাধা, উট, ইদুর, হাঁস, মাছ, কচ্ছপ, টিয়াপাখি, মহিষ ইত্যাদি। প্রাণীবাচক চরিত্র চিত্রণে পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলক চিত্রগুলো এক অপূর্ব মহত্ব লাভ করেছে। ধর্ম ও সমাজ উপস্থাপনে গ্রামীণ শিল্পীদের সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনস্বীকার্য। তবে শিল্পমান বিচারে পোড়ামাটির এই শিল্প এখানে সম্পূর্ণতা লাভ করেনি (চিত্র: ২.১২) । এই ফলকগুলোতে চিত্রায়িত মূর্তিগুলোর দেহের গঠন প্রায়শই সমানুপাতিক নয় এবং অনাবশ্যক কাঠিন্য বিদ্যমান। প্রায় ক্ষেত্রেই আঁচড় কেটে হাতের ও পায়ের আঙ্গুল ও নখের রূপ দেওয়া হয়েছে।

মহাস্থানগড় হতে ৩-৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বগুড়ার ভাসু বিহার হতেও বেশ কিছু (প্রায় ৩৪টি) পোড়ামাটির চিত্রফলক আবিস্কৃত হয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর বিবরণিতে ৭ম শতকে বাংলা পরিভ্রমণের সময় মহাস্থানের নিকট 'পো-শি-পো' নামে এক বিশাল বৌদ্ধবিহারের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। লর্ড কানিংহাম যাকে ভাসু বিহারের সাথে অভিন্ন বলে মনে করেন।[২] তবে উৎখননকারীদের মতে বর্তমানে প্রাপ্ত বিহারটি দশম-একাদশ শতকের স্থাপনা।[৩] হিউয়েন সাং এর বর্ণনানুসারে বিহারটি আকারে বৃহৎ ও সুউচ্চ চুঁড়া বিশিষ্ট ছিল এবং এখানে প্রায় সাত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু অবস্থান করতেন। কিন্তু বর্তমানে এখানে যে দুটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে তাদের আকার ঐ সংখ্যক ভিক্ষুর অবস্থানের জন্য মোটেও পর্যাপ্ত নয়।[৪]

ভাসু বিহার হতে যে চিত্রফলকসমূহ পাওয়া যায় এগুলো ময়নামতি ও পাহাড়পুরের ফলকগুলোর অনুরূপ শিল্পধারার পরিচয় বহন করে তবে শিল্প সৃষ্টির দিক দিয়ে ভাসু বিহারের ফলকগুলোতে অধিক উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার চিত্রিত ফলকগুলো তুলনামূলকভাবে উন্নত মাটি দিয়ে তৈরী এবং ময়নামতি-পাহাড়পুরের ফলকগুলো হতে ভারী ও আকারে বৃহৎ। এদের বিষয়বস্তুও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ।

---

১. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

২. Alexander Cunningham, *Archaeological Survey of India Report, A Tour in Bihar abd Bengal in 1879-80 fron Patna to Sunargaon*, vol. XV, Delhi Rahul Publishing House, 1994 (first published 1882, Calcutta), pp.102-103

৩. এ.বি.এম. হোসেন (সম্পা), *বাংলাদেশর সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২, স্থাপত্য*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭,পৃ.২৮

৪. Enamul Haque, *The Art Heritage of Bangladesh*, ICSBA, Dhaka, 2007, p. 157-58

ভাসু বিহারে প্রাপ্ত চিত্র-ফলকগুলোতে অর্ধ-মানব ও অর্ধ-মৎস, অর্ধ-মানব ও অর্ধ-পুষ্প মোটিফ, কিন্নর-কিন্নরী, বিভিন্ন ভঙ্গিতে গ্রামীণ মানুষ, জীবজন্তু ইত্যাদি উৎকীর্ণ হয়েছে। মনুষ্য মূর্তির মধ্যে বেশ জনপ্রিয় এক শ্রেণির চিত্রফলক – নাজিমুদ্দিন আহমেদ যাদের 'রাজা-রাণী' এর চিত্র ফলক বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] মূর্তিগুলো জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্র-শস্ত্রে ও বিভিন্ন অলংকারে বিভূষিত (চিত্র: ২.১৩)।

চিত্র: ২.১৩

এছাড়া হাতি, শাবকসহ হরিণ, হাতির পিঠে সিংহ, কণ্ঠহার মুখে হংস ও ময়ূর প্রাণবন্ত ভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে। দশম-একাদশ শতকের এই স্বল্পন্নত চিত্র-ফলকগুলো দেব-পাল ধারা থেকে মুক্ত হয়ে বরং গুপ্ত শিল্পধারাকে অনুসরণ করেছে।[২]

মুসলিম-পূর্ব যুগের বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে আরও অনেক পোড়ামাটির নিদর্শন পাওয়া গেছে। দিনাজপুরের বানগড় হতে পাল আমলের বেশ কিছু পোড়ামাটির মূর্তি, ফলক, পুঁতি, খেলনা, গহনা ইত্যাদি আবিস্কৃত হয়েছে।[৩] ঢাকার সাভার হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ভঙ্গিমার বধিসত্ত্ব ও বৌদ্ধ মূর্তিসমূহের কোন কোনটি বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[৪] এছাড়া রংপুরের বিরাট এ পরিচালিত উৎখননের ফলে সেখান থেকে পাহাড়পুরের ন্যায় একটি মন্দির আবিস্কৃত হয়েছে। এই স্থান হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলক থেকে ধারণা করা যায় যে, এক সময় মন্দিরটির নিম্নাংশ পোড়ামাটির নকশায় অলংকৃত ছিল।[৫]

---

১. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.-৪২
২. M. Harunur Rashid, 'Bangladesh: A Profile in the Light of Recent Archaeological Discoveries', *Bangladesh Historical Studies*, III , 1978 p. 11
৩. K.G. Goswami, *Excavation at Bangarh*, Calcutta, University of Calcutta, 1948, p.9
৪. N.K. Bhattasali, *op.cit.*, p. 31
৫. *ASIAR*, 1925-26, p. 113

প্রাক-মুসলিম যুগের টেরাকোটাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গুপ্তযুগের পূর্ব পর্যন্ত টেরাকোটা – ভাস্কর্য, গৃহসজ্জার উপকরণ, গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত হাড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন, খেলনা, বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত সিল ও সিলমোহর ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হত। গুপ্তযুগ হতে এদের পাশাপাশি স্থাপত্য অলংকরণে টেরাকোটা ফলকের ব্যবহার দেখা যায়। ফলকগুলো আকারে বড় ও সারিবদ্ধ ভাবে মন্দির প্রদক্ষিণ-পথের দেয়ালে নিবদ্ধ থাকতো। মুসলিম-পূর্ব যুগের পোড়ামাটির অলংকরণগুলো অধিকাংশই ছিল জীবন্ত ও উদ্ভিজ্জ মোটিফ সম্বলিত। দেব-দেবী, মানুষ, বিভিন্ন জীবজন্তু ও লতা-গুল্ম ভাস্কর্য ও স্থাপত্য অলংকরণে ব্যবহৃত হত। তবে দশম শতকের পর স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণ প্রায় দেখাই যায় না। এগারো শতক হতে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত স্টাকো[১] এবং পাথরের খোদাই নকশাই স্থাপত্য অলংকরণের প্রধান মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদাহরণ পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত বহুলারা ও বর্ধমান জেলার সাত দেউলিয়ার মন্দিরসমূহ থেকে।[২] মুসলমানদের বাংলায় আগমনের পর স্থাপত্য ক্ষেত্রে পুনরায় পোড়ামাটির অলংকরণের ব্যবহারের সূচনা হয় এবং মুসলিম কলা-কৌশল ও চিন্তাধারার সমন্বয়ে তা নবজীবন লাভ করে।

১. স্টাকো: পঙ্কের কাজ

২. D. McCutchion, *Late Mediaeval Temples of Bengal*, Calcutta, The Asiatic Society, 1972, p. 13

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার বাইরে মুসলিম স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণ ঐতিহ্য

মুসলিম শাসনামলে পোড়ামাটির অলংকরণের ব্যবহারের সূচনা হয় আব্বাসীয়দের ইটের তৈরী স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে। উমাইয়া শাসনের কেন্দ্রভূমি সিরিয়ায় পাথরের সহজলভ্যতার কারণে সিরিয়া কেন্দ্রীক উমাইয়া স্থাপত্যে পাথরের ব্যবহারই সার্বজনীনতা লাভ করে।[১] পারসিক সমর্থনপুষ্ট আব্বাসীয়দের শাসনামলের প্রথমদিকে উমাইয়া স্থাপত্যের ধারা অনুসৃত হলেও খলিফা আল-মনসুরের সময় আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হয় (৭৬২ খ্রি.) । ফলে আব্বাসীয় স্থাপত্য পূর্বাঞ্চলীয় ঐতিহ্যের সংস্পর্শে আসে। ইরাক ও পারস্যে ইটের স্থাপত্য ঐতিহ্যের প্রভাবে আব্বাসীয় স্থাপত্যে ইটের প্রয়োগ প্রায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। আব্বাসীয় শাসনামলে নির্মিত বিভিন্ন নগর, প্রাসাদ ও মসজিদসহ সকল ধরণের স্থাপত্য পোড়ানো ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। ইরাক আব্বাসীয় শাসনের কেন্দ্র হলেও পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকার কায়রোয়ান মসজিদ (৮৩৬ খ্রি.) ও পূর্বে নিশাপুর ও বুখারা পর্যন্ত এই রীতিতে স্থাপত্য চর্চা হয়েছে। স্থাপত্য নির্মাণ উপাদান হিসাবে ইট ব্যবহৃত হলেও এ সময় স্থাপত্য অলংকরণের প্রধান মাধ্যম ছিল স্টাকো । তবে ৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে আল-মনসুর প্রতিষ্ঠিত রাক্কা নগরীর একটি প্রবেশ তোরণ (যা বাগদাদ তোরণ নামে পরিচিত) এ প্রবেশপথের পার্শ্ববর্তী বদ্ধ খিলান গর্ভে যে ইটের নকশাকৃত অলংকরণ দেখা যায় তাতেই পরবর্তীকালে পারস্য ও সেলজুক স্থাপত্যে বিকশিত ইটের কৌশলী স্থাপনে সৃষ্ট নতুন ধরণের অলংকরণ পদ্ধতি অঙ্কুরায়িত হয়ে ছিল বলে মনে করা হয়।[২] ইটের বিন্যাসে অলংকরণ সৃষ্টির প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় বুখারায় অবস্থিত সামানীদ সমাধিতে (আনুমানিক ৯১৪-৯৪৩ খ্রি.)। ধারণা করা হয় মধ্য এশিয়া থেকে ইটের কৌশলী বিন্যাসের (অলংকৃত বা অলংকার বিহীন ইটের) স্থাপত্য নির্মাণ ও অলংকরণের এই ধারাটি পশ্চিমে ইরান, ইরাক ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।[৩]

মুসলিম স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক নকশা (terracotta) কবে থেকে অলংকরণ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নির্ণয় করা খুবই দূরহ। সাধারণত হাতে বা ছাঁচে নির্মিত পোড়ামাটির নকশা টেরাকোটা নামে পরিচিত যা

---

১. এ.বি.এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ১৬১

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬

৩. Muhammad Hafizullah Khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture in Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1988, p. 38

পারস্যে দশম শতকের শেষভাগ হতে ইট বা স্টাকো নকশার সাথে সংযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ধারণা করা হয় ইটের বিন্যাস কৌশল (brick setting technique) দ্বারা সুক্ষ্ম অলংকরণ সৃষ্টি বাঁধাগ্রস্থ হলে টেরাকোটা অলংকরণের সূচনা ঘটে।[১]

টেরাকোটার অলংকরণরীতি প্রাচীন পারস্যে পরিচিত ছিল। মধ্য এশিয়ার পার্থিয়ানগণও (খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক) তা ব্যবহার করেছেন। তবে মুসলিম স্থাপত্যে দশম শতক হতে ইরান, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় টেরাকোটার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম স্থাপত্যে টেরাকোটা অলংকরণের প্রাথমিক নিদর্শন বর্তমানে একটিও টিকে নাই। এর বিকশিত রীতির সর্বপ্রাচীন প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো এগার শতকের প্রথম দিকের।[২] এদের বেশীরভাগ পূর্ব ইরান ও মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত।

বর্তমানে রাজনৈতিক সীমানা বিভাজনে মধ্য এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো কয়েকটি স্বাধীন দেশের মধ্যে বিভাজিত হয়ে গেছে। এর মধ্যে কাজাখিস্তান, কিরগিজিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কেমিনিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমারেখার অভ্যন্তরে অধিকাংশ স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক ও লিপির ব্যবহার দেখা যায়। এদের মধ্যে উজবেকিস্তানের তিমে অবস্থিত আরব আতার সমাধিটি সর্বপ্রাচীন (৯৭৭-৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ)। একটি ত্রিকোণাকার পাহাড়ের উপর নির্মিত সমাধিটি সামানীদ শাসক নূর মনসুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সমাধি ভবনটি বর্গাকার ও গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত । এর প্রবেশপথটি উঁচু পিশতাক যুক্ত।

চিত্র: ৩.১

চিত্র: ৩.১ক

মূল প্রবেশপথটি একটি অর্ধগম্বুজসম্বলিত বৃহৎ খিলানের মধ্যে নির্মিত হয়েছে। বৃহৎ খিলানটির উপরে তিন খিলান বিশিষ্ট একটি গ্যালারি রয়েছে। সমাধির অলংকরণসমূহ পিশতাকের ফ্রেম, বৃহৎ খিলানের স্প্যানড্রিল, অর্ধগম্বুজের

১. A.U. Pope, *A Survey of Persian Art*, vol. II, London, Oxford University Press, 1939, p. 1290
২. A.U. Pope, *Ibid*., p. 1321

অভ্যন্তরসহ সমগ্র দেয়াল জুড়ে বিস্তৃত। দেয়াল অলংকরণে ইটের কৌশলী বিন্যাস, স্টাকো ও পোড়ামাটির নকশা ফলক ব্যবহৃত হয়েছে (চিত্র: ৩.১ ও ৩.১ক) ।

উজবেকিস্তানে এগার-বার শতকে নির্মিত বেশ কিছু কারাখানিদ স্থাপত্যে টেরাকোটার ব্যবহার দেখা যায়। এদের মধ্যে একটি হল মোঘাক-ই-আত্তারির মসজিদ। বুখারায় নির্মিত মসজিদটি বার শতকে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে বহুবার সংস্কার সাধিত হয়েছে । ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মসজিদের বার শতকে নির্মিত প্রবেশতোরণটি উদ্ধার করতে সক্ষম হন।[১] প্রবেশতোরণ ও এর ফ্রেম টেরাকোটা, ইট ও পলেস্তরার সম্মিলিত নকশায় সজ্জিত (চিত্র: ৩.২ ও ৩.২ক) ।

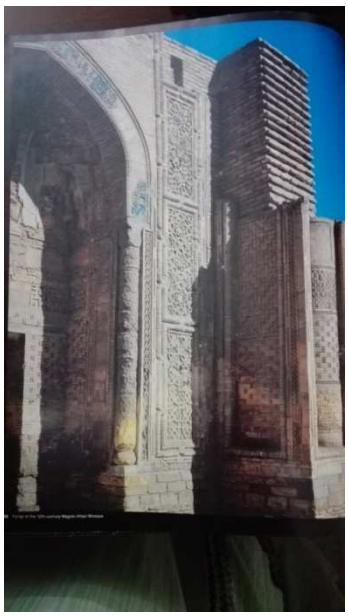

চিত্র: ৩.২

চিত্র: ৩.২ক

মসজিদের প্রবেশ-খিলানের দুই পার্শ্বে উল্লম্বভাবে বিন্যস্ত আয়তাকার তিনটি করে প্যানেল রয়েছে। প্যানেলগুলো দুটি পোড়ামাটির নকশাযুক্ত পাড় দ্বারা উভয় পার্শ্বে সীমাবদ্ধ। প্রতিটি প্যানেল স্টাকো নির্মিত জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত। জ্যামিতিক নকশা দ্বারা সৃষ্ট প্রতিটি খোপে পোড়ামাটির বিভিন্ন প্যাটার্ণ স্থাপন করে সমগ্র নকশাটিকে আকর্ষনীয় করে তোলা হয়েছে। পোড়ামাটির নকশাগুলো বেশীরভাগই লতা ও ফুলের মোটিফ সম্বলিত। নকশাগুলো ক্ষুদ্র পরিসরে মোটামুটি সুক্ষভাবে উৎকীর্ণ। ১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত বুখারার কালান মিনারে ইটের কৌশলী সজ্জা দ্বারা সৃষ্ট জ্যামিতিক নকশার অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্যাটার্ণ সম্বলিত ক্ষুদ্র মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে।

১. *Central Asia, Gems of 9th Century Architecture,* Moscow, Planeta Publisher, 1987, p. 98

কিরগিজিস্তানের ইউজেন্দ এ কারাখানি শাসকদের আরও তিনটি সমাধি রয়েছে। সমাধিগুলো দেখতে একই রকম ও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। সাধারণভাবে এদের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণের সমাধি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে মাঝখানের সমাধিটি তুলনামূলকভাবে উঁচু ও প্রাচীনতম। উত্তরের সমাধিটি ১১৫২-৫৩ খ্রি. ও দক্ষিণেরটি ১১৮৭ খ্রি. নির্মিত। উভয় সমাধিই টাইল, টেরাকোটা ও ইটের অলংকরণে সজ্জিত। সমাধিতে ইটের কৌশলী বিন্যাসে সৃষ্ট নকশাই প্রাধান্য পেয়েছে তবে এর সাথে কিছু টেরাকোটা সম্পূরক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মোটিফ হিসাবে জ্যামিতিক ও লতা নকশাই টেরাকোটা অলংকরণের প্রধান উপজীব্য। দক্ষিণের সমাধিটি সর্বাধিক পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ। পোড়ামাটির নকশাগুলো এখানে প্রান্তবিহীন লতানো। কোন কোন ক্ষেত্রে জ্যামিতিক নকশার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলক স্থাপন করা হয়েছে। ফলকগুলোতে তিনপত্র যুক্ত নকশা, তারকা বা অন্য কোন প্যাটার্ণ উপস্থাপিত হয়েছে।

চিত্র: ৩.৩

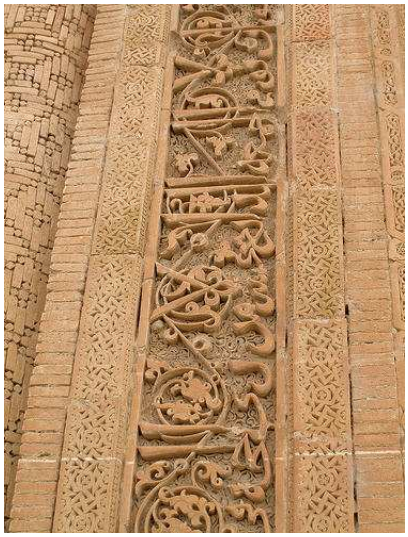

চিত্র: ৩.৩ ক

দক্ষিণের সমাধির প্রবেশ-খিলান ঘিরে একটি লিপি যুক্ত ফ্রেম রয়েছে। লিপিটি স্বল্প উন্নত লতা নকশার পটভুমিতে উচ্চ রিলিফে উৎকীর্ণ। উৎকীর্ণ লিপির সম উচ্চতায় একটি লতা সমগ্র লিপিটিকে অপূর্ব ছন্দে বেষ্টন করে সমগ্র ফ্রেমটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে (চিত্র: ৩.৩ ও ৩.৩ ক) ।

১১৫৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত সেলজুক সুলতান সানজারের সমাধিটি মধ্য এশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন। সমাধিটি বর্তমানে তুর্কিমিনিস্তানের অন্তভূক্ত। মসজিদ সম্বলিত তারিখযুক্ত সমাধি স্থাপত্যের এটি প্রাচীনতম উদাহরণ।[১] সাতাশ মিটার পার্শ্ব বিশিষ্ট বর্গাকার এই সমাধির দেয়ালের উপর দিকে একসারি ক্ষুদ্র খিলানশ্রেনী যুক্ত

১. Richard Ettighausen & Oleg Grabar, *The Art and Architecture of Islam 650-1250,* Harmondsworth, Penguin Books, 1987, p. 270

একটি গ্যালারি রয়েছে। আটত্রিশ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট সুলতান সানজারের সমাধিটি এর উঁচু গম্বুজের জন্যও প্রসিদ্ধ। সানজারের সমাধি অলংকরণেও পলেস্তরা, ইট ও টেরাকোটা নকশার ব্যবহার দেখা যায়। এখানে সম্মুখ দেয়ালের উর্ধ্বাংশে গ্যালারির খিলান তলে (soffit) টেরাকোটার অপূর্ব লতা নকশা দেখা যায় (চিত্র: ৩.৪ ও ৩.৪ ক)।

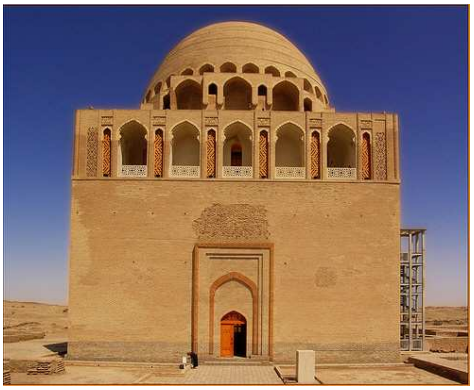

চিত্র: ৩.৪

চিত্র: ৩.৪ ক

এছাড়া পলেস্তরা নকশার মধ্যে পোড়ামাটির ক্ষুদ্র ফলক নকশার সন্নিবেশ এ সময়কার অন্যান্য স্থাপত্যের মত এই ইমারতেও অনুসৃত হয়েছে। এগার শতকে নির্মিত মার্ভের তালখাতান বাবা মসজিদটিতেও পোড়ামাটির অলংকরণের প্রাচুর্য ছিল । বর্তমান কাজাখিস্তানের তালাসে অবস্থিত আয়শা বিবির সমাধিটি পোড়ামাটির অলংকরণের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। একটি কৌনিক গম্বুজ সম্বলিত এটি একটি বর্গাকার ইমারত।

চিত্র: ৩.৫

চিত্র: ৩.৫ ক

ভবনটির চার কোণে চারটি সরু পার্শ্ব বুরুজ রয়েছে। সমাধিটির বহিরগাত্র সম্পূর্ণটাই পোড়ামাটির অলংকরণে ঢাকা। দেয়াল আচ্ছাদনে যে সকল নকশা ফলক ব্যবহৃত হয়েছে তা আকারে ছোট, জ্যামিতিক ও ফুলেল প্যাটার্ণের সমন্বয়ে সজ্জিত। সমাধির পার্শ্বস্তম্ভসমূহও পোড়ামাটির অনিন্দ সুন্দর ফুলেল নকশা সমৃদ্ধ। ভবনটিতে

প্রায় ষাটটি ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্ণের নকশা রয়েছে। স্থাপত্য পরিকল্পনা ও অলংকরণে এর সাথে বোখারার সামানীদ সমাধির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র সমাধিগাত্রে বিভিন্ন প্যাটার্ণের পোড়ামাটির নকশা ইমারতের গায়ে আলো-ছায়া সৃষ্টির মাধ্যমে সমাধিটিকে কোমলতা দান করেছে। শুধুমাত্র পোড়ামাটির নকশায় অলংকৃত আয়শা বিবির সমাধিটি এই দিক দিয়ে মধ্য এশিয়ার একটি দূর্লভ স্থাপত্য (চিত্র: ৩.৫ ও ৩.৫ ক)।

বর্তমান আফগানিস্তান সীমানায় প্রাপ্ত স্থাপত্যসমূহের মধ্যে লস্করীবাজারে অবস্থিত এগার শতকে নির্মিত[১] কালা-ই-বিস্ত এর খিলানটি উল্লেখযোগ্য। এখানে পলেস্তরার জ্যামিতিক নকশার মধ্যে বিভিন্ন প্যাটার্ণে খোদিত পোড়ামাটির ক্ষুদ্র ফলকগুলো বসিয়ে খিলানটি অলংকৃত করা হয়েছে। পোড়ামাটির অলংকরণ রুচি ও কৌশলের দিক দিয়ে এখানে প্রায় পূর্ণাঙ্গতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[২] লস্করীবাজার প্রাসাদের দরবার কক্ষের দেয়ালের উপরের অংশে টেরাকোটা অলংকরণের নিদর্শন পাওয়া যায়। এদের কিছু সংখ্যক বর্তমানে কাবুল জাদুঘরের রক্ষিত আছে।[৩] এছাড়া এগার শতকে নির্মিত রিবাত-মাহী হতে প্রাপ্ত কিছু পোড়ামাটির ফলকও বর্তমানে কাবুল জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। গজনীতে অবস্থিত তৃতীয় মাসুদ ও বাহারাম শাহর বুরুজ দুটিতে পোড়ামাটির অলংকরণের চমৎকার নিদর্শন রয়েছে। বুরুজ দুটি যথাক্রমে ১০৯৯-১১১৫ খ্রিষ্টাব্দ ও ১১১৭-৪৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তারকা আকৃতির ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত । মাসুদের বুরুজের উপর দিকে আরবী লিপি ও এর আশপাশের স্থানে লতা নকশার বেশ সুক্ষ্ম ও নিপুণ অলংকরণ চোখে পরে (চিত্র: ৩.৬ ও ৩.৬ ক)।

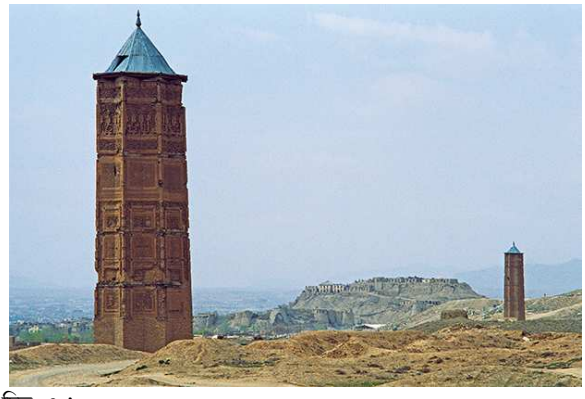

চিত্র: ৩.৬

চিত্র: ৩.৬ ক

একই ধরনের সংযুক্ত লতা বুরুজের অন্য আরো প্যানেলে উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়। এখানে উপস্থাপিত লতা ও লিপির মেল-বন্ধন, রুচি, কৌশল ও নান্দনিকতায় পোড়ামাটির শিল্পকে এক বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল।

১. Richard Ettighausen & Oleg Grabar, *op.cit.*, p. 287
২. A.U. Pope, *op.cit.*, p. 1321
৩. Muhammad Hafizullah Khan, *op.cit.*, p.42

পোড়ামাটির শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ইরানে নির্মিত স্থাপত্যসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। একাদশ শতকে ইরানে নির্মিত বেশ কিছু সমাধি বুরুজের নিদর্শন পাওয়া যায় যেখানে পোড়ামাটির ব্যবহার লক্ষনীয়। উদাহরণ স্বরূপ ৪১৩ হিজরী (একাদশ শতকের প্রথমার্ধ) তে নির্মিত মাজেন্দ্রান প্রদেশের অবস্থিত বুরুজে-ই-লাজিম (চিত্র: ৩.৭ ও ৩.৭ ক), ১০২১ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত দামগানের পীর-ই-আলমদারের সমাধি (চিত্র: ৩.৮ ও ৩.৮ ক) ও ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত চেহেল দুখতারানের সমাধির (চিত্র: ৩.৯) কথা বলা যায়। এ ধরনের সমাধি বুরুজের সমগ্র গাত্র ইটের কৌশলী বিন্যাসে নির্মিত ও সজ্জিত হত। গম্বুজ আচ্ছাদিত বুরুজগুলোর উপরের দিকে ফ্রিজ বিভিন্ন ধরণের নকশা, লিপি ও নির্মাণের মাধ্যমে অলংকৃত করার প্রচলন ছিল। পোড়ামাটির ব্যবহার এক্ষেত্রে কুফীক রীতির লিপি উপস্থাপনে অধিক ব্যবহৃত হয়েছে। এদের মধ্যে বুরুজ-ই-লাজিমে পাহলভী ও আরবী দুই ভাষাতে প্রতিষ্ঠা লিপি উৎকীর্ণ হয়েছে। পীর-ই-আলমদারের সমাধি বুরুজের প্রবেশ খিলানের পোড়ামাটির ফলকে বরফি ও পুঁতি নকশা দেখা যায়। নকশাগুলো বেশ স্থুল ও অপরিপক্ক। ১১০৪-১৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত গুলপয়গানের মিনারে জ্যামিতিক নকশার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ফলকে পোড়ামাটির নকশার উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়।[১] সিমনান প্রদেশের বোস্তাম শহরে অবস্থিত ১১২০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত বায়জিদ বোস্তামীর সমাধিটি ইরানের একটি উল্লেখযোগ্য ইমারত। সমাধি কমপ্লেক্সের সবচেয়ে আকর্ষনীয় অংশ হল এর প্রবেশদ্বার (চিত্র: ৩.১০ ও ৩.১০ ক)। প্রবেশ খিলানটি একটি অর্ধ গম্বুজযুক্ত ইওয়ানের অভ্যন্তরে স্থাপিত। ইওয়ানটি পাঁচটি বর্ডার বিশিষ্ট ফ্রেমে আবদ্ধ। প্রতিটি বর্ডার নীল রঙের জ্যামিতিক রেখায় সজ্জিত। জ্যামিতিক নকশায় সৃষ্ট বিভিন্ন আকৃতির খোপে এদের আকার অনুযায়ী স্বল্প উন্নত রিলিফে (low relief) টেরাকোটা ফলক তৈরী করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। টারকোয়েজ নীলের মধ্যে পোড়ামাটির লালচে ফলকগুলো রঙের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে অলংকরণে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে। স্টাকো অলংকরণের অভ্যন্তরে স্থাপিত টেরাকোটার ক্ষুদ্র ফলক দিয়ে অলংকরণ সৃষ্টির কৌশলটি সেলজুক আমলে বেশ জনপ্রিয় ছিল। ইস্ফাহান মসজিদের ক্ষুদ্র গম্বুজ কক্ষের খিলান-পটহে ও বৃহৎ গম্বুজ কক্ষের স্কুইঞ্চে এই ধরনের নকশার ব্যবহার দেখা যায়। চতুর্দশ শতকে নির্মিত ভেরামিন জামে মসজিদে গম্বুজ কক্ষের দেয়ালের উর্ধ্বাংশে ইটের নকশার মধ্যে ক্ষুদ্র ফলকে বিভিন্ন প্যাটার্ণে টেরাকোটার সুক্ষ্ম নকশা উপস্থাপিত হয়েছে। একই শতাব্দিতে নির্মিত ইস্ফাহানের নাতানজের খানকাহ (১৩১৬-১৭ খ্রি.), আশতর জামে মসজিদ (১৩১৬ খ্রি.), ইয়াজদ এর মসজিদ-ই-জামি (১৩২৪) তে পোড়ামাটির অলংকরণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ মেলে।

১. A.U. Pope, *op.cit.*, p.1322

চিত্র: ৩.৭

চিত্র: ৩.৭ ক

চিত্র: ৩.৮

চিত্র: ৩.৮ ক

চিত্র: ৩.৯

চিত্র: ৩.১০

চিত্র: ৩.১০ ক

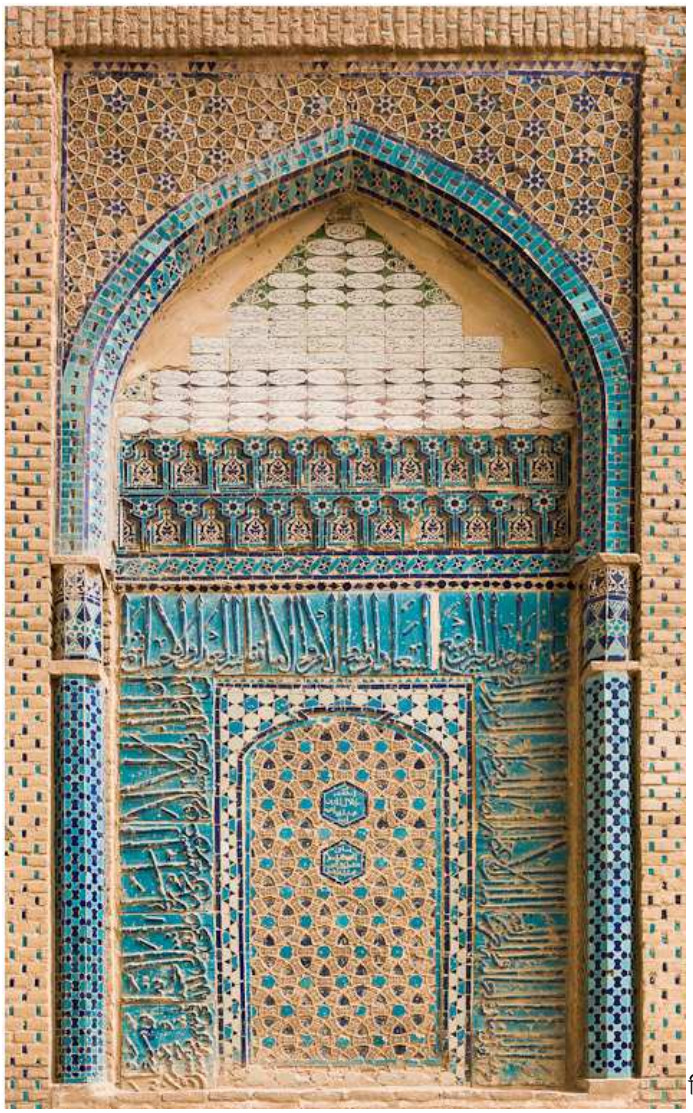

চিত্র: ৩.১১

ইয়াজদের মসজিদে পোড়ামাটির অলংকরণগুলো অত্যন্ত সুক্ষ্মতার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানকার ফলকগুলোতে বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু সংখ্যক প্যাটার্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। ক্ষুদ্র ফলকে নিপূণভাবে উৎকীর্ণ ফলকগুলো সম্ভবত ছাঁচে নির্মিত কেননা হাতে তৈরী ফলকে এই পর্যায়ের সক্ষ্মতা অর্জনে সময় ও অর্থ দুই দিক দিয়েই বিষয়টি ব্যয়বহুল।[১] চৌদ্দ শতকের প্রথম থেকে আরম্ভ করে সমগ্র পনের শতক জুড়ে জ্যামিতিক রেখার মাঝে টেরাকোটার সুক্ষ অলংকরণের শৈলীটি চর্চিত হয়েছে। ইয়াজদের জামি মসজিদ ও নাতানজের খানকাহ (চিত্র: ৩.১১) এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ইরান ও মধ্য এশিয়ার পাশাপাশি এশিয়া মাইনরের সেলজুক স্থাপত্যে টেরাকোটার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আজারবাইজানের নাখিশেভনে বেশ কিছু স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ইউসুফ ইবন কাথির ও মরিয়ম খাতুনের সমাধির কথা বলা যায় যেখানে স্টাকো ও ইটের কাজের সাথে উন্নত টেরাকোটা ব্যবহৃত হয়েছে। মনে করা হয় এই নাখিশেভানের পথ ধরেই এই টেরাকোটা অলংকরণের এই কৌশলটি এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেছিল।[২] এছাড়া তের শতকে মোঙ্গল আক্রমনের ফলশ্রুতিতে বহু শিল্পী ইরান থেকে অনত্র প্রস্থান করেন। এই সকল দেশান্তরিত ইরানীয় শিল্পীদের প্রভাবেও সেখানকার সেলজুক স্থাপত্যে টেরাকোটার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময় তৈমুরীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় (১৩৬৯-১৫০০ খ্রি.)। তৈমুরীয়গণ তাদের স্থাপত্য অলংকরণে চকচকে ও রঙ্গিন টালির ব্যবহারে অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। চকচকে রঙ্গিন টালির ব্যবহার সাফাভীয় শাসনামলেও (১৫০০-১৭৩৬ খ্রি.) অব্যহত থাকে। এ সময় পারসিক স্থাপত্যে টেরাকোটার ব্যবহার সংকুচিত হয়ে পরে। পারস্যের স্থাপত্য হতে পোড়ামাটির অলংকরণ গুরুত্ব হারালেও চৌদ্দ-পনের শতক হতে বাংলার স্থাপত্যে এই অলংকরণ মাধ্যমটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অলংকরণ শিল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী প্রায় ছয়শত বছর অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে বাংলার স্থাপত্যে চর্চিত হয়।

১. A.U. Pope, *Ibid.*
২. Muhammad Hafizullah Khan, *op.cit.*, p. 44

চতুর্থ অধ্যায়

সুলতানী আমলে বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণ (১২০৪-১৫৭৬)

১২০৪ সালে তুর্কি সেনাপতি মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া আক্রমণ ও পরবর্তীতে গৌড় জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের সূচনা ঘটে। এরপর পরবর্তী ১৫৭৬ সাল থেকে প্রায় সাড়ে তিনশত বছরের বেশী সময় পর্যন্ত বাংলা বিভিন্ন বংশদ্ভূত মুসলিম শাসকদের দ্বারা শাসিত হয় যারা প্রথম পর্যায়ে দিল্লীর সুলতানদের অধীনে ও পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেছেন। এরা নিজেদের বাংলার সুলতান হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। ১২০৪-১৫৭৬ সাল পর্যন্ত সময়কাল বাংলার ইতিহাসে সুলতানী আমল নামে পরিচিত। সুলতানী আমলে বাংলার ইতিহাসকে কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করা হয় –

ক. প্রাথমিক পর্যায় বা অধস্তন গভর্ণারদের শাসনামল (১২০৪-১৩৩৯ খ্রি.)

খ. ইলিয়াস শাহী শাসনামল (১৩৪২-১৪১২ খ্রি.)

গ. রাজা গনেশ বংশীয়দের শাসনামল (১৪১৪-১৪৩৬ খ্রি.)

ঘ. পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসনামল (১৪৩৬-১৪৮৭ খ্রি.)

ঙ. আবিসিনিয় শাসনামল (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রি.)

চ. হোসেনশাহী শাসনামল (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.)

ছ. স্বাধীন সালতানাতের অবসানের যুগ (১৫৩৮-১৫৭৬ খ্রি.)[১]

সুলতানী আমলে বাংলায় স্থাপত্যের বিকাশের ধারাকে আহমেদ হাসান দানী সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন – ১.মামলুক রীতি ২. প্রাথমিক ইলিয়াস শাহী রীতি ৩. একলাখী রীতি ৪. পরবর্তী ইলিয়াস শাহী রীতি ৫. হোসেন শাহী রীতি ৬. খানজাহানী রীতি ৭.স্থানীয় শাসক শ্রেণীর জনপ্রিয় রীতি ।[২] বিভিন্ন শাসকদের শাসনামলে বাংলার স্থাপত্য বিকাশের ধারাকে অনুসরণ করে বর্তমান আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

ক. অধস্তন গভর্ণদের শাসনামল (১২০৪-১৩৩৯ খ্রি.)

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় মুসলিম বিজেতাদের আগমন একটি যুগসন্ধিক্ষণ হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত। মধ্য এশিয়া থেকে মুসলমানদের আগমনের ফলে বাংলার সাথে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর যোগাযোগ বেড়ে গিয়ে বাংলার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা সংযুক্ত হয় যা বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু নয় বরং সামাজিক ও সংস্কৃতিক

১. এ .বি.এম. হোসেন (সম্পা), *বাংলাদেশর সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২, স্থাপত্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬৩-৭৩

২. A.H.Dani, *Muslim Architecture of Bengal*, Dhaka, 1961, p.25-28

অঙ্গনেও বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। ভারতবর্ষ তথা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপত্য চিন্তাধারার সাথে মুসলিম স্থাপত্য চিন্তার সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল প্রতিফলন এ সময়কার স্থাপত্যে পরিলক্ষিত হয়।

বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের বিস্তার মুসলিম শাসন বিস্তারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম শাসন বাংলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং লাখনৌতি, দেবকোট ও মাহীসন্তোষে প্রধান শহর বা শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে, মুসলমানগণ এই সকল শাসনকেন্দ্রে নিজের বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি, ধর্মীয় প্রয়োজনে মসজিদ, সৈন্যদের ছাউনি ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু প্রাথমিকযুগের প্রায় একশত বছরের মধ্যে নির্মিত এই সকল স্থাপনার কোন কিছুই দুর্ভাগ্য বশত বর্তমানকালে অবশিষ্ট নেই।[১] তবে সমসাময়িক ঐতিহাসিক মীহনাজ-উজ-সিরাজ তার 'তবাকত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে লিখেছেন যে, বখতিয়ার খলজীর লাখনৌতিতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এবং এর আশেপাশের বিস্তৃত অঞ্চলে নিজ আধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বিজিত রাজ্যে খুতবা পাঠ ও মুদ্রাজারি করেন। তাঁর নিযুক্ত আমীরগণ এই সমস্ত অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন।[২] মীনহাজ সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন ই'ওয়াজ খলজিকে একজন মহান স্থাপত্য নির্মাতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি জামি মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদ নির্মাণ করেন। লাখনৌততে বসান কোট দূর্গ ও বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানার নির্মাতা হিসাবে গিয়াস-উদ্-দীন ই'ওয়াজ খলজির নাম পাওয়া যায়।[৩] ১২৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মীনহাজ নিজে এই সকল স্থাপত্য কীর্তি দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] বীরভূমে প্রাপ্ত সিয়ান লিপি (১২২১ খ্রি.) হতে গিয়াস-উদ্-দীন ই'ওয়াজ খলজীর সময় খানকাহ নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] যা সম্ভবত এযাবত বাংলায় পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্য লিপি। এছাড়া দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর হতে প্রাপ্ত একটি লিপি (১২৪৯ খ্রি.)[৬] ও নওগাঁর শিতল মঠ (১২৫৪-৫৫ খ্রি.) হতে প্রাপ্ত দুটি লিপি হতে মসজিদ ও চিল্লাখানা নির্মাণের প্রমাণ মেলে। প্রথম শিলালিপির ভাষ্য অনুযায়ী বাংলার গভর্ণর জালাল উদ্দিন মাসুদ জানী সুলতান ইলতুৎমিশ নির্মিত একটি মসজিদ সংস্কার করেছিলেন। দ্বিতীয় লিপি অনুযায়ী মুঘিস উদ্দিন ইউজবেক কর্তৃক ১২৫৪-৫০ খ্রি. একটি চিল্লাখানা নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রুকনুউদ্দিন কায়কাউসের (১২৯১-১৩০০ খ্রি.) সময় উৎকীর্ণ বেশ কিছু শিলালিপি হতে সেই সময়ে নির্মিত ও সংস্কারকৃত বহু

১. Alexander Cunningham, *Archaeological Survey of Bengal Report*, vol. XV, Delhi, Rahul Publishing House, 1994 (Reprint), (first print-1882), p. 49

২. Minhaj-us-Siraj, *Tabaqat-i-Nasiri*, vol-I, H.G Raverty (trans.), (Indian print) New Delhi, Orient Books Reprint Corporation, 1970, pp.559-60

৩. N.N Law, *Promotion of Learning in India During Muhammadn Rule*, Delhi, Idarah-i Adobiyat-i-Delhi, 1973, p 106

৪. Minhaj, *op.cit*, p. 584

৫. A. Karim, *Corpus of Arabic and Persian Inscription of Bangladesh*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, p. 17-24

৬. A. Karim, *op.cit.*, p. 30-32

মসজিদ, মাদ্রাসা, সেতু ও অন্যান্য ইমারতের উল্লেখ রয়েছে। এদের মধ্যে হুগলি জেলার ত্রিবেনীতে অবস্থিত জাফর খান গাজীর মসজিদটি বাংলায় প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন মুসলিম ইমারত (১২৯৮-১৩১৩ খ্রি.)। ১২০৪-১৩৩৯ খ্রি. এর মধ্যে বাংলায় নির্মিত আর মাত্র দুটি স্থাপত্যের উদাহারণ পাওয়া যায় তাদের একটি জাফর খান গাজীর মসজিদের সন্নিকটে অবস্থিত জাফর খান গাজীর সমাধি ও হুগলীর ছোট পান্ডুয়ায় অবস্থিত বরী মসজিদ (সম্ভবত ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ)। যদিও এই সময়ে প্রাপ্ত মুসলিম স্থাপত্যের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল তবে টিকে থাকা এ সকল ইমারতগুলো চৌদ্দ শতকে বাংলার মুসলিম স্থাপত্য চর্চার ধরন সম্পর্কে ধারণা দেয়। স্থাপত্য ক্ষেত্রে এ সময় মুসলমানগণ পশ্চিম এশিয়া হতে আনিত নতুন ধরনের চিন্তাধারাকে সূচিত করে। তবে স্থাপত্য উপাদান ও কৌশলে স্থানীয় প্রচলিত ধারা বহুলাংশে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে পাথরের স্থাপত্য উপাদান পূর্ববর্তী স্থাপত্য হতে নিয়ে ব্যবহার, মুসলমানগণ কর্তৃক আনীত আর্কুয়েট পদ্ধতির পাশাপাশি ট্রাবিয়েট পদ্ধতির ব্যবহার অলংকরনে খোদাই পাথর ও পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার, অলংকরণ মেটিফের ক্ষেত্রেও একইভাবে পূর্ববর্তী স্থাপত্যের হতে ধারণা সংগৃহীত হয়েছে।

জাফর খান গাজীর মসজিদ/মাদ্রাসা

মুসলিম আগমনে প্রাথমিক যুগে বাংলার যে সকল স্থাপত্য মুসলমাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে তাদের মধ্যে জাফর খান গাজীর মসজিদটি টিকে থাকা প্রাচীনতম উদাহরণ। মসজিদটি পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় ত্রিবেণীতে অবস্থিত। এই মসজিদের মিহরাবে স্থাপিত একটি শিলালিপিতে ৬৯৮ হিজরিতে (১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) এখানে একটি মাদ্রাসা নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে।[১] উল্লেখিত মসজিদটি সম্ভবতঃ মাদ্রাসারই অংশ। বাংলায় 'ইট ও পাথরের স্থাপত্য' এর এইটিই সর্বপ্রাচীন উদাহরণ।[২]

আয়তাকার মসজিদটির দৈর্ঘ্য ২০.০৩ মিটার ও প্রস্থ ৭.৫০ মিটার। মসজিদের দেয়াল ১. ৬০ মিটার পুরু। সম্পূর্ণ মসজিদটি দুটি 'বে'ও পাঁচটি আইলে বিভক্ত। এর পূর্ব দিকে পাঁচটি খিলান দরজা ও উত্তর দক্ষিণে দুটি করে প্রবেশ খিলান রয়েছে। পূর্ব দেয়ালের পাঁচটি প্রবেশ-খিলান বরাবর মসজিদের পশ্চিমে অবস্থিত কিবলা দেয়ালে পাঁচটি মিহরাব ছিল বলে ধারণা করা হয়।[৩] তবে এদের মধ্যে বর্তমানে মাঝের তিনটি মিহরাব টিকে আছে। উত্তর ও দক্ষিণের প্রান্তীয় মিহরাব দুটি পরবর্তীতে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[৪] মসজিদের অভ্যন্তরের প্রান্তীয় আইলের দুটি

১. A. Karim *op.cit.* p. 53-56
২. A.H. Dani, *op.cit.*, p. 42
৩. *Ibid*, p. 41-42
৪. Abu Sayeed M. Ahmed, *Choto Sona Mosque at Gour: an example of the early Islamic Architecture of Bengal*, Germany, Karlsruhe, 1997, p. 87

চিত্র: ৪.১

মাঝখানে খিলান উত্থিত হওয়ার বিন্দু পর্যন্ত দেয়াল তুলে দেওয়া। এর মধ্যে দক্ষিণ আইলের দেয়ালে অপূর্ব পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত। হলের উত্তরের আইলের দেয়ালটি বর্তমানে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় আছে। এই দেয়ালেও সামান্য পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায়। তবে মসজিদের কিবলা দেয়ালটি সম্পূর্ণভাবে পাথরের তৈরী, মিহরাব ও এর আশেপাশের সকল অলংকরণই পাথরে খোদাই করে করা হয়েছে।

মসজিদটি দশ গম্বুজ বিশিষ্ট। তবে বর্তমানে এর সামনের আইলের পাঁচটি ও পিছনের আইলের কেন্দ্রীয় মিহরাবের সামনের একটিসহ মোট ছয়টি গম্বুজ টিকে আছে। পূর্বদিকে প্রবেশ-খিলানগুলো খাটো ও ভারী স্তম্ভের উপর নির্মিত।

অলংকরণ

দক্ষিণ আইলের দেয়াল: মসজিদের দক্ষিণ আইলে মাঝের স্তম্ভ সারির সর্ব দক্ষিণে, খিলান উত্থানের বিন্দু পর্যন্ত যে দেয়ালটি রয়েছে তাতে পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায়। দেয়ালের মাঝখানে রয়েছে একটি বদ্ধ খিলান। কিবলা মুখী বলে এটাকে একটি মিহরাব হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। খিলানটি বহুখাঁজ বিশিষ্ট।

চিত্র: ৪.২

খিলানে অভ্যন্তরের বন্ধ প্যানেল জুড়ে পোড়ামাটির ফলকে চিত্রিত হয়েছে একটি ফলবতী ডালিম গাছ। এর ফল ও পাতায় সম্পূর্ণ প্যানেলেটি পূর্ণ। খিলান নির্মাণে দুটি অলংকৃত ইটের স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছে। খাঁজ-খিলানটির চারদিকে একটি বর্ডার রয়েছে যা লতানো নকশায় সজ্জিত। খিলান-শীর্ষটি ক্ষুদ্র কলস এর উপর একটি কলি নকশায় শেষ হয়েছে। খিলান শীর্ষের দুই পাশে দুটি বৃহৎ চক্রনকশা রয়েছে, খাঁজ-খিলানের বর্ডারের উপরে আঙ্গুরের ন্যায় ফলযুক্ত ঝোপা নির্ধারিত দূরত্বে উর্দ্ধমুখে প্রলম্বিত। সমগ্র খিলানটি একটি ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ খিলান ফ্রেমটি পদ্ম ও ধনুকের ধারাবাহিক নকশায় সজ্জিত। ফ্রেমের অভ্যন্তরে উপরের অংশে একসারি প্রস্ফুটিত পদ্ম নকশা রয়েছে। সম্পূর্ণ খিলান ফ্রেমটির দুই পাশে রয়েছে দুই সারিতে আটটি করে মোট ষোলটি আয়তকার প্যানেল। প্যানেলগুলোতে ক্ষুদ্র খাঁজ খিলানের মধ্যে ফলবতী গাছ উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এক সারি অলংকৃত ক্ষুদ্র বর্গাকার প্যানেল আয়তকার প্যানেলগুলোকে উপর ও নীচ এই দুইভাগে ভাগ করেছে।

উত্তর আইলের দেয়াল: মসজিদের উত্তর আইলের প্রান্তীয় দেয়ালটি বর্তমানে অনেকটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত। উত্তর দেয়ালের দুটি উল্লম্ব পার্শ্ব প্যানেল বর্তমানে টিকে আছে। আয়তাকার এই প্যানেলে রয়েছে একটি খাঁজ-খিলান নকশা যার উর্ধ্বাংশ হতে একটি নোঙর সদৃশ ঝুলন্ত বস্তুর নীচে উৎকীর্ণ হয়েছে একটি চক্রাকার নকশা। চক্রের নীচে অপর একটি ক্ষুদ্র খাঁজ খিলানে মধ্যে অর্ধগোলাকার নকশা উৎকীর্ণ রয়েছে। প্যানেলের উপরের দিকে খিলানের উপরে রয়েছে দুটি পদ্ম মোটিফ। খিলানটি একটি চারপত্র বিশিষ্ট ফুলের জালি নকশার ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ।

সাধারণ আলোচনা

ত্রিবেনীতে অবস্থিত জাফর খান গাজীর মসজিদটি বাংলায় ইট ও পাথরের তৈরী ইমারতের সর্বপ্রাচীন উদাহরণ। সাধারণভাবে এটি একটি দশ গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ। কিন্তু মসজিদের অভ্যান্তরীণ পরিকল্পনা অন্যান্য মসজিদ অপেক্ষায় ভিন্নতর, এর মধ্যবর্তী স্তম্ভসারির সর্ব দক্ষিণ ও উত্তরে দুটি দেয়ালের উপস্থিতি মসজিদ অভ্যন্তরের উম্মুক্ত জায়গাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। অংশ দুটির উপস্থিতি মসজিদ নির্মাণের সময় ছিল কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কেননা সমগ্র মসজিদটি পাথরের আস্তর দিয়ে ঢাকা হলেও এই দুই অংশ ইটের তৈরী ও পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত। মসজিদের আদি অলংকরণ যেগুলো টিকে আছে (পশ্চিম দেয়ালের অলংকরণে পাথর খোদাই নকশা দেখা যায়) তাতে কোন পোড়ামাটির অলংকরণ ব্যবহৃত হয়নি। অপর দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আইলের দেয়ালে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির অলংকরণগুলো ১৫২৩-২৪ সালে নির্মিত রাজশাহীর বাঘা মসজিদের ও ১৫৫৮-৫৯ সালে নির্মিত নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদের সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় ধারণা করা যায় যে, দেয়ালের এই অংশ ও অলংকরণ উভয়ই পরবর্তীকালে হোসেনশাহী শাসনামলের (১৪৯৩-১৫৩২ খ্রি.) কোন এক সময়

সংযোজিত। কোন কোন গবেষকের মতে দেয়াল দুটি দিয়ে মহিলা ও অভিজাত ব্যক্তিদের জন্য মসজিদের এই অংশগুলো সংরক্ষিত করা হয়েছিল।[১] মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে আলাউদ্দিন হোসেন শাহর সময়কালের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) দুটি শিলালিপি প্রথিত রয়েছে। তবে এদের কোনটিই এই মসজিদের নয় কেননা এদের একটিতে একটি সেতু নির্মাণের ও অপরটিতে একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু এখানে আগে থেকেই একটি মসজিদ ছিল তাই এই দুটি শিলালিপি অন্য স্থান হতে প্রাপ্ত ও পরবর্তী কোন সংস্কার কার্যের সময় এই মসজিদে প্রথিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[২]

বরী মসজিদ

বাংলার প্রাচীনতম টিকে থাকা মসজিদ স্থাপত্যের মধ্যে বরী মসজিদ একটি। মসজিদটি হুগলী জেলার পান্ডুয়া শহরে অবস্থিত। মালদহ জেলায় পান্ডুয়া নামে অপর একটি শহর থাকায় শহরটি ছোট পান্ডুয়া নামেও পরিচিত। সাধারণভাবে মসজিদটি ১৩০০ খ্রী. নির্মিত হয়েছে বলে ধরা হয়।

চিত্র: ৪.৩

বরী মসজিদকে প্রাচীনতম টিকে থাকা ইটের স্থাপত্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। আয়তকার গঠনের এই মসজিদটির বাইরের দৈর্ঘ্য ৬৯.৪৫ মি. ও প্রস্থ ১২.৮ মি.। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত তিনটি আড়াআড়ি 'বে' ও একুশটি আইলে বিভক্ত। মসজিদের বারতম আইলটি এর দুই পাশের আইলসমূহ থেকে কিছুটা চওড়া। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে একুশটি নীচু খিলানপথ রয়েছে। এর দক্ষিণ দেয়ালে একটি কুলঙ্গি ও উত্তর দেয়ালে একটি মাত্র খিলানপথ আছে। পশ্চিমে দেয়ালে মসজিদের অভ্যন্তরে রয়েছে উনিশটি মিহরাব। দক্ষিণ দিক

১. Abu Sayeed, *op.cit.* p. 87

২. A. Karim, *op.cit.*, p. 28

থেকে বারতম মিহরাবটি সবচেয়ে অলংকৃত। এই মিহরাবের উত্তর পার্শ্বে গম্বুজযুক্ত পাথরের উচ্চ মিম্বার স্থাপিত হয়েছে। মসজিদের উত্তর প্রান্তে দুই 'বে' ও ছয় আইল জুড়ে এলাকা কিছুটা উঁচুভাবে নির্মিত। এই অংশের পশ্চিম দেয়ালে দুটি ক্ষুদ্র মিহবার ও একটি খিলানপথ রয়েছে। জাফর খান গাজির মসজিদের মত এ মসজিদে কোন পার্শ্ব বুরুজ নেই, যা এই মসজিদের প্রাচীনত্বের প্রমাণ বহন করে। বর্তমানে মসজিদের সম্পূর্ণ আচ্ছাদন বিলুপ্ত হলেও এক সময় এটি তেষট্টিটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। গম্বুজ নির্মাণে পেনডেনটিভ ব্যবহৃত হয়েছিল। মসজিদের অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভগুলোর অধিকাংশ মুসলিম-পূর্ব যুগের স্থাপত্য থেকে নেওয়া। স্তম্ভগাত্রের শিকল-ঘন্টা, পুঁতিযুক্ত মালার নকশা ও পানির ঘূর্ণিচক্রের ন্যায় নকশাগুলো এর প্রমাণ বহন করে।

অলংকরণ

পান্ডুয়ার বরী মসজিদটি সম্পূর্ণ ছোট ছোট লাল ইটের তৈরী। এই মসজিদটিই সম্ভবত: মুসলিম স্থাপত্যে সর্বপ্রাচীন পোড়ামাটির ফলক অলংকরণের সাক্ষ্য বহন করে। বর্তমানে মসজিদটির ভগ্নদশা হলেও আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম ১৮৭৯-৮০ সালে যখন পান্ডুয়ার বরী মসজিদটি দেখেছিলেন তখন এর সম্মুখ দেয়াল প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নকশা ইটের দ্বারা সজ্জিত ছিল। তবে পশ্চাৎ দেয়ালে কোন অলংকরণ ছিল না।[১] ১৯০৩-০৪ সালে তোলা বরী মসজিদের একটি চিত্র হতে এর বহির্দেয়ালের যে নকশার বর্ণনা হাফিজুল্লাহ খান করেছেন, তাতে মসজিদের পূর্ব দেয়ালে দুই খিলানের মধ্যবর্তী অংশে, খিলানের উত্থানের স্থান হতে আয়তাকার প্যানেল নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি প্যানেল একটি জালি নকশার বর্ডার দ্বারা আবদ্ধ। বর্ডারের ভেতর বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলানের মধ্যে ঝুলন্ত নকশা রয়েছে। খিলান শীর্ষ ফুলদানীর ন্যায় অলংকরণে সজ্জিত। খিলান প্যানড্রিলের ক্ষুদ্র রোজেট নকশা রয়েছে।[২] বর্তমানে সেই সকল অলংকরণের খুব সামান্যই টিকে আছে। বর্তমানে বহির্দেয়ালের একটি মাত্র ধ্বংস প্রায় অলংকরণ থেকে যে চিত্র পাওয়া যায় তা আনেকটা এরকম, দুই খিলানের মধ্যবর্তী অংশে খিলান উত্থানের স্থানে জাল নকশার বর্ডার করা প্যানেলে দুটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ, এর উপরের খিলান অংশটি বিলুপ্ত হয়েছে। খিলানের ভেতরের অংশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারপত্র বিশিষ্ট ফুলের জালি নকশায়পূর্ণ। দুটি খিলানের মাঝে এই ধরনের প্যানেল নকশার উপস্থিতির চিহ্ন এখনও দৃশ্যমান। নির্ধারিত দূরত্বে খিলানসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে প্যানেল নকশার উপস্থিতি সম্মুখের টানা দেয়ালের একঘেয়েমীকে যেমন দূর করে তেমনি দৃষ্টিনন্দনও বটে।

---

১. Alexander Cunningham, *op.cit.*, p. 125

২. Muhammad Hafiznllah Khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1988, p. 89; *Bengal photographs* vol. I. 1903-04, Negative no-39 (Preserved with the Archaeological Survey of India, New Delhi)

স্থাপত্যের বহির্দেয়ালের পোড়ামাটির প্যানেলবদ্ধ খিলান নকশার সর্বপ্রাচীন উদাহরণ সম্ভবতঃ পান্ডুয়ার বরী মসজিদেই পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মালদহ জেলার পান্ডুয়ার (হযরত পান্ডুয়ায়) আদিনা মসজিদে এই ধরনের নকশা বার বার ব্যবহারের মধ্যদিয়ে বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের বহির্দেওয়াল অলংকরণের আদর্শ নির্ধারিত হয়। মসজিদের অভ্যন্তরের কিবলা বা পশ্চিম দেয়ালটি অলংকৃত ইট ও পোড়ামাটির নকশায় (terracotta) অলংকৃত। মসজিদ অলংকরণে মূলতঃ পোড়ামাটির শিল্পই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরের পাথরের স্তম্ভগুলো অপূর্ব খোদাই নকশায় সজ্জিত তবে এদের বেশী ভাগই পূর্ববর্তী ইমারত থেকে সংগৃহীত। পোড়ামাটির অলংকরণগুলো দেখা যায় মসজিদের মিহরাবগুলোকে কেন্দ্র করে। মসজিদে মোট উনিশটি মিহরাব রয়েছে। এদের মধ্যে দক্ষিণ থেকে বারতম মিহরাবটি সবচাইতে অলংকৃত। এই মিহরাবটি একটি অলংকৃত ফ্রেমের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে, বেশ চওড়া একটি বর্ডার দিয়ে মিহরাবটির তিনদিক আবদ্ধ। বর্ডারটি অলংকৃত ইটের সংযুক্ত নকশা দ্বারা পূর্ণ। মূল মিহরাবের খিলানটি পাঁচপত্রযুক্ত ও সূচাঁলো। নীচু এই খিলানের স্তম্ভ দুটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরী।[১] স্তম্ভ দুটি সম্পূর্ণভাবে মুসলিম-পূর্ব যুগের পাথরের স্তম্ভের অনুকরণে নির্মিত। পাথরের স্তম্ভের অনুকরণে স্তম্ভের গাত্রে ঝুলন্ত মালা নকশা ও টারসেল নকশা দেখা যায়। একই ধরনের নকশাযুক্ত মুসলিম-পূর্ব যুগের পাথরের স্তম্ভ এই মসজিদে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। খিলানে ইটের স্তম্ভ ও পোড়ামাটির নকশাগুলো নিঃসন্দেহে ঐ সকল নকশার কিছুটা পরিবর্তিত অনুকরণ।[২] মূল খিলানের উপরে কিছুটা উদ্গাতভাবে আর একটি বহুখাঁজ খিলান নকশা রয়েছে। খিলান খাঁজের দুইপাশে প্যাঁচানো ও সামনে সুঁচালো কলির ন্যায় নকশা রয়েছে। খিলান নকশাটি দুটি ফুলদানী সদৃশ ক্ষুদ্র স্তম্ভের উপর স্থাপিত। খিলান অভ্যন্তরে চারপত্রযুক্ত সংযুক্ত ফুল নকশার জালি সৃষ্টি করা হয়েছে। খিলান ঘিরে রয়েছে একসারি কলকে নকশা। খিলান স্প্যানড্রিলে দুই পাশে চক্রবদ্ধ পদ্ম ফুল নকশা দেখা যায়। খিলানের শীর্ষে ও খিলান ফ্রেমের মধ্যবর্তী অংশ তিনটি ধাপে ভাগ করে প্রতিটি ধাপে পাঁচটি করে স্তম্ভ শীর্ষের নকশা স্থাপন করা হয়েছে। স্তম্ভশীর্ষগুলোতেও গ্রীক নকশার প্রভাব দেখা যায়।[৩] মিহরাব খিলানের অবতল অংশকে খিলান উত্থানের বিন্দুর নীচ পর্যন্ত চারটি আড়াআড়ি সারিতে বিভক্ত করে প্রতিটি সারিতে আটটি করে ক্ষুদ্র খিলান নকশা সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি খিলানের অভ্যন্তরে বিমুর্ত ফুলের নকশা রয়েছে। এই চারটি সারি আবার মাঝ বরাবর একটি উল্লম্ব শিকল নকশা দিয়ে দুইভাগে বিভক্ত। মিহরাব অলংকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে বর্ডার

---

১. ভুল বশতঃ হাফিজুল্লাহ খান এদের পাথরের বলে বর্ণনা করেছেন। Muhammad Hafizullah Khan, *op.cit.*, p. 90

২. খাঁজের সূচালো অংশে এই ধরনের অলংকরণ একটি প্রচলিত গ্রীক নকশা। Robert E. Lerner and others, *Western Civilizations*, vol.-1, New York, W.W. Norton & Company, 1993, p. 164

৩. হাফিজুল্লাহ খান এই নকশাকে 'stylized double head axe pattern' বলে বিহিত করেছেন যা যথাযথ বলে মনে হয় না বরং এগুলো স্তম্ভশীর্ষের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। Muhammad Hafizullah Khan, *op.cit.*, p. 90

অলংকরণে সারিবদ্ধ হিরক আকৃতির নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদের অন্যান্য মিহরাবগুলোতেও ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ ও পাঁচপত্র বিশিষ্ট খিলান নকশায় তৈরী।এই সমস্ত খিলানেও ইটের স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই সকল পোড়ামাটির অলংকরণ বর্তমানে খুব বেশী অবশিষ্ট নাই। দু'একটি মিহরাবের খিলান অবতলে শিকলে ঝোলানো প্রদীপ নকশা রয়েছে এটাই সম্ভবত বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে শিকল ও প্রদীপ নকশার প্রথম উপস্থাপন। এছাড়া কিছু মিহরাব খিলানের দুই পাশে পদ্ম নকশাও উপস্থাপিত হয়েছে। সম্ভবতঃ খিলান স্প্যানড্রিলে পদ্ম ও খিলান অবতলে শিকলে ঝোলানো প্রদীপ নকশা অন্যান্য সকল মিহরাবের সাধারণ অলংকরণ বৈশিষ্ট্য ছিল।

চিত্র: ৪.৪

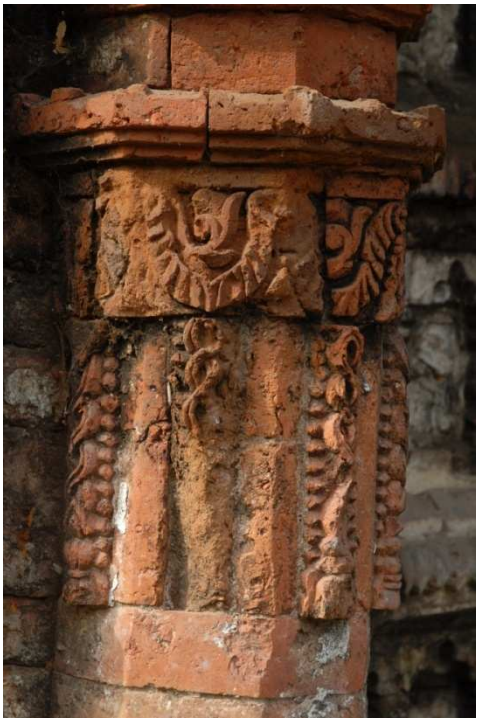

চিত্র: ৪.৫

চিত্র: ৪.৬

সাধারণ আলোচনা

পান্ডুয়ার বরী মসজিদটি বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থাপনা। বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ অঞ্চলে এত বৃহৎ পরিসরে এবং সম্পূর্ণ ইটের স্থাপত্যের উদাহরণ আর নাই। মসজিদের আকার, উত্তর প্রান্তে বাদশাহ-কা-তখ্ত এর উপস্থিতি, সম্মুখে সুউচ্চ মিনার সবকিছু মিলিয়ে এটিকে একটি রাজকীয় স্থাপত্য বলেই চিহ্নিত করা যায়। মসজিদটিতে কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণ কাল নিয়ে বেশ কিছু মতামত রয়েছে। সাধারণভাবে এটি ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।[১] বেশীরভাগ ঐতিহাসিক মসজিদটির স্থাপত্যিক গঠন-প্রাণালীর উপর ভিত্তি করে এরূপ তারিখ নির্ণয় করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ এর পার্শ্ববুরুজ বিহীন উপস্থাপন, এর কথা বলা যায়। অধ্যাপক দানীর মতে,

"The Bari Masjid at Chhota Pandua comes closest to the mosque of Zafar khan Ghazi in its general oblong plan, the design of the front facade with its arches resting directly on pillars, and the interior look with long vistas of successive arches springing direclty from pillars."[২]

আলেকজান্ডার কানিংহাম মসজিদটিকে জৌনপুর দূর্গ মসজিদের সমসাময়িক বলে মনে করেন যা ৭৭৮ হিজরী বা ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নির্মিত হয়েছিল।[৩] আবু সাঈদ তার *The Choto Sona Mosque at Gaur* গ্রন্থে আবিদ আলী খানের উদ্ধৃতি দিয়ে মসজিদটি ৭৪৩/১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন।[৪] তবে আবিদ আলী খান তাঁর *Memoirs of Gaur and Pandua* গ্রন্থে যে মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন তা হযরত পান্ডুয়ার শাহজালাল তাব্রিজীর মসজিদ।[৫] তবে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণ বিশ্লেষণ করলে মসজিদটি চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধের নির্মাণ বলে মনে হয়।[৬] বরী মসজিদের পোড়ামাটির অলংকরণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অলংকরণে জ্যামিতিক ও ফুলকারী নকশাই প্রাধান্য পেয়েছে। মিহরাব অভ্যন্তরে ঝুলন্ত প্রদীপ নকশার উদাহরণ সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম এই মসজিদেই দেখা যায়। মসজিদের বহির্গাত্রে দুই খিলানের মধ্যবর্তী অংশে আয়তাকার প্যানেলে ক্ষুদ্র খিলান নকশা ও এর মধ্যে ঝুলন্ত নকশার সৃষ্টির মাধ্যমে যে বিশেষ আবহ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা পরবর্তীকালে সুলতানী স্থাপত্য অলংকরণের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাড়ায়। বরী মসজিদে

---

১. মসজিদের সম্মুখে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের (ASI) লাগানো বোর্ডে এর নির্মাণকাল ১৩০০ খ্রি. উল্লেখ আছে

২. A.H. Dani, *op.cit.*, p. 49

৩. Alexander Cunningham, *op.cit.* , p. 125

৪. Abu Sayeed, *op.cit.*, p. 104

৫. A.A. Khan, *Memoirs of Gaur and Pandua*, Calculta,1986 (reprint), p.80

৬.এখানে উল্লেখ্য যে, মসজিদটি হুগলীর পান্ডুয়া শহরে অবস্থিত যা ছোট পান্ডুয়া নামে পরিচিত। মধ্য যুগে মালদাহ জেলার হযরত পান্ডুয়া ও হুগলী জেলার ছোট পান্ডুয়া উভয় শহরই শামস-উদ্-দীন ফীরুজ শাহর নামানুসারে ফিরোজাবাদ নামে পরিচিত ছিল; আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭, পৃ. ১৫৭

অলংকরণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো মুসলিম পূর্ববর্তী স্থাপত্য নকশাকে পরিবর্তিত রূপে গ্রহণের প্রচেষ্টা। মসজিদের অভ্যন্তরে মুসলিম-পূর্ব যুগের ব্যবহৃত পাথরের স্তম্ভগুলোর সাথে সংগতি রেখে এ মসজিদের মিহরাবের খিলানে যে ইটের স্তম্ভগুলো নির্মিত হয়েছে তাতে পাথরের স্তম্ভগুলোর রূপ ও নকশার প্রতিফলন দেখা যায়। মুসলিম-পূর্ব যুগের স্তম্ভে খোদিত শিকল-ঘন্টার নকশা ও ঝুলন্ত মালা নকশাকে ইটের স্তম্ভের কিছুটা পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে শিকল-ঘন্টাকে টারসেল ও মালায় মতির মত গোলাকার নকশাকে পাতার মত লম্বাটে করে ঝুলন্ত মালায় রূপ দেওয়া হয়েছে যা পরবর্তী স্থাপত্য নশায় অনুসৃত হতে দেখা যায়।

মুসলিম শাসনামলে আয়তাকার প্যানেলের ভেতর বহুখাঁজ খিলান নকশায় ঝুলন্ত মোটিফের প্রথম ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া যায় পান্ডুয়ার বরী মসজিদে (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ) এখানে মোটিফটি খিলানের অভ্যন্তরে ঝুলন্ত প্রদীপ বা চক্রাকার পদ্ম রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।[১] তবে খিলানের মধ্যে ঝুলন্ত প্রদীপের অলংকরণে উদাহরণ পারস্যের কিছু মসজিদে পাওয়া যায়। এর মধ্যে ভেরামিনের ঈমামজাদে মসজিদ (১২৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) ও আবারাকূ এর মসজিদে জামিতে (১৫শ শতক) মিহরাবে ঝুলন্ত প্রদীপের অলংকরণ নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া বাগদাদ মিউজিয়ামে রক্ষিত মসূলের ত্রয়োদশ শতকের একটি মিহরাব কুলঙ্গিতেও একই ধরনের ঝুলন্ত নকশার নিদর্শন পাওয়া যায়।[২] বাংলায় মসজিদ অলংকরণে ব্যবহৃত এই ঝুলন্ত প্রদীপদানের নকশাটি শিকল-ঘন্টা নকশা হতে উদ্ভুত এমন ধারণা সম্ভবত সঠিক নয়। শিকলে ঝোলানো ঘন্টা নকশা মুসলিম-পূর্ব যুগের প্রস্তর স্তম্ভ অলংকরণে বহুল ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু তা শুধুমাত্র স্তম্ভ অলংকরণের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মিহরাবের ঝুলন্ত প্রদীপের অলংকরণটি পারস্য হতে আমদানীকৃত বলে অনুমিত হয়। সোনারগাঁয়ে অবস্থিত গিয়াস-উদ্-দীন আযম শাহের সমাধিতে খিলানের ভিতর ঝুলন্ত প্রদীপদান এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আদীনা মসজিদে এই অলংকরণটি পাথর ও পোড়ামাটি উভয় মাধ্যমেই উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য অলংকরণটি বাংলার মুসলিম স্থাপত্য সুলতানদের আদর্শ নকশায় পরিণত হয়। সুলতানী আমলে নির্মিত বাংলার প্রায় সকল মসজিদসহ, সমাধি ও তোরণ স্থাপত্যে এই বিশেষ অলংকরণটি সংযোজিত হয়েছে। আদিনা মসজিদে ঝুলন্ত মোটিফটি প্রদীপদান বা চক্রাকার পদ্ম এর রূপ পরিগ্রহ করলেও পরবর্তিকালে মোটিফটি বিভিন্ন উপসর্গ সংযোজন ও বিয়োজনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে হোসেনশাহী শাসনামলে তা গহনার রূপ পরিগ্রহ করে।[৩] বাঘা মসজিদে এসে শিকলের স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের সারি ব্যবহৃত হয়েছে। শিকল ও প্রদীপদানের এই বিবর্তিতরূপটি পরবর্তীকালে নির্মিত গৌড়ের জাহানিয়া মসজিদ

১. অলংকরণটির উৎস হিসাবে অধিকাংশ শিল্প-ঐতিহাসিক মুসলিম-পূর্ব যুগের শিকল- ঘন্টা নকশাকে নির্দেশ করেন, A.H.Dani *op.cit.*, p. 68

২. সুরা 'আল-নূর' এর আয়াত: ৩৫ দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে প্রায়শই মসজিদের মিহরাবে ঝুলন্ত প্রদীপ মটিফটি ব্যবহৃত হয়েছে। Richard Ettighausen & Oleg Grabar, *The Art and Architecture of Islam 650-1250*, Harmondsworth, Penguin Books, 1987, p. 301

৩. Perween Hasan, *Sultans and Mosques: The Early Muslim Architecture of Bangladesh*, New York, I.B. Tauris, 2008, p.162

(১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) ও কদম রসুল (১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ)), নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ও দিনাজপুরের শূরা মসজিদে অনুসৃত হয়েছে। বরী মসজিদে প্রথম এই অলংকরণটি উপস্থাপিত হয়েছিল মিহরাবের অভ্যন্তর সজ্জায় ও দেয়াল গাত্র সজ্জায়। মসজিদ গাত্রে নকশাটির এই বিশেষ উপস্থাপন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এর সময় কাল পর্যন্ত চর্চিত হয়েছে।

মসজিদের বাইরের দেয়ালে খোদাই ইটের স্বল্পতম অলংকরণ সেলজুক স্থাপত্যের সাথে এর যোগসূত্রের ইঙ্গিত বহন করে মসজিদ অভ্যন্তরের পোড়ামাটির বিমূর্ত নকশাবলী উত্তর ইরানীয় যোগসূত্র নির্দেশক বলে মনে করা হয়।[১] এভাবে মুসলিম চরিত্রের বিমূর্ত নকশার সাথে দেশীয় নকশার মেল-বন্ধন সৃষ্টি করে বরী মসজিদ বাংলার মুসলিম স্থাপত্য অলংকরণের দিক নির্দেশনা দেয়। অলংকরণে খুব বেশী বৈচিত্র না থাকলেও প্রাচীনতম উদাহরণ হিসাবে বরী মসজিদ বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের পথিকৃত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

খ. ইলিয়াস শাহী শাসনামলঃ (১৩৪২-১৪১২ খ্রি.)

১৩৪২ খ্রীঃ বাংলার ইতিহাসে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। গিয়াস-উদ্-দীন তুঘলক কর্তৃক সৃষ্ট বাংলার তিনটি শাসন বিভাগ লাখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও নিজ শাসনের আওতায় এনে ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলায় স্বাধীন সালতানাতের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ১৪১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় স্থায়ী হয়। তবে ইলিয়াস শাহ শাসনকাল নিরবিচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ ছিল না। তাঁকে দিল্লীর সুলতানের আক্রমন প্রতিহত করতে হয়। তাঁর উদারনৈতিক শাসনে আশ্বস্ত হয়ে হিন্দুগণও দিল্লীর আক্রমণ মোকাবেলায় তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন বলে জানা যায়।[২] শুধুমাত্র বাংলা জয় করেই ইলিয়াস শাহ ক্ষ্যান্ত হননি। বাংলার বাইরে তিনি রাজ্য বিস্তার করে ছিলেন। তাঁর বংশধরগণ ১৪১২ খ্রি. পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। দিল্লীর সাথে সম্পর্ক না থাকলেও এই সময় বাংলার সাথে পারস্যের যোগাযোগ ছিল। ইলিয়াস শাহর পৌত্র গিয়াস-উদ্-দীন অযম শাহ পারস্যের কবি হাফিজের নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন। হাফিজ সেই পত্রের প্রতি উত্তর পাঠিয়েছিলেন বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায়।[৩]

বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিপত্তি ও বাংলার প্রতি এ বংশীয় সুলতানদের দৃষ্টিভঙ্গি এই সময় নির্মিত স্থাপত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। একদিকে ইসলামের আদর্শ ও পারসিক চিন্তাধারা অপর দিকে স্বাধীন সালতানাত ও আঞ্চলিক প্রভাব সব মিলে বাংলার স্থাপত্য এই সময় এক নতুন ধারার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তবে বর্তমানে ইলিয়াস শাহী শাসনামলের খুব স্বল্প সংখ্যক স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সময়ের মোট চারটি

১. এ.বি. এম হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬-৯৭

২. আব্দুল কারিম, *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫*

৩. গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পা.), ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০৭,পৃ. ৮৮, *আইন-ই- আকবরী* ,২য় খন্ড ,পৃ. ১৬১)

শিলালিপি এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে। এদের একটি শামস-উদ্-দীন ইলিয়াস শাহর শাসনামলের ও অপর তিনটি তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহর সময়ের। চারটি লিপিতেই মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] এদের মধ্যে সিকান্দার শাহ নির্মিত হযরত পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদটি এর আকার ও পরিকল্পনায় সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা।[২]

আদিনা মসজিদ

হযরত পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদটি শুধু বাংলায় নয় মধ্যযুগীয় সমগ্র ভারতের সর্ববৃহৎ বিদ্যমান মসজিদ।[৩] মসজিদে প্রাপ্ত লিপি অনুযায়ী মসজিদটি ইলিয়াস শাহ্‌র পুত্র সুলতান সিকান্দার শাহ্‌ কর্তৃক ৭৭০ হিজরি/ ১৩৬৯ খ্রী. নির্মিত।[৪]

চিত্র: ৪.৭

সম্পূর্ণ আরব আদর্শ ভূমি-নকশায় নির্মিত এই মসজিদটি শুধু মাত্র একটি স্থাপনাই নয়, এটি দিল্লীর সুলতানদের প্রতি বাংলার সালতানাতের একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং 'আরব ও পারস্যের সবচাইতে উপযুক্ত সুলতান' ও 'বিশ্বাসীদের খলিফা' উপাধিধারী সুলতানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির এক বহিঃপ্রকাশ।[৫] মসজিদটি একটি বিশাল আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত যার বহির্দেয়ালের দৈর্ঘ্য ১৫৮.৭০ মিটার ও প্রস্থ ৯৫.৬ মিটার। নামাজঘরটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পাঁচটি আইল ও বারান্দাগুলো তিনটি আইলে বিভক্ত। নামাজঘরটি মাঝখানে একটি ২১ মি. × ১০

১. এ.বি. এম. হোসেন (সম্পা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩-১৫৪
২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭
৩. *প্রাগুক্ত.*
৪. A. Karim, *op.cit.*, p. 90
৫. এ.বি. এম. হোসেন (সম্পা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

মি. প্রশস্ত নেভ দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। প্রশস্ত নেভটির উত্তরে তিন'বে পরে আঠারটি স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছে একটি তখ্ত বা মঞ্চ। ঐতিহাসিকগণ একে 'বাদশাহ্-কা-তখ্ত' বলে বর্ণনা করেছেন।[১] নামাজঘরের নেভের দুইপাশে আঠারটি করে আড়াআড়ি আইল রয়েছে প্রতিটি আইলের শেষ প্রান্তে পশ্চিম দেয়ালে নির্মিত হয়েছে একটি করে মিহরাব। মসজিদের নেভের পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে দুটি মিহরাব ও একটি গম্বুজযুক্ত পাথরের মিম্বার। বাদশাহ্-কা-তখ্তেও তিনটি মিহরাব রয়েছে। মিহরাবগুলো পাথরের তৈরী জমকালো নকশায় সজ্জিত। মসজিদের পেছনে রয়েছে একটি বর্গাকার কক্ষ। কক্ষটি মসজিদের তখ্ত এর উচ্চতা পর্যন্ত উঁচু ভিত্তির উপর নির্মিত, যা দুটি দরজা দ্বারা তখ্তের সাথে সংযুক্ত। পশ্চিম দেয়ালে নেভের উত্তর পার্শ্বে আরও একটি দরজার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নামাজঘরের সামনে রয়েছে বিশাল আঙ্গন যার পরিমাপ ১২৭.৭০ মি./৫৭.২০মি. অঙ্গনের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব পাশে তিন আইল বিশিষ্ট একটি বারান্দা (রিওয়াক) রয়েছে। বারান্দা ও নামাজঘরের টানা খিলানশ্রেণী দ্বারা অঙ্গনটি চতুর্দিকে আবদ্ধ ছিল। নামাজ ঘরের নেভটি পাঁচটি আয়তাকার স্তম্ভের উপর নালাকৃতির খিলানছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। নেভের দুই পাশে আইলসমূহ প্রতি পার্শ্ব আচ্ছাদনে ব্যবহৃত হয়েছিল নব্বইটি করে মোট একশ আশিটি গম্বুজ। এর মধ্যে নেভের উত্তর পাশের পয়তাল্লিশটি গম্বুজ এখনও বর্তমান। বাকীগুলো ধ্বসে পড়েছে।

মসজিদে সাধারণের প্রবেশ জন্য এর দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে তিনটি অনানুষ্ঠানিক প্রবেশ-খিলান রয়েছে। মসজিদটি নির্মাণে ইট ও পাথর উভয়ের ব্যবহারই লক্ষ্য করা যায়। দেয়াল ও খিলান নির্মাণে ইট ব্যবহৃত হলেও অভ্যন্তরের গোলাকার ও আয়তাকার স্তম্ভগুলো পাথরের তৈরী প্রতিটি মিহরাব পাথর দ্বারা নির্মিত। নেভ অংশে পশ্চিম দেয়ালে প্রায় ছাদ পর্যন্ত পাথরের কেসিং (casing) রয়েছে। এছাড়া মসজিদের দেয়ালগুলো পাথরের ভিত্তির উপর নির্মিত। মসজিদের বহির্দেয়াল নেভ অংশে কিছুটা বর্ধিত করে নির্মাণ করা হয়েছে। নামাজঘরের বাইরের দেয়ালে উল্লম্বভাবে উন্নত ও অবনত (offset-recess) স্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল দেয়ালের একঘেয়েমী দূর করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

সম্পূর্ণ মসজিদটি অত্যন্ত জাঁকালোভাবে অলংকৃত। অলংকরণে পাথর খোদাই ও পোড়ামাটি উভয় নকশাই পরিলক্ষিত হয়। বহির্দেয়ালে সামান্য রঞ্জিত ইটের ব্যবহারও চোখে পড়ে। মসজিদের মিহরাবগুলো পাথরের তৈরী ও খোদাই অলংকরন সজ্জিত।

বহিরদেয়ালের নকশা : মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের বহিরাংশে সবচেয়ে বেশী অলংকরণ রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে দীর্ঘ দেয়ালের একঘেয়েমি কাটাতে মসজিদ দেয়ালের বহিরাংশে পর্যায়ক্রমে উন্নত ও অবনত দেয়াল সৃষ্টি করা হয়েছে। বাইরের দেয়ালে প্রায় অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে পাথরের কেসিং (casing)। এর কিছুটা উপরে

১. A.H. Dani, *op.cit.*, p. 66-67

পোড়ামাটির অলংকরণের একটি পাড় সমগ্র দেয়ালটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। পাড়ে ছয় সারি পোড়ামাটির নকশার বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। সবচেয়ে উপরের ঝুলন্ত বরফি নকশা, এর নীচে লতানো চক্র নকশা, এরপর যথাক্রমে ঢেউ, এক ধরণের বিমূর্ত নকশা, গুটি ও পত্রযুক্ত মালা নকশা এবং লতানো নকশা দিয়ে পাড় নকশাটি বিন্যস্ত। দেয়ালের কার্নিশের নীচে আর একটি পাড় নকশা রয়েছে। পাড়টিতে সংযুক্ত নকশা (interlock design) ও এর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিলানের মধ্যে পদ্ম ফুলের পার্শ্বচিত্র পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

চিত্র: ৪.৮

কেন্দ্রীয় মিহরাব অংশটি পার্শ্ববর্তী দেয়াল থেকে উঁচু ও বাইরের দিকে কিছুটা বর্ধিতাকারে নির্মিত। এই অংশে উল্লম্ব দেয়ালের বর্ধিত অংশের মাঝামাঝি আর ও একটি পাড় রয়েছে। চার পাপড়ির ফুলের জালি নকশার একটি পাড় এখনও চোখে পরে। আড়াআড়ি পাড় নকশা এভাবে মসজিদের পশ্চিম দেয়ালকে দুই ভাগে ও কেন্দ্রীয় মিহরাব অংশকে চার ভাগে বিভক্ত করেছে। দেয়ালের উপরিভাগে প্রতিটি উন্নত দেয়ালাংশে একটি নকশা যুক্ত ফ্রেমের মধ্যে ক্ষুদ্র খিলান নকশা রয়েছে এবং খিলানের মধ্যে ঝুলন্ত প্রদীপ নকশার সৃষ্টি করা হয়েছে। আর অবনত অংশে ফ্রেম ছাড়া খিলান নকশার মধ্যে রয়েছে ঝুলন্ত প্রদীপের মোটিফ। ঝুলন্ত প্রদীপদানগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য, কখনও তা ফুলদানী আকারেও উৎকীর্ণ হয়েছে। প্রদীপদানের মধ্যে প্রায়শই পবিত্র জলের পাত্র (Vase

of Sacrad Water), ইটারনাল নট (Eternal/endless Knot), প্রস্ফুটিত পদ্ম[১], পদ্মের পার্শ্বচিত্র ইত্যাদি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতীক উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়।[২] প্রতিটি ঝুলন্ত নকশায় যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে। তেমনি প্রদীপ ঝোলাবার জন্য যে শিকল উৎকীর্ণ করা হয়েছে তাও বৈচিত্র্যময়। মসজিদের কিবলা দেয়ালের পিছনে প্রায় পনের ধরনের শিকল নকশা দেখা যায়। প্যানেল বদ্ধ অলংকার-খিলানসমূহের মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে ইটের ক্ষুদ্র স্তম্ভ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। স্তম্ভগুলো ইতোপূর্বে নির্মিত বরী মসজিদের মিহরাবে ব্যবহৃত স্তম্ভ নকশার অনুরূপ মুসলিম-পূর্ব যুগে নির্মিত পাথরের স্তম্ভ নকশার আদলে গড়া।

মসজিদ অভ্যন্তরের নকশা : মসজিদের অভ্যন্তরে পোড়ামাটির অলংকরণগুলো মূলতঃ পাথরের মিহরাবসমূহের উপর খিলান-পটহতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মসজিদের কিবলা দেয়ালে খিলানের সংখ্যা মোট ৪২টি। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় নেভ এর উত্তর পার্শ্বের দরজা ও তখ্‌তের উপরের পাঁচটি ছাড়া সকল খিলান-পটহসমূহে পোড়ামাটির অলংকরণ পরিলক্ষিত হয় (চিত্র:)। দক্ষিণ দিকের আঠারটি খিলান-পটহের মধ্যে সর্ব দক্ষিণের খিলান-পটহটি দুইসারি পাড় নকশা দিয়ে আবদ্ধ। মাঝখানে রয়েছে চার পাপড়ির জাল নকশা ও এর মাঝখানে খিলান শীর্ষ হতে ঝুলন্ত একটি পেনডেন্ট বর্তমানে পেনডেন্ট ফলকটির জায়গা শূন্য রয়েছে।

দ্বিতীয় মিহরাবের খিলান-পটহে চর্তুরদিকে দুই স্তরে লতানো সংযুক্ত ফিতা নকশা রয়েছে। এর মাঝখানের অংশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গকার খোপে বিভক্ত করে তার মধ্যে একটি করে চক্রাকার নকশা উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এখানকার ঝুলন্ত নকশাটি বর্তমানে খসে পড়েছে।

তৃতীয় খিলান এর খিলান বাঁকের দুইদিকে রয়েছে বহুখাঁজ নকশা। অভ্যন্তরে বর্গ ভিত্তিক জ্যামিতিক নকশা সৃষ্টিকরা হয়েছে। খিলান শীর্ষ হতে ঝুলন্ত প্রদীপ নকশাটি এখানে অক্ষত রয়েছে। একটি পাঁকানো শিকল দিয়ে প্রদীপটি ঝোলানো।

চতুর্থ খিলানের দুই দিকেও বহুখাঁজ নকশা দেখা যায়। খিলান-পটহের মধ্যবর্তী অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তাকার প্যানেলে বিভক্ত প্রত্যেকটিতে ক্ষুদ্র তিন খাঁজ খিলান নকশা রয়েছে। আয়তকার প্যানেলগুলোর নীচের সারিতে প্রতিটি তিনখাঁজ খিলানের শীর্ষ থেকে ঝুলছে একটি করে প্রদীপদান। দ্বিতীয় সারিতে তিনটি ঝুলন্ত ফুলের কলি, তৃতীয়টিতে ঝুলন্ত চক্রের মধ্যে আট পত্র যুক্ত পদ্ম চতুর্থটিতে একটি দন্ডের দুই পাশে বিমূর্ত লতার নকশা,

---

১. বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মে পদ্ম প্রতীকটি অত্যন্ত গুরুতের সাথে স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় ব্যবহৃত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে পদ্ম মানব হৃদয়ের/আত্মার প্রতীক।এতে বলা হয় মানব হৃদয় একটি পদ্ম কলির ন্যায় বদ্ধ অবস্থায় থাকে। বৌদ্ধের শিক্ষা চর্চার মাধ্যমে তা সূর্যালোকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় বিকাশিত হয়। পদ্ম পঙ্কে জন্মে। পদ্ম লতা পানিতে বেড়ে ওঠে এবং এর ফুল পানির উপরে প্রস্ফুটিত হয়। এটা এই পঙ্কিল জগতে বেড়ে ওঠা আত্মা বৌদ্ধের শিক্ষা ও এর অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সূর্যলোকে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আলোকিত ও বিকশিত হওয়ারই এক প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত। file:///C: Symbolism in Buddhist Art-Buddhism

২. বৌদ্ধ 'অষ্টমঙ্গল' প্রতীক গুলো হল - শঙ্খ, পদ্ম, চক্র, ছত্রী, প্রান্ত বিহীন ফিতার বুনট, জোড়া মৎস, বিজয় কেতন ও পবিত্র জলের পাত্র। বৌদ্ধ স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্প সৃষ্টিতে এই মঙ্গল প্রতীকসমূহের বিস্তর ব্যবহার দেখা যায়। 'প্রান্ত বিহীন ফিতার বুনট নকশা' মধ্য এশিয়ার মুসলিম স্থাপত্য নকশায় বহু পূর্ব হতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পঞ্চমটিতে ঝুলছে বৌদ্ধ প্রতীক (Eternal Knot)' এর ন্যায় সংযুক্ত বুনোট নকশা, এবং সবচেয়ে উপরের সারিতে রয়েছে একটি করে ঝুলন্ত পদ্ম কলি। আর এই সমস্ত নকশার কেন্দ্রে রয়েছে যথারীতি একটি ঝুলন্ত প্রদীপ দান, খিলান পটহের নকশাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে Eternal Knot, জোড়া মৎসের ন্যায় বিমুর্ত অলংকরণ, পদ্ম ও চক্রের উপস্থাপন, ঝুলন্ত তিনটি কলি সবকিছুই বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতীকের ইঙ্গিত বহন করে।

পঞ্চম খিলানটির প্রায় দ্বিতীয় খিলানে মতই খোপের মধ্যে চক্র নকশায় সজ্জিত।

ষষ্ঠ খিলানেও বর্গভিত্তিক নকশা সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে ভূমিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গে বিভক্ত প্রতিটি বর্গ গুন চিহ্নের ন্যায় রেখা দ্বারা চার ভাগ করা। এর প্রতি পার্শ্বে রয়েছে দুটি পাতা ও সুক্ষ্মাগ্র যুক্ত ফুলকলির মোটিফ।

সপ্তম খিলানের ভূমি ছয় কোনা যুক্ত তারকা নকশায় (hexagonal) পূর্ণ। প্রতিটি তারকার কেন্দ্রে রয়েছে ছয় পত্রযুক্ত একটি ফুল। এখানে কেন্দ্রীয় ঝুলন্ত প্রদীপটি পনাপাতার আকৃতির। শিকলটি পাঁকানো নয় বরং পরস্পর সংযুক্ত। খিলান-পটহের নিচের দিকে আড়াআড়ি ক্ষেত্রকে ১৬টি প্যানেলে বিভক্ত করে আর মাঝে লতা ও ফিতার বিমুর্ত নকশা সৃষ্টি করা হয়েছে।

অষ্টম খিলানে পাঁচটি নকশা স্তর দিয়ে সমগ্র খিলান-পটহকে পূর্ণ করা হয়ছে।

নবম খিলানের কেন্দ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিকোণ যুক্ত পাড় নকশায় পূর্ণ। এর দুই পার্শ্বে ছয় সারি পাড় নকশা দিয়ে সজ্জিত। খিলানের নীচের দিকে চার সারি ফুল ও বিমুর্ত লতা নকশা রয়েছে। এই খিলানে কোন ঝুলন্ত কেন্দ্রীয় প্রদীপ নকশা নাই। এর নিচের অংশে তিন সারি আড়াআড়ি পাড় নকশা রয়েছে যার সবচেয়ে নীচে চারপত্র বিশিষ্ট ফুলকারী নকশা সবচেয়ে উপরে ফুলদানী থেকে উত্থিত বিমূর্ত লতার একসারি নকশা রয়েছে, যা ফুলদানীর উভয় দিকে চক্রাকারে শেষ হয়েছে। একটি দন্ড যুক্ত পদ্মকলি দ্বারা প্রতিটি লতাসহ ফুলদানী পৃথক করা হয়েছে। এই নকশা শ্রেণীটি উপরে ও নীচে লতার পাড় নকশা দ্বারা আবদ্ধ।

দশম খিলান-পটহটি বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। খিলান অলংকরণ শুরু হয়েছে একটি বহু খাজ খিলান নকশা দিয়ে, এর পর চার ধাপে চারটি পাড় নকশা রয়েছে। পাড়গুলো সংযুক্ত ফিতা, লতানো ও সংযুক্ত নকশা দ্বারা সজ্জিত। খিলান-পটহের কেন্দ্রে রয়েছে একটি ত্রিকোনাকার নকশা। নকশাটিতে একটি দন্ডের দুইপাশের পত্রগুলো উর্ধ্বমুখে ক্রমহ্রাসমান উঠে গিয়ে একটি পদ্মকলিতে যেয়ে শেষ হয়েছে। এই ধরণের ত্রিকোণ নকশা 'রেখা' শীর্ষ যুক্ত স্তুপে লক্ষ্য করা যায়। এই ত্রিকোণ নকশার দুই পাশের অংশে বিমূর্ত লতা উপস্থাপিত হয়েছে। খিলান-পটহের নীচের দিকে একসারি লতানো নকশার আস্তিত্ব এখনও লক্ষ্য করা যায়।

একাদশ খিলান-পটহটি তৃতীয় খিলান-পটহের অনুরূপ বর্গ ভিত্তিক জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত।

দ্বাদশ খিলান-পটহটি বহুখাঁজ খিলানের নকশা দ্বারা আবদ্ধ। এর নীচে তিনটি চওড়া সংযুক্ত লেস নকশা দ্বারা খিলানের চতুর্দিক আবদ্ধ করে মাঝখানে একটি ত্রিকোনাকার ভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি চওড়া পাড় আবার সরু পাড় দ্বারা একে অন্যের থেকে আলাদা। ত্রিকোনাকার কেন্দ্রীয় ভূমিতে একটি আয়তাকার প্যানেলে ঝুলন্ত প্রদীপদান উৎকীর্ণ হয়েছে। প্রদীপটির অভ্যন্তর ভাগকে আড়াআড়িভাবে বসানো একটি রেখা দ্বারা দুটি ভাগে ভাগ করে এর নীচের অংশে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ও উপরে একটি চক্রের মধ্যে আষ্টপত্র বিশিষ্ট পদ্ম উৎকীর্ণ করা হয়েছে, প্রদীপদানটি একটি ক্ষুদ্র পাঁচ পত্রযুক্ত খিলান নকশার ভেতরে স্থাপিত হয়েছে। আয়তাকার এই প্যানেলের দুই পার্শ্বের ভূমি বিমুর্ত লতা নকশায় পূর্ণ।

ত্রয়োদশ খিলান-পটহে খিলানের প্রান্তরেখা ধরে একসারি পাঁকানো লতা নকশা রয়েছে। এর নীচে বহু খাঁজ খিলান নকশা। খিলান-পটহের নিম্নাংশে ধারাবাহিকভাবে বসানো একটি ফুলদানী সদৃশ স্তম্ভ ও খিলানস্থিত পদ্মের প্রফাইল নকশার একটি সারি রয়েছে। প্রান্তরেখা হতে সৃষ্ট পাড় নকশা ও নিম্নাংশে উৎকীর্ণ ফুলদানী ও পদ্ম সারির মাঝের ত্রিকোনাকার অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারপত্রের ফুল দ্বারা পূর্ণ। খিলানের শীর্ষ হতে ঝুলন্ত একটি ফুলদানী সদৃশ প্রদীপদান যার উপস্থাপনকে বৌদ্ধ 'অষ্টমঙ্গল' প্রতীক 'The Vase of the Inexhaustible Treasure' এর সঙ্গে তুলনা করা চলে।

চতুর্দশ খিলান-পটহতেও প্রান্ত রেখায় লতা নকশা ও বহু খাঁজ খিলান নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। খিলানের ভিত্তিতে একটি চওড়া প্যানেলে এক সারি যোগ চিহ্নের ন্যায় অলংকরণ রয়েছে। যোগ চিহ্নের ভেতরের অংশে কেন্দ্রীয় পদ্ম নকশা ও চার বাহুতে বিমূর্ত লতার নকশা রয়েছে। প্রতিটি যোগ চিহ্নে ইংরেজী 'I' অক্ষরের ন্যায় দন্ড দ্বারা একটি থেকে অন্যটি পৃথক। 'I' অক্ষরের মধ্যবর্তী অংশ প্রান্ত বিহীন ফিতা নকশায় পূর্ণ। খিলান-পটহের মধ্যবর্তী ত্রিকোনাকার অংশটি ধাপযুক্ত যোগ চিহ্নের ন্যায় নকশায় পূর্ণ এবং কেন্দ্রে রয়েছে ঝুলন্ত প্রদীপদান।

পঞ্চদশ খিলান-পটহ প্যাঁচানো পাড় ও বহু খাঁজ খিলান নকশা দিয়ে শুরু হয়েছে। এর মধ্যবতী অংশের দুই প্রান্তে সাতটি ধাপ ক্রমশঃ শীর্ষ পর্যন্ত সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপে পদ্মের পার্শ্ব নকশা প্রান্তবিহীন ফিতা নকশা ও বিমূর্ত লতা নকশা রয়েছে। কেন্দ্রে সম্ভবতঃ একটি খিলান নকশার মধ্যে ঝুলন্ত প্রদীপদানের ফলক ছিল যা বর্তমানে টিকে নাই। খিলান-পটহের বাকী অংশে পরস্পর সংযুক্ত নকশা দ্বারা পরিপূর্ণ।

ষোড়শ খিলান-পটহে পাড়ের মধ্যবর্তী অংশে আলাদা আলাদা বর্গে বিমূর্ত লতা নকশা দ্বারা পূর্ণ ছিল। বর্তমানে সমস্ত নকশাই অস্পষ্ট। খিলান-পটহের অভ্যন্তরীন প্রান্ত রেখা ধাপে ধাপে শীর্ষ পর্যন্ত উঠে গেছে। শীর্ষ থেকে ঝুলছে একটি ফুলদানী সদৃশ প্রদীপদান। খিলানের নিম্নাংশে একটি চওড়া সংযুক্ত নকশার পাড় রয়েছে।

সপ্তদশ খিলান-পটহতে বহু খাঁজ খিলান নকশার ভেতর দিকে লতানো নকশার একটি পাড় রয়েছে। সমগ্র ভূমি চার পত্র ফুলের জালি দ্বারা পরিপূর্ণ। খিলান শীর্ষ থেকে ঝুলছে একটি ফুলদানী সদৃশ প্রদীপদান। প্রদীপদানের অভ্যন্তরে প্রান্ত বিহীন ফিতা নকশা দেখা যায়।

অষ্টদশ খিলান-পটহে লতানো পাড় ও বহুখাঁজ খিলানের ভেতর দিকে আরও তিনটি প্রান্ত রেখা বরাবর ফিতা ও লতা নকশার পাড় রয়েছে। খিলান-পটহের নীচে আড়াআড়ি ভাবে আর একসারি ফিতা নকশা দেখা যায়, আভ্যন্তরীণ ত্রিকোণাকার অংশের উপর দিকে একটি অলংকৃত খিলানে ঝুলন্ত প্রদীপ দান উৎকীর্ণ করা হয়েছে বাকী অংশ সংযুক্ত নকশায় পূর্ণ।

উনবিংশ, বিংশ ও একবিংশ খিলান-পটহ প্রায় একধরণের নকশা দেখা যায় এর মাঝখানে একটি আয়তকার নকশাকৃত ফ্রেমের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে দুটি ইটের ক্ষুদ্র স্তম্ভের উপর একটি বহুখাঁজ খিলান। খিলানের উপরে একটি পাড় নকশা ও এর উভয় স্প্যানিড্রিলে একটি করে পদ্ম নকশা রয়েছে। খিলানের মধ্যবর্তী অংশে যথাক্রমে বরফি ও সংযুক্ত নকশা দ্বারা অলংকৃত। খিলান শীর্ষ থেকে ঝুলছে একটি প্রদীপদান। খিলান ফ্রেমের দুইপাশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গে বিভক্ত করে তাতে চক্রবদ্ধ পদ্ম বা চারদিক থেকে চারটি পত্র ও কলিযুক্ত নকশা স্থাপন করা হয়েছে। খিলান ফ্রেমের শীর্ষ রয়েছে বিস্তৃত লতার অলংকরণ।

মসজিদের ত্রয়োবিংশ খিলান-পটহে একটি ক্ষুদ্র অবতল মিহরাব রয়েছে। এ ধরনের অবতল মিহরাব আর কোন খিলান-পটহে উপস্থাপিত হয়নি। একটি পুষ্প শোভিত লতার নকশার ফ্রেম দ্বারা খিলানটি আবদ্ধ। খিলানের স্প্যানড্রিল অংশটি কালের করাল গ্রাসে খুবই ক্ষতিগ্রস্থ। এখানকার অলংকরণ কিছুই বর্তমানে টিকে নাই। তবে খিলান অভ্যন্তরে খিলান উত্থানের রেখা বরাবর একটি আড়াআড়ি রেখায় এক সারি ঝুলন্ত মালা নকশা ও তার উপরে একসারি পদ্মপত্রের ভিতরে পদ্ম ফুলের প্রফাইল মোটিফ রয়েছে। খিলানের নিম্নাংশ পাড় নকশা দিয়ে তিনটি আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত করে প্রতিটিতে খাঁজ খিলান ও খিলান শীর্ষ হতে ঝুলন্ত প্রদীপদান নকশা উৎকীর্ণ করা হয়েছে। খিলান ফ্রেমের দুই পার্শ্বে সংযুক্ত নকশা দিয়ে পূর্ণ। খিলান রেখা বরাবর বহুখাঁজ খিলান নকশা সৃষ্টি করে প্রতিটি খাঁজে একটি করে চক্রযুক্ত পদ্ম নকশা স্থাপন করা হয়েছে। খাঁজ খিলানের প্রান্ত ধরে রয়েছে এক সারি প্রান্ত বিহীন ফিতা নকশা।

চব্বিশ, সাতাশ ও একত্রিশতম খিলান-পটহ একই ধরণের চার পত্র যুক্ত জালি নকশায় পূর্ণ খিলান শীর্ষ থেকে ঝুলছে একটি প্রদীপ দানের নকশা।

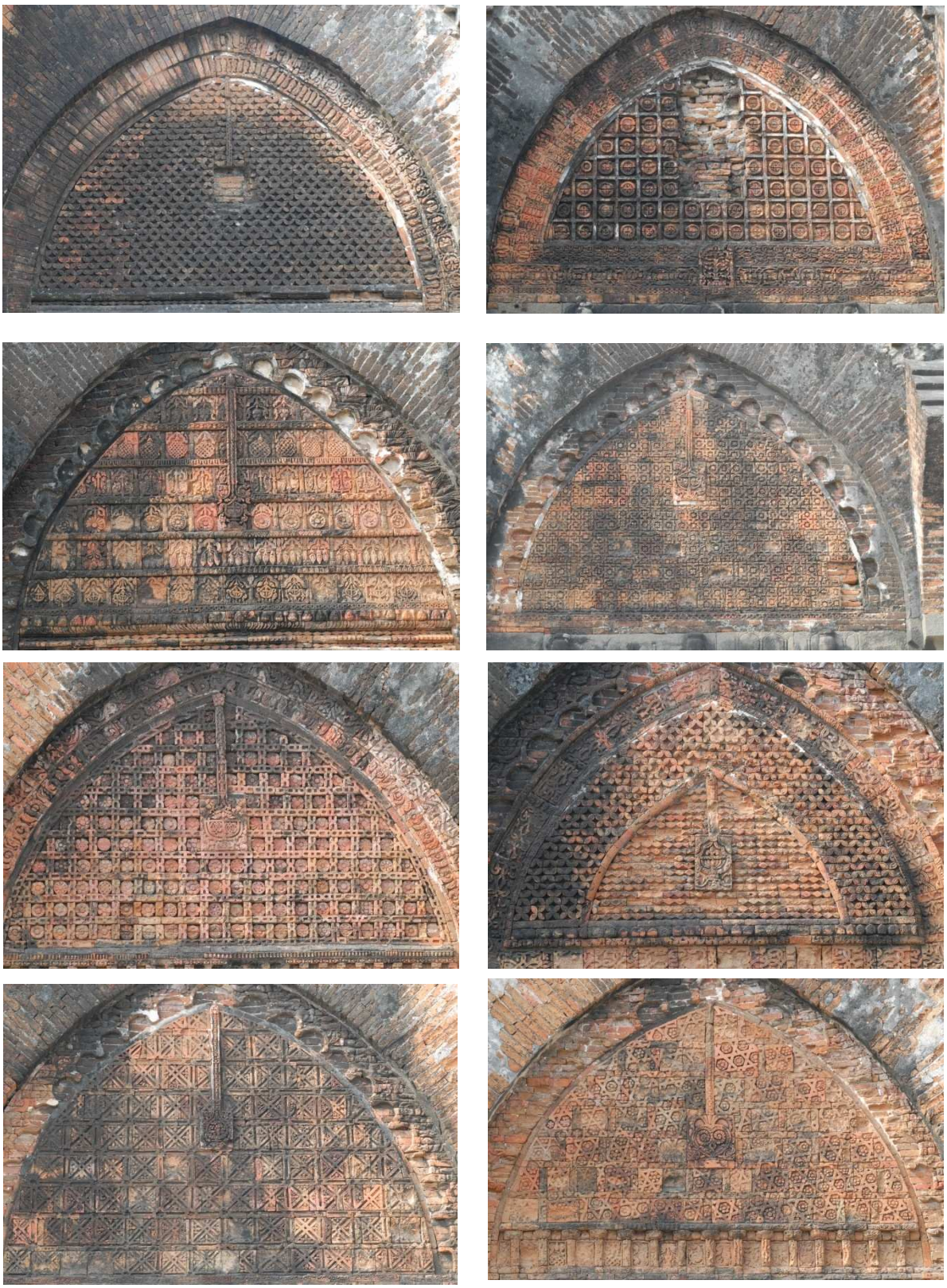

চিত্র: ৪.৯

চিত্র: ৪.১০

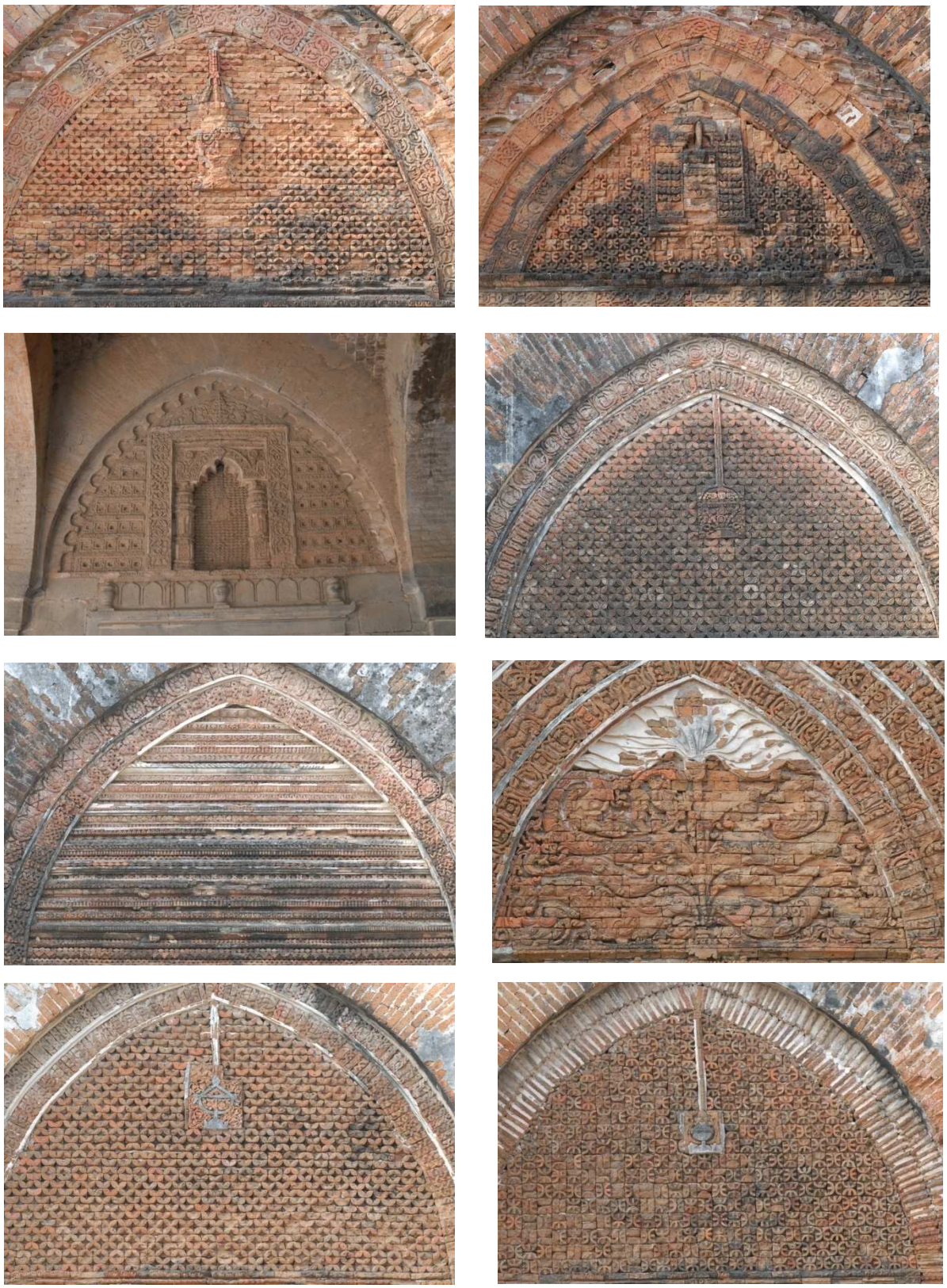

চিত্র: ৪.১১

চিত্র: ৪.১২

পঁচিশতম খিলান-পটহটি একটু ভিন্ন এখানে খিলানপ্রান্ত রেখায় দুটি পাড় নকশা দেখা যায়। প্রথমটি চক্র ও ফুলযুক্ত বরফির ধারাবাহিক নকশায় অলংকৃত। দ্বিতীয় পাড়ে প্রান্ত বিহীন লেস নকশা দেখা যায়। খিলান-পটহটি প্রায় ২৫টি ভিন্ন ভিন্ন সরু অলংকরণ সারিতে সন্নিবেশিত হয়ে খিলান-পটহটি পূর্ণ করে দিয়েছে।

ছাব্বিশ তম খিলান-পটহতে প্রান্ত রেখা হতে ভেতরের দিকে খিলানের রেখা বরাবর পাঁচটি পাড় নকশা দেখা যায়। ভেতরের অংশে বৃহৎ পদ্ম যুক্ত বিমূর্ত লতানো নকশা দিয়ে পূর্ণ।

আটাশ ও ত্রিশ নম্বর খিলান-পটহের সংযুক্ত নকশায় পূর্ণ খিলান শীর্ষ হতে যে প্রদীপদান ঝুলছে তার সাথে বৌদ্ধ পবিত্র জলের ঘটের প্রতীকের সাদৃশ্য রয়েছে। ত্রিশ নম্বর খিলানের শীর্ষ থেকে ঝোলানো শিকলের সাথে আয়তকার প্যানেলে বিমূর্ত লতা নকশা স্থাপন করা হয়েছে।

মসজিদের পিছন দিকে নির্মিত সিকান্দার শাহর সমাধি হিসাবে পরিচিত বর্গাকার কক্ষটির উত্তর দিকে অবস্থিত তিনটি প্রবেশ খিলানের ফ্রেমে ও প্যানড্রিলে এবং তখ্ত কক্ষের পূর্ব দিকে 'বাদশাহ্-কা-তখ্ত' এ যাওয়ার প্রবেশদ্বারের উপরে নির্মিত খিলান-পটহে কিছু পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায়। খিলান-পটহের পরস্পর সংযুক্ত নকশা ও উত্তরের প্রবেশ খিলানে চারপত্রের ফুলকারীর জালী ও ঝুলন্ত মালা নকশার পাড় লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণ আলোচনা

আদিনা মসজিদকে পোড়ামাটির শিল্প অলংকরণের প্রাথমিক ভান্ডার রূপে আখ্যায়িত করা চলে। ইতোপূর্বে মুসলিম স্থাপত্যে (বরী মসজিদে) পোড়ামাটির অলংকরণ ব্যবহারের সূচনা হয়েছে তবে পরিমাণে খুবই স্বল্প মাত্রায়। পূর্ববর্তী স্থাপত্যের অলংকরণ ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে আদিনা মসজিদে আরও বিচিত্র ধরনের মোটিফের ব্যবহার করা হয়েছে। উপর্যুক্ত মসজিদ গাত্রের এই বিচিত্র ও অপরূপ কারুকার্য যেন একে অলংকরণের একটি জাদুঘরে পরিণত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, মসজিদের পঁচিশতম খিলান-পটহতে প্রায় ছাব্বিশ ধরনের সরু পাড়-নকশার ব্যবহার হয়েছে। অলংকরণের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল মসজিদের মুসলিমের আদর্শ অনুযায়ী কোন ভাস্কর্য বা মূর্তি অলংকরণের জন্য সৃষ্টি করা নাহলেও বেশ কিছু বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতীক যেমন-পদ্ম, Eternal knot, The The Vase of the Inexhaustible Treasure ইত্যাদির উপস্থাপন চোখে পরে। পোড়ামাটির অলংকরণ সৃষ্টিতে স্থানীয় শিল্পীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ সম্ভবত এই ধরণের অলংকরণ সৃষ্টির কারণ বলে মনে হয়। আদিনা মসজিদের পোড়ামাটির নকশাগুলো বেশীভাগই মুসলিম-পূর্ব স্থাপত্য নকশা থেকে নেওয়া। মুসলিম-পূর্ব যুগের যে সকল (পাল পরবর্তী) স্থাপত্য এখনও টিকে আছে তাতে পোড়ামাটির অলংকরণ খুব বেশী একটা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্টাকো বা পাথর খোদাই নকশাই স্থাপত্য অলংকরণে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তাই বলা যায়, আদিনা মসজিদে পোড়ামাটির অলংকণের যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তা মূলতঃ মুসলিম পূর্ব যুগের পাথর খোদাই বা স্টাকো অলংকরণ থেকেই নীত। আদিনা মসজিদের পূর্ব হতে মুসলিম স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণে পাথর খোদাই অলংকরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বরী মসজিদের মিহরাবের খিলান স্তম্ভের কথা বলা যায় যা সম্পূর্ণভাবে পাথর নির্মিত স্তম্ভ নকশার অনুকরণে নির্মিত। আদিনা মসজিদেও এই অনুকরণের ধারা অব্যহত থাকে।

গ. রাজা গণেশ বংশীয়দের শাসনামলঃ (১৪১৪-১৪৩৬ খ্রি.)

পনের শতকের প্রারম্ভ হতে বাংলার রাজনীতিতে একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এসময় ইলিয়াস শাহী বংশের পতন হয়। এসময় হতে পরবর্তী প্রায় বাইশ বছর বাংলায় একটি হিন্দু বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা গণেশ নামে একজন হিন্দু অভিজাত সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহর মৃত্যুর পর (১৪১৪ খ্রি.) বাংলার সিংহাসন দখলের মাধ্যমে এখানে হিন্দু বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা গণেশ খুব অল্প সময়ই শাসন ক্ষমতায় ছিলেন।[১]

১. রাজা গণেশ দুই দফায় বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রথমে ৮১৭ হিজরী (১৪১৪খ্রি.) সালে, তিনি ক্ষমতা দখল করে প্রায় ছয় মাস বাংলা শাসন করেন। দ্বিতীয় দফায় ৮২০ হিজরী (১৪১৭ খ্রি.) হতে ১৩/১৪ মাস সময় তিনি ক্ষমতা অধিষ্ঠিত ছিলেন; *আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯-৪০;

এ সময় বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ জটিল আকার ধারণ করলে গণেশ তাঁর স্বীয় পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে বসান। যদু ধর্মান্তরের পর জালাল-উদ্-দীনের শাসনকাল ইতিহাসে একটি শান্তি শৃংঙ্খলার যুগ হিসেবে চিহ্নিত। তিনি পান্ডুয়া থেকে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন।[১] জালাল-উদ্-দীনের শাসনামলে মসজিদ নির্মাণের দুটি আরবীয় শিলালিপি[২] রাজশাহী ও ঢাকা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে তার সময়ে পান্ডুয়ায় নির্মিত তাঁর নিজের সমাধি সৌধটি (একলাখী সমাধি) তাঁর রাজত্ব কালকে বাংলার স্থাপত্য ইতিহাসে বিশেষায়িত করেছে। কেননা এই ইমারত নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলার স্থাপত্যের একটি নতুন মোড় পরিলক্ষিত হয়। এসময় থেকে বাংলার সম্পূর্ণ ইটের তৈরী স্থাপত্যের প্রচলন হয়। স্থাপত্য রীতিতে বক্রকর্ণিশের ব্যাবহারসহ পোড়ামাটির অলংকরণ প্রধান অলংকরণ উপাদান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে যা পরবর্তীকালে স্থাপত্য চিন্তার দিক নির্দেশনা হিসেবে রয়ে যায়।[৩] এখানে ব্যবহৃত অলংকরণের মোটিফগুলোতে স্থানীয় ও মুসলিম উপাদানের সংমিশ্রণে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ববর্তী স্থাপত্যে ব্যবহৃত নকশায় যেমন ঝুলন্ত প্রদীপ, ঝুলন্ত মালা ও টারসেল, পদ্ম, স্থানীয় লতা ও ফুল, বহুখাঁজ খিলান ইত্যাদির সাথে নতুন করে মুসলিম স্থাপত্যে আরবীয় লতা, কলি নকশা ও জ্যামিতিক নকশা যুক্ত হয়। ইটের স্থাপত্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পোড়ামাটির নকশার ব্যবহার এখানে অনেক যুক্তিসঙ্গত ও নান্দনিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী আদিনা মসজিদে লক্ষ্য করা যায় না।[৪] গণেশ বংশীয় সুলতানদের আমলের স্থাপত্যে মধ্যে তিনটি ইমারত-পান্ডুয়ার একলাখী সমাধি, গৌড়ের চিকা দালান ও ঢাকার মোয়াজ্জমপুরে জামি মসজিদটি[৫] বর্তমানে টিকে আছে। এর মধ্য চিকা দালান একলাখী সমাধির অনুকরণে তৈরী।

একলাখী সমাধি

একলাখী সমাধি হিসাবে পরিচিত জালাল-উদ্-দীন মোহাম্মদ শাহের সমাধিটি মালদহ জেলার হযরত পান্ডুয়ায় অবস্থিত পান্ডুয়ার কুতুবশাহী মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে সমাধিটির অবস্থান। সমাধি হতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। মনে করা হয় রাজা গণেশের ধর্মান্তরীত পুত্র জালাল-উদ্-দীন মোহাম্মদ কর্তৃক সমাধিটি নির্মিত হয়েছিল,[৬] যিনি ১৪১৪-১৪৩৩ খ্রি. পর্যন্ত বাংলার শাসন করেছেন।[৭] পার্সি ব্রাউন সমাধিটি ১৪২৫ সালের দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করেন[৮] একলাখী সমাধিটি সম্পূর্ণ ইটের নির্মিত একটি বিশাল স্থাপনা। সমাধিটির বাইরের

---

১. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ২৪৩
২. এ.বি.এম. হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪
৩. A.H. Dani , *op.cit.*, pp. 80-83; এ. বি. এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১
৪. Muhammad Hafizullah Khan, *op.cit.*, p.105
৫. এ.বি.এ. হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০
৬. Alexander Cunningham, *op.cit.*, p. 88
৭. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪
৮. Percy Brown , *Indian Architecture (Islamic period)*, Calcutta, D.B.Taraporevala Sons &Co.Pvt. Ltd., 1968, p.38

পরিমাপ প্রায় ২২.৭৫ মিটার বর্গ। কিন্তু অভ্যন্তরে এটি অষ্টকোণাকার রূপ নিয়েছে যার ব্যস ১৪.৭৫ মিটার। সমাধি অভ্যন্তরের চার কোণে চারটি ১.৫ মিটার বর্গকার ক্ষুদ্র কক্ষ রয়েছে যা ৬৫ সে.মি. চওড়া দরজা দিয়ে বৃহৎ কক্ষের সাথে সংযুক্ত। অষ্টকোনাকার কক্ষের প্রতিকোণে একটি করে সংযুক্ত পাথরের স্তম্ভ রয়েছে। সমাধির গম্বুজ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে পেনডেনটিভ। সমাধিতে প্রবেশের জন্য এর চারবাহুতে চারটি সুঁচালো খিলানপথ রয়েছে।

চিত্র: ৪.১৩

বাইরের দিকে বর্গাকার সমাধিটির চার কোণে রয়েছে চারটি অষ্টকোনাকার পার্শ্ব-বুরুজ। উল্লেখ্য মুসলিম স্থাপত্যে এই প্রথম পার্শ্ব-বুরুজের নিদর্শন মেলে। সমাধির চার দেয়ালের মাঝখানের চারটি প্রবেশপথ। প্রবেশপথগুলোর ভিতর দিকে সুঁচালো খিলান যুক্ত কিন্তু বাইরের দিকে খিলানের উত্থান-রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি পাথরের ফ্রেম রয়েছে। ফ্রেমগুলো নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী মন্দির স্থাপত্য থেকে সংগৃহীত। খিলানের উপরের অংশ ইটের জালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ছাদের কার্নিশের চার কোণে হালকা বাঁক লক্ষনীয়। এ ধরণের বাঁকযুক্ত কার্নিশ একলাখী সমাধির পূর্বে নির্মিত কোন স্থাপত্যে দেখা যায়নি। এখানকার পার্শ্ব-বুরজ ও বাঁকযুক্ত কার্নিশের ব্যবহার পরবর্তী স্থাপত্যসমূহের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। বাইরের দেয়ালে উল্লম্বভাবে উন্নত ও অবনত অংশ সৃষ্টির মাধ্যমে টানা দেয়ালে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। দেয়ালের মাঝ বরাবর আড়াআড়ি একটি উদ্গাত ব্যান্ড বাইরের দেয়ালটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছে। অষ্টকোণাকার পার্শ্ব-বুরুজগুলোতেও উল্লম্বভাবে উন্নত ও অবনত অংশ রয়েছে। পার্শ্ব-বুরুজের নিম্নাংশে চারটি, মাঝবরাবর একটি ও উপরের অংশে দুটি উদ্গাত ব্যান্ড রয়েছে কার্নিশে তিনটি উদ্গাত ব্যান্ড সমগ্র স্থাপত্য টিকে ঘিরে রেখেছে। স্থাপত্য এই ধরণের উদ্গাত ব্যান্ডের পুনঃপুনঃ ব্যবহার

মুসলিম-পূর্ব যুগে নির্মিত 'রেখা' মন্দিরগুলোতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ একাদশ শতকে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়ায় অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের কথায় বলা যায়। একলাখী সমাধি স্থাপত্যটি একটি বিশাল গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। স্থাপত্যটি নির্মাণে অল্প কিছু পাথরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। স্থাপত্যের ভিত্তি ও খিলান উত্থান-রেখার উচ্চতায় দুটি পাথরের স্তর লক্ষ্য কর যায়। এছাড়া অভ্যন্তরীণ অষ্টকোণের প্রতিটি কোণে একটি করে সংযুক্ত পাথরের স্তম্ভ রয়েছে।

একলাখী সমাধি অলংকরণে গ্লেজড টাইলস (glazed tiles) ও চিত্রকর্মসহ বেশীভাগ ক্ষেত্রে পোড়ামাটির অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে।

অলংকরণ

বাইরের দেয়াল: সমাধির চারদিকের দেয়ালেই অত্যন্ত জাঁকালো পোড়ামাটির নকশায় অলংকৃত। এর চার দেয়ালের কেন্দ্রে অবস্থিত প্রবেশ-খিলানগুলি একটি ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। ফ্রেমটি খিলানের দুইধারে তিনটি আয়তকার প্যানেলে বিভক্ত, প্রত্যেক দিকের খিলান ফ্রেমের নীচের ও উপরের প্যানেলটি মাঝখানের প্যানেল অপেক্ষা দীর্ঘ। মাঝখানের প্যানেলটিতে দুটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ সমর্থিত একটি পাঁচ খাঁজ খিলান রয়েছে। খিলানের স্প্যানড্রিলে দুটি ক্ষুদ্র পদ্ম ও মাঝখানে একটি ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা রয়েছে। এই ক্ষুদ্র খিলানটি চারদিক একটি বিমূর্ত লতা নকশায় আবদ্ধ। এর উপরের অংশে তিনটি চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা রয়েছে। খিলান ফ্রেমের উপরের একটি উদ্গাত অংশ রয়েছে। এর কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র শিখর নকশা। এই প্যানেলের উপরে ও নীচের প্যানেল দুটির ভূমি দুই সারি উল্লম্ব প্যাঁচানো লতা নকশায়পূর্ণ। প্যাঁচানো লতা নকশাটি খিলান ফ্রেমের উপরাংশেও বিস্তৃত। উপরের অংশে লতানো নকশার মাঝে তিনটি শতদল চক্রবদ্ধভাবে স্থাপন করা হয়েছে। একটি কেন্দ্রে, অপর দুটি ফ্রেমের দুই কোনায়। ফ্রেমের ভিতরের অংশের সবচেয়ে উপরে দুই সারি স্তম্ভশীর্ষ (capital) নকশা রয়েছে। খিলান শীর্ষে এই ধরণের অলংকরণের ব্যবহার সর্বপ্রথম বরী মসজিদের মিহরাবে দেখা যায়। পরবর্তীকালের মসজিদগুলোতে মিহরাবের খিলানশীর্ষে এই অলংকরণটি প্রায় ১৬ শতক পর্যন্ত অনুসৃত হতে দেখা যায়। প্রবেশ-খিলানের দুই পার্শ্বে স্প্যানড্রিলের ত্রিকোনোকার অংশে খিলান ফ্রেমের পাঁকানো বিমূর্ত লতার চারটি সারি রয়েছে। দ্বিকেন্দ্রীক খিলানের প্রান্তরেখায় দুইসারি বিমূর্ত লতা নকশা ঘেরা। লতা নকশাগুলো খিলানের প্রতিটি ইটে আলদা আলাদা ভাবে স্থাপিত ও উর্দ্ধমুখী। খিলান রেখার ভেতরের দিকের শেষ প্রান্তে একসারি খাঁজ খিলান নকশা দেখা যায়। খাঁজগুলো চর্তুকেন্দ্রীক খিলানের ন্যায় নীচের দিকে কিছুটা চাপা। প্রবেশপথের দুই দিকের টানা দেয়াল একটি উদ্গাত রেখা দিয়ে দুই অংশে বিভক্ত। উপরের অংশে উন্নত দেয়ালে একটি করে ফ্রেমবদ্ধ প্যানেল নকশা রয়েছে। প্যানেলগুলো একটি লতানো ফ্রেমে আবদ্ধ খিলান নকশায় অলংকৃত। খিলানের শীর্ষ হতে ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা

রয়েছে। প্যানেলের নীচে দুটি উদ্গাত মোল্ডিং রয়েছে যার মাঝখানে একসারি লতা নকশা দেখা যায়। প্যানেলের উপরাংশে একটি উদ্গাত ব্যান্ড এর উপর একসারি মারলন নকশা রয়েছে যা পদ্মের পার্শ্বচিত্র দ্বারা শোভিত। সমাধির প্রতিটি দেয়ালের দরজার দুই পাশে তিনটি করে মোট ৬টি উন্নত দেয়ালাংশ রয়েছে। প্রতিটি উন্নত দেয়ালাংশের উপর দিকে এই ফ্রেম বদ্ধ খিলান নকশা রয়েছে। এই অনুসারে প্রতিটি দেয়ালে ছয়টি করে ফ্রেম-বদ্ধ খিলান নকশা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি দেয়ালে অবনত দেয়ালাংশ রয়েছে চারটি। প্রতিটি অংশের উপরের দিকে একটি স্বল্পোন্নত খাঁজ-খিলানের মধ্যে একটি ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা উৎকীর্ণ করা হয়েছে। অবনত অংশের নীচের দিকে পার্শ্ব-স্তম্ভের মোল্ডিং বরাবর চারটি মোল্ডিং রয়েছে। এদের মধ্যবর্তী অংশে বিচিত্র উদ্ভিজ্জ ও বিমূর্ত লতা নকশায় অলংকৃত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জ্যামিতিক নকশাও সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে নকশাকৃত চক্র ও হিরক নকশার ধারাবাহিক উপস্থাপন, পানপাতার ন্যায় বিমূর্ত নকশার ধারাবাহিক উপস্থাপন, প্রান্তহীন ফিতার প্যাঁচ নকশা, লতার মধ্যে প্যাঁচানো ফুল নকশা, ইত্যাদিসহ নকশার বৈচিত্র্য একলাখী সমাধি স্থাপত্য অলংকরণের এক সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে। নিচের মোল্ডিংগুলোর উপরে রয়েছে একসারি পদ্ম লতার পার্শ্বচিত্র দ্বারা শোভিত মারলন নকশা। আড়াআড়ি ভাবে মধ্যবর্তী অংশে যে উদ্গাত মোল্ডিং বাইরের দেয়ালকে উপর ও নিচ এই দুই অংশে বিভক্ত করেছে। মোল্ডিংটি বিভিন্ন ধরনের সরুপাড় নকশায় সজ্জিত। এদের মধ্যে বরফি পাড় ক্ষুদ্র পদ্ম পত্রের পাড়, দানাযুক্ত পাড়সহ বিচিত্র ধরনের নকশা রয়েছে। মোল্ডিং এর উপরে রয়েছে পদ্মলতার পাশ্বচিত্র সম্বলিত মারলন ও নীচের অংশে রয়েছে আরও একসারি নকশা। প্রতিটি উন্নত ও অবনত দেয়ালাংশে একই সারির নকশার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। অর্থাৎ উন্নত অংশে টারসেল ও ঝুলন্ত মালা নকশার পাড় থাকলে অবনত অংশে কলি ও ঝুমকো লতার সারি, উন্নত অংশে ফুল সন্নিবেশিত প্যাঁচানো নকশা থাকলে অবনত অংশে প্যাঁচানো ফিতার প্রান্তহীন নকশা দেখা যাবে। প্রতিটি উন্নত দেয়ালাংশের নকশা পাড়ের মাঝামাঝি উৎকীর্ণ হয়েছে একটি করে শীর্ষ যুক্ত দন্ড। শীর্ষদন্ডগুলো এখানে পেট মোটা ফুলদানী সদৃশ দন্ডের উপর শিবলিঙ্গের ন্যায় মোটিফ দ্বারা শেষ হয়েছে।

পার্শ্ব বুরুজগুলোর উলম্বভাবে উন্নত ও অবনত অংশে বিভক্ত। দেয়ালের মাঝখানে মোল্ডিং বরাবর একটি মোল্ডিং দিয়ে দুইভাগে বিভক্ত এর উপরের অংশে আরও দুটি মোল্ডিং বুরুজের উপরের ভাগকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেছে। প্রতিটি ভাগের উন্নত অংশে তিনপত্র শোভিত ফুলদানী নকশা ও অবনত অংশে খিলান নকশার মধ্যে ঝুলন্ত প্রদীপের অলংকরণ রয়েছে। নীচের অংশের বুরুজের ভিত্তির উপরে চারটি মোল্ডিং এর মাঝে অলংকৃত পাড় নকশার ভিন্নতা এনে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। সমাধির বক্র কার্নিশের নীচে দুটি মোল্ডিং এর মাঝে দুই

সারির অলংকরণ দেখা যায়। দুই সারিতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ দ্বারা সৃষ্ট ক্ষুদ্র খিলানের মধ্যে লতাগুল্মোর অংশ উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় মোল্ডিং এর নীচে চারপত্র বিশিষ্ট ফুলের জাল নকশায় শোভিত।

চিত্র: ৪. ১৪

চিত্র: ৪.১৫

চিত্র: ৪.১৬

চিত্র: ৪.১৭

সমাধির অভ্যান্তরে খুব সামান্য অলংকরণে নিদর্শন বর্তমানে পাওয়া যায়। এর মধ্যে গম্বুজ অংশের কিছু অলংকরণ টিকে আছে। গম্বুজের ভিত্তিতে তিন সারি নকশা দেখা যায়। সর্বনিম্নে চারপত্র ফুলের জালি নকশা, এর উপর পদ্মলতার পার্শ্বচিত্র সম্বলিত মারলন ও উপরে অপর একটি নকশা পাড় দেখা যায়। হাফিজল্লাহ খান গম্বুজ শীর্ষে

একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের নকশার কথা উল্লেখ করেছেন[১] যার কোন অবশিষ্ট বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে ভিত্তির নকশা-পাড়ের উপরে গম্বুজ বৃত্তকে ষোলটিভাগ করে নিধারিত দুরত্বে একটি অলংকৃত রীবের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় যা সম্ভবত পূর্ব উল্লেখিত পদ্ম নকশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সাধারণ আলোচনা

পান্ডুয়ার একলাখী সমাধিটি বাংলার স্থাপত্য ও অলংকরণ উভয় দিক দিয়েই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইমারত। যুগ সন্ধিক্ষণে নির্মিত এই ইমারতটি বাংলার স্থাপত্যের স্বরূপ নির্ধারণকারী ইমারত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। স্থাপত্য পরিকল্পনায় এখানে যেমন নতুনত্ব এসেছে তেমনি তা পরবর্তী স্থাপত্য অলংকরণে দিক নির্দেশক হয়ে দাঁড়ায়। স্থাপত্য অলংকরণের স্থানীয় মোটিফগুলোই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। পাঁকানো লতা, প্রান্তহীন ফিতার বুননী নকশা,[২] বিমূর্ত লতা বা বিভিন্ন প্যাটার্নের সারিবদ্ধ উপস্থাপন, পুঁতি বা পাতার ঝুলন্ত মালা নকশা, ফুটন্ত পদ্মের পার্শ্ব নকশা, দেয়ালে প্যানেলবদ্ধ খিলান নকশা ও তাতে ঝুলন্ত প্রদীপ, প্যানেলবদ্ধ খিলান নকশা বিচিত্র স্তম্ভ, দেয়ালকে উন্নত ও অবনত অংশে বিভক্ত করে অবনত অংশের নিম্নভাগে একাধিক মোল্ডিং তৈরী করে তাতে অলংকৃত ফ্রিজের ব্যবহার, কর্ণিশ বা দেয়ালের মাঝামাঝি মোল্ডিং এর উপর ও নীচে যথাক্রমে মারলন ও ঝুলন্ত মালা নকশা, গম্বুজের অভ্যন্তরে অলংকৃত রীব ও শীর্ষে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম নকশা ইত্যাদি সবটাই স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য থেকে উৎসরিত। মুসলিম স্থাপত্যের বিশেষত্ব হিসাবে এখানে কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রাণী মোটিফ উপস্থাপিত হয়নি। তবে যেখানে প্রাণী মোটিফ নেই কিন্তু তা হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতীক সেই ধরণের নকশা উপস্থাপনও লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে আদিনা মসজিদের বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রতীক ও একলাখীর দেয়ালের উন্নত অংশে দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশের ফ্রীজের শীর্ষদন্ডে শিবলিঙ্গ সদৃশ মোটিফের ব্যবহারে কথা উল্লেখ করা যায়।(চিত্র:) স্থাপত্যের ভিত্তিতে একাধিক মোল্ডিংসহ সমগ্র গাত্রে বিভিন্ন মোল্ডিং এর ব্যবহার মুসলিম-পূর্ব যুগের রেখা দেউলগুলোতে দেখা যায়। দেয়ালের অবনত অংশের নিম্নভাগে একাধিক মোল্ডিং এর ব্যবহার তের শতকে নির্মিত পাগানের বৌদ্ধ মন্দিরগুলোতে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়।[৩] তাই একলাখী সমাধি স্থাপত্য অলংকরণে দেশজ উদাহরণকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল বলা যায়। দেশজ অলংকরণের ব্যবহার সর্বপ্রথম শুরু হয় ছোট পান্ডুয়ার বরী মসজিদে, এরপর আদিনা মসজিদে তবে একলাখী সমাধিতে অলংকরণের উপস্থাপন সার্থকতা লাভ করে। এখানে স্থাপত্য ও অলংকরণের মধ্যে যে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়

১. Muhammad Hafizhllah Khan, *op.cit.*, p..110

২. ডেভিড ম্যাক্কাচিয়ন যাকে ঝুড়ির বুননী নকশা বলেছেন । David McCutchion, 'Hindu Buddhist Continuty' in *Islamic Heritage of Bengal*, ed. by Gorge Michell, Paris, UNESCO, 1984, p.220

৩. Pierre Pichard, *Inventory of the Monuments at Pagan*, in seven vols., Paris, UNESCO,1999.

তা আদিনা মসজিদের খিলান-পটহ অলংকরণে অনুপস্থিত। একলাখী সমাধিতে পোড়ামাটির অলংকরণ সার্বজনীন রূপ লাভ করে। এখানে পাথরের অলংকরণকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে পোড়ামাটির অলংকরণকে পুনর্জীবন দানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। একলাখী সমাধিতে উপস্থাপিত অধিকাংশ অলংকরণ মোটিফ পাথর বা স্টাকো অলংকরণ থেকে নেওয়া, কেননা পোড়ামাটির অলংকরণের এত বিচিত্র মোটিফের ব্যবহার ইতোপূর্বে আর কোন স্থাপত্যে দেখা যায় না। বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের ব্যবহারে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির মাধ্যমে এই শিল্প মাধ্যমে প্রাণ সঞ্চারণের অবদানের কৃতিত্ব তাই মুসলমানদেরই প্রাপ্য।

ঘ. পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসন

পুনঃস্থাপিত পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসন ছিল বাংলার সবচেয়ে দীর্ঘ ও শান্তি পূর্ণ অধ্যায়। ১৪৩৬-১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছরের শাসনামল বাংলার ইতিহাসে অন্যতম সমৃদ্ধশালী যুগ। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সময় হতে বাংলা শাসনে স্থানীয় সহযোগিতা ও সংস্কৃতি গ্রহণের যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে তা এ যুগে চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। বাংলায় বিরাজমান শান্তিপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণ এই সময়কার স্থাপত্যশিল্পে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এ সময় বাংলার স্থাপত্য নির্মাণ ও এর সাথে সংগতি রেখে অলংকরণের ব্যবহারে যে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয় তাতে এ যুগকে বাংলার স্থাপত্যের ধ্রুপদীযুগ বলা যায়। একলাখী সমাধির অনুসরণে এসময় সম্পূর্ণ ইটের তৈরী স্থাপত্য প্রচলিত হয়। স্থাপত্য ক্ষেত্রে কর্ণার টাওয়ার ও কার্নিশের ব্যবহার অব্যহত থাকে।

ইটের স্থাপত্যের সাথে পোড়ামাটির অলংকরণ সংযোগে নির্মিত স্থাপত্য এ যুগে এক নতুন মাত্রা পায়। স্থাপত্য ক্ষেত্রে অন্যান্য অলংকরণ যেমন, গ্লেজড টাইলস ও স্টাকো ইত্যাদির ব্যবহারও এ সময় পরিলক্ষিত হয় তবে তাদের কোনটি পোড়ামাটির অলংকরণের শ্রেষ্ঠত্ব ও নৈপুণ্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসনামলে নির্মিত স্থাপত্যসমূহ অধিকাংশই রাজধানী গৌড় ও তার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এসব স্থাপত্যের অধিকাংশই বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও যতটুকু টিকে আছে তাতে তৎকালে বিকাশিত পোড়ামাটির ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়েছে। অলংকরণগুলো এখানে আরও সুক্ষ্ম ও দৃষ্টিনন্দন। পূর্ববর্তী স্থাপত্যের অলংকরণ বৈচিত্র্যের বদলে এখানে নির্বাচিত কিছু নকশাকে অলংকরণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এতে স্থাপত্য ও অলংকরণের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হতে দেখা যায়। গৌড় ছাড়া খলিফাতাবাদে (বাগের হাট জেলা) ও বারবাজারে (ঝিনাইদহ জেলা)[১] এ সময়ের বেশ কিছু স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানকার মসজিদসমূহও ইটের তৈরী। কিছু কিছু মসজিদ বৃহৎ পরিসরেও নির্মিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ খলিফাতাবাদের ষাট গম্বুজ

১. এ.বি.এম হোসেনের মতে উত্তরে গঙ্গা পূর্বে যমুনা ও পশ্চিমে ভাগীরথী বেষ্টিত প্রাচীন বঙ্গ অঞ্চলটি দুটি প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত ছিল । বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অংশটি খলিফতাবাদ ও খলিফাতাবাদের উত্তরে উপরোল্লিখিত তিন নদীর মধ্যবর্তী অংশটি ছিল বারোবাজার; এ.বি.এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩।

মসজিদ বা বারবাজারের মনোহর দীঘি মসজিদ বা সাতগাছিয়া মসজিদের নাম করা যায়। প্রথমটিতে সাতাত্তরটি গম্বুজ আছে ও পরবর্তী দুটিতে পঁয়ত্রিশটি করে গম্বুজ ছিল। এই সকল মসজিদগুলো গৌড়ের স্থাপত্যসমূহের ন্যায় এতটা অলংকৃত ছিল না। এই সময় দেশের অন্যান্য প্রশাসনিক অঞ্চলেও স্থাপত্য নির্মাণের উদাহরণ পাওয়া যায়। গবেষণার সুবিধার্থে গৌড় ও অন্যান্য অঞ্চলে নির্মিত স্থাপত্যগুলো পৃথক উপ-শিরোনামে আলোচিত হল।

১.গৌড়ের স্থাপত্য সমূহ

দাখিল দরওয়াজা

দাখিল দরওয়াজা গৌড় দূর্গ প্রাসাদে প্রবেশের সর্ব উত্তরের প্রবেশপথ। এটি সেলামী দরওয়াজা নামেও পরিচিত। গৌড়ে নির্মিত স্থাপত্যসমূহের মধ্যে দাখিল দরওয়াজা একটি অন্যতম স্থাপনা। স্থাপনাটি ৩৪.৫০ মিটার দীর্ঘ এবং ২২.৩৫ মিটার প্রশস্ত, মধ্যবর্তী চলাচলের পথ ৪.৫ মিটার চওড়া। মধ্যবর্তী পথের দুইপাশে ২২.৭৫ মি. দীর্ঘ ও ২.৯৩ মিটার প্রশস্ত দুটি প্রহরীকক্ষ রয়েছে। ভেতর থেকে কক্ষটিতে প্রবেশের জন্য রয়েছে চারটি প্রবেশপথ । বাইরে থেকে প্রবেশের জন্য কক্ষদুটির উভয় পার্শ্বে আরও দুটি করে প্রবেশপথ রাখা হয়েছে।

চিত্র: ৪.১৮

দরজার মধ্যবর্তী পথ ও প্রহরী কক্ষ উভয় স্থানের ছাদ নলাকৃতির খিলান সম্বলিত। চলাচল পথের উভয় প্রান্তের প্রবেশ-খিলান দুটি বাইরের দিকে বর্ধিত একটি উচ্চ ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত। মূল প্রবেশ-খিলানটিকে আর একটি উচ্চ ও বৃহৎ খিলানের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। কানিংহামের বর্ণনা অনুযায়ী খিলানটি ১০.৩৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং সমগ্র ইমারতটির উচ্চতা ১৮.২৪ মিটার ।[১] খিলানটির দুইদিকে একটি বর্ধিত দেয়ালে স্থাপন করা

১. Alexander Cunningham, *op.cit.*, p.51

হয়েছে। স্থাপত্যটির চারদিকে চারটি পার্শ্ব-বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো উপর দিকে কিছুটা সরু এবং উল্লম্বভাবে উন্নত ও অবনত অংশের সমন্বয়ে গঠিত। এদের উচ্চতা প্রায় ১৬.১৫ মিটার। স্থাপত্যের নির্মাতা হিসাবে ঐতিহাসিকগণ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম দুজন সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ ও বরবক শাহর এর মধ্যে যে কোন একজনের কীর্তি বলে মনে করেন। এর মধ্যে কানিংহাম ও দানীর মতে এটি প্রথমে উল্লেখিত সুলতানের আমলে তৈরী,[১] অপর দিকে ক্রেইটন ও পার্সি ব্রাউনের মতে এটি দ্বিতীয় সুলতান বরবক শাহর আমলে তৈরী।[২] সমগ্র স্থাপত্যটি উল্লম্বভাবে উন্নত ও অবনত নির্মাণে সজ্জিত। এছাড়া আড়াআড়ি চারটি ব্যান্ড দ্বারা সমগ্র স্থাপনাটিকে কয়েকটি ভাগেভাগ করে অলংকরণগুলোর বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। এই ইমারত অলংকরণের একমাত্র মাধ্যম হলো পোড়ামাটি।

অলংকরণ

দাখিল দরওয়াজার মূল অলংকরণ দেখা যায় এর প্রবেশপথের দুই প্রান্তের দেয়ালে। এদের মধ্যে উত্তর প্রান্তের দেয়ালটি অধিক সংরক্ষিত। এই অংশে প্রবেশ খিলানটির দুই পার্শ্বের দেয়াল কিছুটা বর্ধিত করে আর একটি বৃহৎ খিলান নির্মাণ করা হয়েছে। বৃহৎ খিলানটি প্রবেশ খিলান হতে আরও ৪.৫৭ মিটার উঁচু। দুই সারি স্তম্ভশীর্ষের অলংকরণ যুক্ত পাড় নকশা রয়েছে। প্রতিটি সারির নিচের দিকে রয়েছে এক সারি সংযুক্ত চারপত্রের অলংকরণ। এর উপরে খিলান-পটহের মাঝখানে একটি আয়তকার প্যানেলে অলংকৃত স্তম্ভ যোগে নির্মিত একটি খিলান নকশা। এর খিলানের ভেতরে একটি প্রদীপের ষ্টাইলাইজড অলংকরণ সংযুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে প্রদীপটি ঝুলন্ত নয় বরং সমস্ত খিলান জুড়ে সৃষ্ট একটি বিমূর্ত নকশা। প্যানেলের উপরে অর্ধ-পাপড়ির পাড় নকশা ও নীচে টারসেল ও পেনডেন্টের ধারাবাহিক উপস্থাপনে সৃষ্ট পাড় নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যবতী এই আয়তকার প্যানেলের দুই পাশে রয়েছে দুটি চক্রবদ্ধ পদ্ম। চক্রটির চারদিকে দশটি ত্রিকোণ বসিয়ে এদের একটি তারার রূপ দেয়া হয়েছে। এই সমস্ত নকশার নীচে প্রবেশ-খিলানের দুই পাশের খিলান স্প্যানড্রীলে আরও দুটি চক্রবদ্ধ নকশা রয়েছে। চক্রটির মাঝখানে এক সারি পদ্মপত্র, এরপর একসারি কলকা নকশা। এরপর একসারি পদ্মপত্র ও সর্বশেষে একসারি পুঁতি নকশা দিয়ে চক্রটি শেষ হয়েছে। প্রবেশ খিলানের শীর্ষে একটি শীর্ষ অলংকরণও রয়েছে। বৃহৎ খিলানটি একটি বহিস্ত বর্ডার দিয়ে আবদ্ধ। বর্ডারটি বৃহৎ খিলানের উত্থানের স্থানে দুই প্রান্তে দুটি ফ্রেমবদ্ধ খিলান নকশা দ্বারা দুটি অংশে বিভক্ত। নীচের অংশে রয়েছে দুটি উল্লম্ব প্যানেল ও উপরের অংশেও দুটি উল্লম্ব প্যানেল। সবগুলো প্যানেলে খিলান অলংকরণের ভেতরে উপস্থাপিত হয়েছে ঝুলন্ত পেনডেন্ট। বৃহৎ খিলানের

১. *Ibid*; Dani, *op.cit*., 99

২. Percy Brown, *op.cit*., p.40; H. Creighton, *Ruins of Gour*, London, Black, Paibury and Allan, 1717 , pl. II

দুইপাশে ও ফ্রেমের অভ্যন্তরে আরও দুটি চক্রবদ্ধ পদ্ম রয়েছে। এই পদ্ম চক্রটির চারদিকে একসারির কলকা উৎকীর্ণ করা রয়েছে। ফ্রেমের দুই পাশের দেয়ালাংশের নীচের দিকে পাঁচটি মোল্ডিং, এর ভেতরে একসারি করে পাড় নকশা ছিল। বর্তমানে শুধু চারপত্র সংযুক্ত নকশা ছাড়া অন্য সকল নকশা বিলুপ্ত হয়েছে। এর উপরের সমগ্র দেয়াল অংশকে চারটি মোল্ডিং দ্বারা চারভাগে ভাগ করে প্রতিটি অংশকে তিনটি পাশাপাশি উপস্থাপিত প্যানেলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি প্যানেলে একটি খাঁজ-খিলানের শীর্ষ হতে ঝুলন্ত লকেট নকশা রয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী স্থাপত্য বরী মসজিদ, আদিনা মসজিদ বা একলাখী সমাধির মত এখানকার ঝুলন্ত মোটিফটি প্রদীপদানে না হয়ে বরং একটি বিমূর্ত নকশায় রূপান্তরিত হয়েছে। খিলান নকশার প্যানেলগুলোর নিম্নভাগের প্রতিটি মোল্ডিং এর উপরে একসারি মারলন নকশা ও নীচে একসারির চারপত্র বিশিষ্ট ফুলের জালি নকশা উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

চিত্র: ৪.১৯

চিত্র: ৪.২০

প্রবেশপথের বির্ধিত দেয়াল ও পাশ্ববরুজের মধ্যবর্তী বাকি অংশের দেয়াল উন্নত ও অবনত ক্ষেত্রে উল্লম্বভাবে বিভক্ত। এদের উন্নত অংশে মোল্ডিং ও এর উপর-নীচে মারলন ও ফুল নকশার জালি ছাড়া বাকী অংশ অলংকার বিহীন। কিন্তু অবনত অংশে খাঁজ-খিলান হতে ঝুলন্ত পেনডেন্ট নকশা রয়েছে। অবনত দেয়ালের নিম্নাংশে যথারীতি চারটি করে মোল্ডিং রয়েছে। মোল্ডিংসমূহের মধ্যবর্তী অংশে ফুলকারী জালি নকশা দেখা যায়। মোল্ডিং এর সর্বনিম্ন প্যানেলে সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপে সম্ভবত ক্ষুদ্র খিলানে ফুটন্ত পদ্ম ফুলের প্রফাইল মোটিফ অথবা কোন ফুল বা লতা নকশায় সজ্জিত ছিল। পার্শ্ববুরুজগুলো গোলকৃতির তবে এদের গায়ের উল্লম্ব উন্নত ও অবনত অংশের কারণে বুরুজগুলো গোলাকার এর পরিবর্তে বহুপার্শ্বযুক্ত বলে মনে হয়। পার্শ্ব দেয়ালের মত বরুজগুলোতেও নিম্নাংশে কাছাকাছি স্থাপিত চারটি মোল্ডিং রয়েছে। এর উপরে নির্ধারিত দূরত্বে স্থাপিত আরও চারটি মোল্ডিং দিয়ে সমগ্র বুরুজটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত। এখানেও মোল্ডিংগুলোর উপরে নীচে মারলন ও ফুলকারীর জালি নকশা

রয়েছে। এখানকার উন্নত দেয়ালাংশও নকশা বিহীন ও অবনত অংশে খাঁজ-খিলান হতে ঝুলন্ত পেনডেন্ট নকশা রয়েছে।

সমগ্র স্থাপনাটির দুই পার্শ্বের দেয়াল অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে উন্নত ও অবনত দেয়াল নকশার ধারাবাহিক উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়। এখানে খিলান উত্থানের বিন্দু হতে ও খিলান ফ্রেমের উপরোস্থ ফ্রেমে দুইটি মোল্ডিং এর উপর নীচে মারলন ও ফুলকারীর জালি নকশার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। অবতল দেয়ালাংশে যথারীতি খাঁজ-খিলান ও ঝুলন্ত পেনডেন্ট নকশা উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নাংশের চারটি মোল্ডিংও এখানে দৃশ্যমান দাখিল দরওয়াজার উত্তর প্রান্তীয় দেয়াল অপেক্ষা দক্ষিণ প্রান্তীয় দেয়ালে সামান্য ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ এই প্রান্তের প্রবেশ খিলানের দুই পাশ্বের দেয়াল উত্তর পার্শ্বে দেয়াল অপেক্ষা কম বর্ধিত। দ্বিতীয়তঃ এর বৃহৎ খিলান ফ্রেমের পার্শ্বস্থ দেয়ালের প্যানেলে খাঁজ-খিলান ও ঝুলন্ত পেনডেন্ট এর পরিবর্তে চারপত্র বিশিষ্ট একটি করে ফুল উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রবেশপথটির ভেতরে প্রহরী কক্ষে পাওয়ার যে চারটি খিলানপথ রয়েছে এর উপারংশেও একসারি পোড়ামাটির পাড় অলংকরণ দেখা যায়। পাড়গুলো কখনো পাঁচপত্র ও টারসেলের ঝুলন্ত নকশা, কখনো লকেটযুক্ত মালা নকশা আবার কখনো বিভিন্ন মোটিফের সমন্বয়ে ঝুলন্ত নকশায় সৃষ্টি।

সাধারণ আলোচনা

একলাখী সমাধি নির্মাণের পরবর্তী অর্ধশতকের মধ্যে নির্মিত দাখিল দরওয়াজার স্থাপত্য ও অলংকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। একলাখী সমাধিতে বিকশিত স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য যেমন-পার্শ্ব বুরুজ, স্থাপত্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুতে মোল্ডিং এর ব্যবহার, উল্লম্ব, অবনত ও উন্নত দেয়ালাংশের ধারাবাহিকতা ইত্যাদি আদর্শ নকশার ন্যায় দাখিল দরওয়াজায় উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। এখানকার পার্শ্ববুরুজগুলো ক্রমসরু এবং আকারে ভারী। স্থাপত্য নির্মাণে তুঘলক স্থাপত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে স্থাপত্যেগুলোতে মোল্ডিং ও অবনত ও উন্নত অংশ সৃষ্টি করে একে স্থানীয় রূপ প্রদান করা হয়েছে। দাখিল দরওয়াজার রাজকীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপকে একদিকে 'ক্লাসিক' (classic) অন্যদিক এর পাশ্ববুরুজের অবস্থান ও ঢালকে পার্সি ব্রাউন 'রোমান্টিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] পোড়ামাটির অলংকরণেরও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি এই স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায়। মোটিফগুলো এখানে একলাখী বা আদিনার মত বৈচিত্র্যপূর্ণ না হয়ে বরং সীমিত। মোটিফগুলো উপস্থাপনেও কিছুটা বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। পদ্মচক্রগুলোর সাথে ত্রিকোণ বা কলকাযুক্ত হয়ে একে আরও বৃহৎ ও আকর্ষনীয় করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া খিলানের মাঝখানের ঝুলন্ত পেনডেন্টগুলো এখানে ঠিক প্রদীপদান না হয়ে ত্রিশূলাকার ধারণ

১. Percy Brown, *op.cit.*, p. 39

করেছে। অলংকরণগুলোর উপস্থাপন এখানে অনেক পরিস্কার ও ঝকঝকে। সর্বোপরি একে তুঘলক স্থাপত্যের সাথে বাংলার স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের স্বতস্ফুর্ত সংমিশ্রণের অপূর্ব ফলাফল বলা যায়।

দরাসবাড়ী মসজিদ

দরাসবাড়ী মসজিদটি বর্তমানে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ফিরোজপুরে অবস্থিত। এটি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত কোতওয়ালী দরওজার থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে। মসজিদের ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি বরবাক শাহর পুত্র সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ্ কর্তৃক ১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত।[১]

চিত্র: ৪.২১

মসজিদটি একটি বারান্দা সম্বলিত আয়তকার ইমারত। এর মূল নামাজকক্ষটি ৩০.৩৫ মিটার দীর্ঘ ও ১১.৯২ মিটার প্রস্থ। অপর দিকে বারান্দাটি ৩.২০ মিটার চওড়া। নামাজকক্ষটি ৫.৩৫ মিটার চওড়া একটি নেভ দিয়ে দুটি অংশে বিভক্ত। নেভের দুইপাশের অংশগুলি চারটি স্তম্ভ দ্বারা তিনটি 'বে' ও তিনটি আইলে বিভক্ত। পূর্ব দিকের

১. Abdul Karim, *op.cit.*, pp.186-88

সাতটি খিলানপথ দিয়ে নামাজকক্ষে প্রবেশ করা যায়। এদের মধ্যে মাঝখানের প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত চওড়া। নামজকক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বের তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। উত্তর দিকের প্রবেশপথের সংখ্যা দুটি। কক্ষের অভ্যন্তরে উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে চারটি 'বে' জুড়ে সম্ভবত একটি তখ্ত নির্মিত হয়েছিল, যা অভিজাতদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। তখ্তটি সম্ভবত নীচু খিলানের উপর নির্মিত হয়েছিল। তখ্ত এ পৌছাবার জন্য মসজিদের বাইরে, উত্তর পার্শ্বে সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিল যার দেয়ালটি শুধুমাত্র বর্তমানে টিকে আছে। মসজিদের কিবলা দেয়ালের বামদিকের অংশে তিনটি, নেভ অংশে তিনটি ও ডানদিকের অংশে নীচে তিনটি ও তখ্ত বরাবর উপরে দুটি মোট এগারটি মিহরাব রয়েছে। নেভের তিনটি মিহরাবের মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবের ডানদিকের মিহরাবের উপরে আর একটি ক্ষুদ্র মিহরাব রয়েছে যা সম্ভবত মসজিদের মিম্বারের মিহরাব হিসাবে ব্যবহৃত হত। পূর্ববর্তী মসজিদগুলোর মিম্বার ছিল পাথরের তৈরী এবং এদের কোনোটি কিবলা দেয়ালের সাথে সংযুক্ত ছিল না। দরসবাড়ী মসজিদে সর্বপ্রথম ইটের মিহবার দেখা যায় যা মসজিদ স্থাপত্যের নির্মাণের সাথে সংযুক্তভাবে নির্মিত।[১] মসজিদের নেভের দুই পার্শ্বের অংশ অংশ ও বারান্দা এক সময় অর্ধ-গোলাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। মাঝখানের নেভ অংশের আচ্ছাদন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এদের মধ্যে এ.এইচ. দানীর মতে, মসজিদের এই অংশটি ষাট গম্বুজ মসজিদের মত তিনটি চৌচালা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল ।[২] শিল্প ঐতিহাসিক ক্যাথেরিন এ্যাসার তাঁর মতকে সমর্থন করেন। অপরদিকে আবিদ আলী খান এর মতে এটি পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ও গৌড়ের গুনমন্ত মসজিদের ন্যায় টানেল-ভল্ট (নলাকৃতির খিলান) দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।[৩] শেষক্ত মতটি অধিক গ্রহনযোগ্য বলে মনে হয়।[৪]

অলংকরণ

মসজিদটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ। বর্তমানে এর সম্মুখের বারান্দা অংশের ছাদ ও দেয়াল, মসজিদের সবকটি পার্শ্ববুরুজ গম্বুজ ও ভল্ট ধসে পড়েছে বিধায় মসজিদের অলংকরণের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। মসজিদের বাইরের দিকের দক্ষিণ ও পশ্চিম দেয়ালে সবচেয়ে বেশী অলংকরণ চোখে পড়ে। অলংকরণের একমাত্র মাধ্যম পোড়ামাটি। মসজিদের বাইরের দেয়াল জুড়ে উল্লম্বভাবে উন্নত ও অবনত অংশের সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি উদ্গাত মোল্ডিং সমগ্র মসজিদটিকে আড়াআড়িভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। আর এই মল্ডিং এর উপরে ও নীচে ত্রিকোনাকার নকশা সম্বলিত দুইটি সারি সমগ্র মসজিদটিকে ঘিরে রেখেছে। প্রতিটি ত্রিকোনের মধ্যে উৎকীর্ণ রয়েছে একটি করে

১. Abu Sayeed, *op.cit.*,p. 108

২. A.H. Dani, *op.cit.*, p.110

৩. Abid Ali Khan, *op.cit.*, p.77

৪. Abu Sayeed, *op.cit.*,p. 109

পুষ্পিত গুল্ম। বরফি নকশা সম্বলিত দুটি সরু পাড় ত্রিকোণ নকশার ও উদ্গাত মল্ডিং এর মাঝে স্থাপন করে অলংকারটিকে আরও দৃষ্টি নন্দন করা হয়েছে।

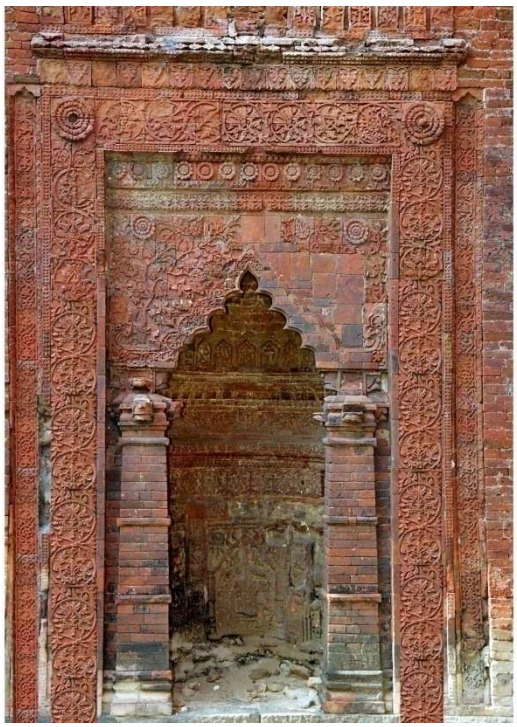

চিত্র: ৪.২২

মসজিদের মূল অলংকরণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে এর উন্নত ও অবনত অংশে। উন্নত অংশগুলোর উপরের দিকে বসানো হয়েছে একটি করে উদ্গাত প্যানেল। মুসলিম আমলে নির্মিত পূর্ববর্তী সকল ইমারতে এই বিশিষ্ট অলংকরণটি স্থাপত্য অলংকরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। অলংকৃত বর্ডারযুক্ত এই প্যানেলের মধ্যে রয়েছে একটি খিলান নকশা যার শীর্ষ হতে ঝুলছে একটি প্রদীপদান। তবে এখানে শিকল নয় বরং প্রদীপদান ঝোলাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে পত্রযুক্ত লতা। প্যানেলের নীচের অংশে দুটি মোল্ডিং ও একটি পাড় বসিয়ে অলংকরণটির সীমা নির্দেশিত হয়েছে। পাড় নকশায় ঝুলন্ত লতা ও গুল্ম উপস্থাপিত হয়েছে প্যানেলের উপরের অংশে একটি মোল্ডিং ও তার উপরে রয়েছে একসারি অলংকৃত মারলন নকশা। এই প্যানেল অলংকরণটির সবচেয়ে আকর্ষনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রতিটি প্যানেলের শীর্ষের কেন্দ্রে রয়েছে একটি করে কলসের মধ্যে পতাকা সম্বলিত নকশা যা ইতিপূর্বে কোথাও দেখা যায়নি। উন্নত দেয়ালের নীচের অংশে রয়েছে কিছটা প্রথিতভাবে সৃষ্ট দুটি উল্লম্ব প্যানেল। প্রতিটি প্যানেলে খিলান নকশার শীর্ষ হতে ঝুলছে একটি করে পেনডেন্ট। এই ধরণের ত্রিশূল সদৃশ্য পেনডেন্ট প্রথম দাখিল দরজার উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। এখানেও শিকলের পরিবর্তে ফুল ও পত্রযুক্ত লতার ব্যবহার দেখা যায়। প্যানেলের খাঁজ খিলানের উপরেও ফুল ও লতা সম্বলিত অলংকরণ

রয়েছে। বহির্দেয়ালের অবনত অংশের নিম্নভাগে রয়েছে তিনটি মোল্ডিং। তৃতীয় মোল্ডিং এর উচ্চতা পর্যন্ত নিম্নাংশে উল্লম্ব তিনটি প্রজেকশন বা উন্নত অংশ রয়েছে। এর উপরে একটি প্যানেলে অলংকৃত খিলানের মধ্যে রয়েছে একটি ঝুলন্ত তিন শীর্ষযুক্ত পেনডেন্ট। অবনত অংশের উপরিভাগ উল্লম্বভাবে দুটি প্যানেলে বিভক্ত এখানে ঐ একই ধরনের খিলান ও ঝুলন্ত পেনডেন্ট নকশা রয়েছে।

মসজিদের কার্নিশের নিচে তিনটি মোল্ডিং রয়েছে। মোল্ডিংগুলো লজেন্স বা বরফি নকশার ধারাবাহিক অলংকরণে সজ্জিত। সবচেয়ে নীচের মোল্ডিংটির নিম্নাংশে একসারি চারপত্র বিশিষ্ট ফুল নকশার পাড় উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এর উপরের মোল্ডিংগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দুই সারি ক্ষুদ্র খিলান নকশার পাড় রয়েছে। এই ধরনের ফ্রিজ অলংকরণ ইতোপূর্বে একলাখি সমাধিতে দেখা যায়। দরসবাড়ী মসজিদের ফ্রিজে নির্মিত ক্ষুদ্র খিলান পাড়গুলো বর্তমানে শূন্য অর্থাৎ খিলান পাড়ের খিলানগুলোতে বর্তমানে কোন নকশা দেখা যায় না। তবে একলাখীর উদাহরণ থেকে ধারনা করা যায় যে, একসময় এই ক্ষুদ্র খিলানগুলো ফুল অথবা লতা নকশায় পূর্ণ ছিল।

মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দিকে কিবলা দেয়ালটি সবচাইতে অলংকৃত। প্রায় সমস্ত নকশাই মিহরাব কেন্দ্রীক। পশ্চিম দেয়ালে নিচে নয়টি মিহরাব ও উপরে (মিম্বার ও তখ্‌তে) তিনটি সহ মোট বারটি মিহরাব রয়েছে। নেভের বাম ও ডানের অংশের নিচের তিনটি মিহরাবই সমান। মিহরাবের খিলান-স্তম্ভগুলো চতুস্কোনাকার ও নির্ধারিত দূরত্বে উদ্গাত ব্যান্ড যুক্ত। মিহরাব খিলান নির্মাণে এই ধরণের স্তম্ভের ব্যবহার ইতোপূর্বে আর কোন স্থাপত্যে দেখা যায় না। খিলানগুলো এখানে খিলান পদ্ধতির পরিবর্তে ক্রমপূরণ (corbelling) পদ্ধতিতে নির্মিত। বহুখাঁজ খিলানগুলোর প্রান্ত রেখা ধরে রয়েছে অলংকৃত প্যাঁচানো লতা নকশা। প্রতিটি খাঁজ হতে একটি করে অলংকৃত পত্র খিলানের উর্দ্ধমুখে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। খিলানের দুইপাশের স্প্যানড্রিলে উৎকীর্ণ করা হয়েছে অলংকৃত পত্র সম্বলিত বৃক্ষ । খিলান শীর্ষের দুই পাশে স্থাপিত হয়েছে চক্রাকার রোজেট। এরপরে রয়েছে ছয়টি স্তম্ভশীর্ষ সদৃশ্য উন্নত অংশ । সমগ্র খিলান ঘিরে উৎকীর্ণ হয়েছে দুটি পাড় নকশা। প্রথম পাড়টি ঝুলন্ত লতা নকশাযুক্ত ও উপরেরটি প্যাঁচানো লতায় স্থাপিত রোজেট সম্বলিত পাড়। সমগ্র খিলানটি একটি চওড়া ফুল ও লতার প্যাঁচানো পাড় দ্বারা আবদ্ধ। এই চওড়া পাড়ের উপরের দুই কোনায় ও কেন্দ্রে রয়েছে তিনটি রোজেট। এই পাড়ের দুই পাশে লজেন্স বা বরফি পাড়ের দুটি সারি রয়েছে। চওড়া পাড়টি আবার আর এটি অপেক্ষাকৃত সরু পাড় দ্বারা আবদ্ধ। এই পাড়টিও চওড়া পাড়ের মত প্যাঁচানো ফুল ও লতার নকশায় অলংকৃত।

প্রতিটি মিহরাবকে আর একটি বৃহৎ খিলানের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। এই বৃহৎ খিলানগুলো আবদ্ধ ও এদের খিলান-পটহসমূহ পোড়ামাটির অলংকরণে পূর্ণ। কেন্দ্রীয় মিহরাবের খিলান-পটহ এর দুই পার্শ্বস্থ খিলানগুলো থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু ও বড় করে নির্মিত এর খিলান-পটহর উর্ধ্বাংশ জুড়ে প্রস্ফুটিত পদ্মের পার্শ্বচিত্র

উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নাংশ বিমূর্ত ও তরঙ্গায়িত লতা নকশায় পূর্ণ। দুটি মিহরাবের উপরোস্থ খিলান-পটহ খোপ নকশার মধ্যে চক্রাকার পদ্ম নকশায় অলংকৃত। দুটি অলংকরণই ইতোপূর্বে আদিনা মসজিদের কিবলা দেয়ালের খিলান-পটহ অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। খিলান-পটহের নিচে ও মিহরাব ফ্রেমের ঠিক উপরে একসারি অলংকৃত মারলন নকশার পাড় বসিয়ে মিহরাব ফ্রেমকে খিলান-পটহ হতে আলাদা করা হয়েছে।

মিহরাবগুলো অবতলাকৃতির। এদের অবতল অংশগুলোর পোড়ামাটির নকশা দ্বারা আচ্ছাদিত। মিহরাবের নিম্নাংশে একটি বৃহৎ প্যানেলে খিলান নকশার মধ্যে ঝুলন্ত পেনডেন্ট অলংকরণ দেখা যায় পেনডেন্ট ঝোলাবার দড়িটি এখানে মসজিদের অন্যান্য প্যানেলের মত পত্র ও ফুল যুক্ত লতায় পরিণত করা হয়েছে। অবতল অংশের অন্যান্য প্যানেলগুলো জালি নকশা, বিভিন্ন লতা, পত্র ও ফুল নকশায় অলংকৃত।

সাধারণ আলোচনা

বাংলার মসজিদ স্থাপত্য পরিকল্পনা ও অলংকরণের ধারাবাহিকতায় দরাসবাড়ি মসজিদটির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দরসবাড়ি মসজিদ পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম নামজগৃহের সম্মুখে বারান্দার নির্মাণের বৈশিষ্ট্যটি সংযুক্ত হয়। এই মসজিদের নামাজঘরের পরিকল্পনা আদিনা মসজিদের নামজঘরের পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত তবে পোড়ামাটির অলংকরণ এখানে আরও মার্জিত ও পরিপক্ব। আদিনা মসজিদ বা একলাখী সমাধি অলংকরণে ব্যবহৃত পোড়ামাটির নকশাগুলোতে যে গভীরতা লক্ষ্য করা যায় এখানে তা সামান্য। ইতোপূর্বে আদিনা ও একলাখীতে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মীয় কিছু প্রতীক ও প্রভাব অলংকরণকে প্রভাবিত করেছিল। দরসবাড়ি মসজিদ স্থানীয় প্রভাব মুক্ত না হলেও পূর্বোল্লেখিত ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার হতে বিরত ছিল। এখানে প্যানেল নকশায় শীর্ষে ব্যবহৃত পতাকার নকশাটি যেন মুসলমাদের বিজয়ের প্রতীকরূপেই অঙ্কিত হয়েছে।

তাঁতী পাড়া মসজিদ

তাঁতী পাড়া মসজিদটি বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার অবস্থিত। এটি গৌড় দূর্গ নগরীর বেষ্টনী দেয়ালের মধ্যে লট্টন ও চামকাট্টি মসজিদের মাঝামাঝি স্থানে নির্মিত । বর্তমানে কদম রসুলে সংরক্ষিত একটি শিলালিপি থেকে ধারণা করা হয় যে, মসজিদটি শামস-উদ্-দীন ইউসুফ শাহ্‌র শাসনামলে মিরশাদ খান আতা বেগ নামে একজন উচ্চপদস্থ অমাত্য কর্তৃক ৮৮৫ হিজরী বা ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়।[১] স্থানীয় ভাবে মসজিদটি উমর কাজীর মসজিদ নামে পরিচিত।[২] তবে তাঁতী পাড়ায় অবস্থিত হওয়ায় মসজিদটি তাঁতীপাড়া মসজিদ নামে অধিক খ্যাত।

১. Alexander Cunnigham, *op.cit.*, p.60; A.H. Dani, *op.cit.*, p.106
২. Abid Ali Khan , *op.cit.*, p72

চিত্র: ৪.২৩

মসজিদটি ২৭.৭২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১৩.৩৮ মিটার প্রস্থের একটি আয়তাকার ইমারত। মসজিদের অভ্যন্তর চারটি পাথরের স্তম্ভ দ্বারা দুটি বে ও পাঁচ আইলে বিভক্ত। এর পূর্ব দেয়ালে মসজিদে প্রবেশের জন্য পাঁচটি খিলানপথ রয়েছে। এছাড়া মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি করে চারটি আর মসজিদের চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকার সংযুক্ত পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। এর কিবলা দেয়ালে দক্ষিণ দিক থেকে প্রবেশপথ বরাবর তিনটি মিহরাব রয়েছে। মসজিদ অভ্যন্তরে উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে আগে একটি তখ্ত বা মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। এই অংশে সর্ব উত্তর এর আইল বরাবর কিবলা দেয়ালের মিহরাবটি ক্ষুদ্র ও বেশ উঁচুতে অবস্থিত। মসজিদের দক্ষিণ প্রান্ত হতে চতুর্থ আইলের কিবলা দেয়ালে কোন মিহরাব নির্মিত হয়নি। মসজিদটি দশটি অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। যার কোনটিই বর্তমানে টিকে নেই। ১৮৮৫ সালে ভূমিকম্পে গম্বুজগুলো ভেঙ্গে পরে।[১]

অলংকরণ

মসজিদের বহির্দেয়াল পূর্ববর্তী ইমারতগুলির ন্যায় উন্নত ও অবনত অংশে বিভক্ত। এর উন্নত অংশে অলংকরণ ও অবনত অংশে প্রবেশ-খিলান নির্মাণ করা হয়েছে। এত দিনে গড়ে ওঠা স্থাপত্য-রীতিতে মসজিদের মাঝ দেয়াল বরাবর একটি আড়াআড়ি ব্যান্ড এর দেয়ালকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। একটি উদ্গাত মোল্ডিং ও এর উপরে ও নিচে দুই সারি খিলান নকশাযুক্ত পাড়ের সমন্বয়ে ব্যান্ডটি সৃষ্টি। দেয়ালের উন্নত অংশে আড়াআড়ি ব্যান্ডিটির উপরে ও নিচে উভয় স্থানে উদ্গাত প্যানেলে রয়েছে। প্যানেলগুলো লতা ও গোলাপ নকশার পাড় দ্বারা আবদ্ধ। ফ্রেমটির ঠিক উপরে রয়েছে একসারি ঝুলন্ত ফুল ও লতার আলংকারিক বিন্যাস। এর উপরে একটি উদ্গাত ব্যান্ড এবং সবচাইতে উপরে উৎকীর্ণ হয়েছে পাঁচপত্রের নকশা বিশিষ্ট একটি পাড়। প্যানেলের নিচের অংশে দুটি উদ্গাত ব্যান্ড

১. Abid Ali,*op.cit.*, p.72

ও এর নীচে একসারি ঝুলন্ত নকশা রয়েছে। প্যানেলটির মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত একটি খিলান নকশা। খিলানটি পাঁচ-খাঁজ বিশিষ্ট। খিলানের সূঁচালো শীর্ষ হতে ঝুলছে একটি তিন শীর্ষ বিশিষ্ট ফুল ও লতার মিশ্রণে একটি বিমূর্ত অলংকরণ। খিলান প্যানড্রিলে উর্ধ্বমুখী লতার সাথে গোলাপ ফুলের নকশা দ্বারা শোভিত। খিলান-গর্ভটিও এখানে দেশীয় ফলদার বৃক্ষ যেমন-কামরাঙ্গা, ডালিম ইত্যাদি ফল শোভিত বৃক্ষ বা গোলাপ লতা দ্বারা পূর্ণ। মসজিদের বহির্গাত্রের প্যানেলে এমন জমকালো উপস্থাপন এখানে প্রথম লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের প্রতিটি প্রবেশ খিলান একটি উদ্গাত ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। প্রবেশ খিলানগুলি দেয়ালের প্রতিটি অবনত অংশে নির্মিত। খিলান-ফ্রেমের উপরাংশে কার্নিশের সমান্তরালে তিনটি করে রোজেট স্থাপন করা হয়েছে। রোজেটগুলো চারদিকে সূর্যকিরণের ন্যায় ছড়ানো লতার বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রবেশ খিলানগুলো দ্বিকেন্দ্রীক। খিলানের প্রান্তরেখা ধরে রয়েছে তিনটি সারি। প্রথম সারিতে নির্ধারিত দূরত্বে স্থাপন করা হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোজেট। দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে লতানো নকশার সাথে গোলাপ ফুলের বিন্যাস এবং তৃতীয় সারিতে এক সারি উর্ধ্বমুখী পদ্মকলি (বা ভুট্টা) র নকশা রয়েছে যেগুলো নিম্নভাগে একটি লতা দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। খিলানের শীর্ষদন্ডে রয়েছে একটি অমলক, এর উপর একটি পদ্মকলি ও সর্বশেষে একটি বাঁকা চাঁদ ও এর উপরস্থ একটি পদ্মকলি দ্বারা নকশাটি শেষ হয়েছে। খিলানের স্প্যানড্রিলের নিম্নভাগে খিলান ফ্রেমের ধার ঘেঁষে একটি সরু বর্ডার যুক্ত বিমূর্ত নকশা দেখা যায়। এই নকশাটির অভ্যন্তর লতা নকশা দ্বারা পূর্ণ। খিলান স্প্যানড্রিলের নিম্নাংশ থেকে শুরু করে মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত খিলান ফ্রেম সংলগ্ন এই ধরণের নকশা প্রথম বরী মসজিদের মিহরাবের খিলান স্প্যানড্রিলে প্রথম দেখা যায়। তবে তাতে এমন নকশা দ্বারা পূর্ণ ছিল না। স্প্যানড্রিলের অন্যান্য অংশ একটি লতানো কান্ড হতে নির্গত শাখায় ফুল, কলি ও পত্র নকশায় পূর্ণ। খিলানের উভয় দিকে তিনটি করে প্যাঁচ রয়েছে। এর প্রথম বাঁকে অর্থাৎ খিলানের দুই পাশের কোণে স্থাপিত হয়েছে পুঁতি দ্বারা আবদ্ধ দুটি রোজেট। এই সকল নকশার উপরে রয়েছে একসারি উর্ধ্বমুখী পদ্মকলির একটি সারি যার প্রতিটি কলি স্প্যানড্রিলের লতানো কান্ডটির সাথে সংযুক্ত। খিলান ফ্রেমের উর্ধ্বাংশ ও স্প্যানড্রিলে উৎকীর্ণ সকল নকশার মধ্যবর্তী অংশে একসারি উদ্গাত স্তম্ভশীর্ষ এখানে উন্নত ও অবনত অংশের সৃষ্টি করেছে। উভয় ক্ষেত্রই ঝুলন্ত কর্ণকুন্তলের ন্যায় জোড়া নকশায় শোভিত। স্তম্ভশীর্ষের নকশাটিও প্রথম বরী মসজিদের দেখা যায় কিন্তু সেখানে অলংকরণটি সাদামাটা ভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। মসজিদের কার্নিশের নীচের ফ্রিজটি তিনটি মোল্ডিং দ্বারা বিভক্ত। প্রতিটি মোল্ডিং এর নীচে রয়েছে একটি নকশা সারি। প্রথম মোল্ডিং এর নীচে একটি লতানো নকশার পাড়, দ্বিতীয় মোল্ডিং এর নীচে একসারি চারপত্র ফুলের জালি নকশা ও সর্বশেষ মোল্ডিং এর নীচে রয়েছে একসারি ঝুলন্ত ফুল ও লতার অলংকারিক উপস্থাপন। ফ্রিজ নকশাটি সমগ্র মসজিদের চারদিকে বেষ্টন করে উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

মসজিদের পার্শ্বস্তম্ভ চারটি অষ্টভূজাকৃতির। স্তম্ভগুলোতেও উন্নত ও অবনত প্রজেকশন দেখা যায়। স্তম্ভগুলো নির্ধারিত দূরত্বে উদ্গাত ব্যান্ড নকশা দ্বারা শোভিত। প্রতিটি ব্যান্ডের উপর ও নিচ উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র খিলান সারির মধ্যে পত্র নকশা উৎকীর্ণ হয়েছে।

চিত্র: ৪.২৪

মসজিদের অভ্যন্তরে কিবলা দেয়ালে দক্ষিণ হতে তিনটি বৃহৎ মিহরাব রয়েছে। মিহরাবগুলো একটি বৃহৎ ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত। এই ফ্রেমের দুইপার্শ্বে খিলানের উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত দুটি অবনত দেয়ালাংশ রয়েছে। স্বল্প অবনত অংশ দুটিকে উল্লম্বভাবে দুটি প্যানেলে বিভক্ত করে প্রতিটিতে খিলান ও এর শীর্ষ হতে ঝুলন্ত পেনডেন্ট নকশা সৃষ্টি করা হয়েছে। মিহারাব খিলানের স্প্যানড্রিল ও এর দুপাশের ফ্রেম বর্তমান অলংকার শূণ্য। শুধুমাত্র ফ্রেমের উর্ধ্বংর্শের অলংকরণ টিকে আছে। তবে এর উর্ধ্বাংশের অলংকরণ দেখেই বোঝা যায় যে, পূর্বে সমগ্র মিহরাবটি কি পরিমাণ অলংকরণে সজ্জিত ছিল। মিহরাব খিলানটি দুটি ফ্রেমে আবদ্ধ। ফ্রেমগুলোর ভেতরে খিলানের উপরের অংশে মসজিদের ঠিক প্রবেশপথের ন্যায় উদ্গাত স্তম্ভশীর্ষ নকশায় সজ্জিত।

চিত্র: ৪.২৫

মিহরাবের প্রথম ফ্রেমটির শুধু লিনটেল বা সর্দল অংশে কেন্দ্র ও দুই কোণে মোট তিনটি বর্গাকার ক্ষেত্রে রোজেট নকশা রয়েছে। রোজেটগুলোর মধ্যবর্তী অংশ ধনুকের ন্যায় ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এর কোণগুলোতে গোলাপ ও লতার নকশা যুক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে ধনুকের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় তিনসারি ঝুলন্ত ও লতানো পাড় নকশা সংযুক্ত করা হয়েছে। খিলানের বাইরের ফ্রেমে উপরে কোনায় দুটি রোজেট রেখে বাকি অংশে একটি তরঙ্গায়িত কান্ডের দুই পার্শ্বে পাতা, ফুল ও কলির লতানো নকশা উপস্থাপিত হয়েছে। ফ্রেমের উপরে ঝুলন্ত ফুল ও পাতার অলংকৃত পাড় রয়েছে। এর উপর রয়েছে একটি উদ্গাত ব্যান্ড। ব্যান্ডের উপর দুই সারি পাঁচপত্র বিশিষ্ট সূঁচালো নকশার পাড় সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পাড়ে নির্ধারিত দূরত্বে রয়েছে তিনটি অমলক ও কলি সম্বলিত শীর্ষদন্ড।

মসজিদের গম্বুজের ভিত্তিগুলোতেও ঝুলন্ত নকশার সারি উদ্গাত ব্যান্ড ও এর উপরে পাঁচপত্র পাড় নকশা দেখা যায়।

সাধারণ আলোচনা

তাঁতীপাড়া মসজিদটিকে কানিংহাম গৌড়ের টিকে থাকা মসজিদগুলোর মধ্যে সুন্দরতম বলে বর্ণনা করেছেন।[১] তবে জন মার্শাল মনে করেন-

"In the matter of superficial ornament, indeed, the Tantipara masjid marks the zenith of the Bengal school. In other respect, however, it shows signs of incipient decadence."[২]

তিনি এই মসজিদের সাজ-সজ্জাকেও মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে করেন। তবে হাফিজুল্লাহ খান বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে-

"The Bengal artists have their own concept of beauty like any other people, and no outsider is a fair judge in this respect. The ornamentation of Tantipara mosque, therefore, must be judged in the cultural context of Bengal"[৩]

তাঁতীপাড়া মসজিদের উজ্জ্বল লাল ইটের দেয়াল, সমতল দেয়ালে উদ্গাত নকশা নিঃসন্দেহে স্থাপত্যের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। পোড়ামাটির অলংকরণ এখানে আরও সুক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ ও তরঙ্গায়িত। নিপুণ হাতে সৃষ্ট নকশাগুলো অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যা সহজেই লক্ষণীয়। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন- বাইরের উদ্গাত প্যানেল নকশায় খিলান গর্ভে উৎকীর্ণ ফলদার বৃক্ষ, ঝুলন্ত পেনডেন্ট নকশায় শিকলকে ফুল ও লতায় পরিণত করে বিমূর্ত লতার জটিলতা সৃষ্টি করাকে সাজ-সজ্জার আতিশয্য বলেই মনে হয়। মাত্রাতিরিক্ত অলংকার যোগ করার কারণে খিলান

১. Alexander Cunningham, *op.cit.*, p. 62
২. J. Marshall, " The Monuments of Muslim India", *The Cambridge History of India*, vol-III, W. Haig (ed.), Cambridge, University Press, 1928, p. 605
৩. Muhammad Hatizullah Khan, *op.cit.*, p. 129

শীর্ষ হতে ঝুলন্ত মোটিফটি এখানে সহজে দৃশ্যমান হয় না।(চিত্র:) এ দিক দিয়ে মার্শালের 'অতি সাজসজ্জায় দিকে ঝোঁকের' আভিযোগটি একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

ধুনি চক মসজিদ

ধুনি চক মসজিদটি প্রাচীন গৌড় নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। বর্তমনে এর অবস্থান বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামে, মসজিদটিতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। স্থাপত্য শৈলী থেকে মসজিদটি পনের শতকের শেষভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

চিত্র: ৪.২৬

মসজিদটি ১৩.৪০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৮.৭৮ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি আয়তকার ইমারত। মসজিদের পশ্চিম ও উত্তরের দেয়াল ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণটা ধ্বংস প্রাপ্ত। এর পশ্চিম বা কিবলা দেয়ালে রয়েছে তিনটি মিহরাব। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি বৃহৎ ও উঁচু করে নির্মিত। মিহরবের খিলানগুলো বহুখাঁজ বিশিষ্ট। এর উত্তর দেয়ালে দুটি বদ্ধ খিলান রয়েছে।[১] নামাজঘরটি দুটি পাথরের স্তম্ভ দিয়ে তিনটি আইল ও দুটি 'বে' তে বিভক্ত। মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে ইটের পেনডেন্টিভ এখনও দৃশ্যমান। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে মসজিদটি এক সময় ছয়টি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি মসজিদটি সম্পূর্ণ পূণর্নির্মাণ করা হয়েছে।

অলংকরণ:

১. আবু সাঈদ মোস্তাফিজুর রহমানের মতে, খিলানগুলো একসময় উন্মুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে তা ইট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। (Abu Sayeed M Ahmed, *Masque Architecture in Bangladesh*, Dhaka, UNESCO, 2006, p. 111) তবে খিলানের উত্থানের স্থানে মসজিদের অন্যান্য স্থানের সাথে সঙ্গতি রেখে পাথরের স্তর থাকায় মনে হয় তা আদি থেকেই বন্ধ ছিল।

মসজিদের আদি অলংকরণ যে টুকু আছে তা এর কিবলা দেওয়াল ও উত্তর দেয়ালে সীমাবদ্ধ। মসজিদের মিহরাব ফ্রেম এর নকশা তাঁতীপাড়া মসজিদের সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। মিহরাব খিলানের স্প্যানড্রিলের নকশার সাথে তাঁতীপাড়া মসজিদের প্রবেশদ্বারের খিলান নকশার যথেষ্ট মিল রয়েছে। মিহরাব খিলানের দুই পার্শ্বেও তাঁতীপাড়া মসজিদের মত উল্লম্ব ভাবে দুটি করে অলংকৃত প্যানেল রয়েছে। ধুনিচক মসজিদের অলংকরণটি ইতিপূর্বে অন্য কোন মসজিদের কিবলা দেয়ালে দেখা যায়নি তা হল এর মিহরাব খিলানের উচ্চতায় অবস্থিত পাথরের স্তরের উপর ও নীচে পাঁচপত্র বিশিষ্ট পাড় নকশা, এই ধরণের নকশা সাধারণত স্থাপত্যের বাইরে দেয়াল সজ্জায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

মসজিদের উত্তর দেয়ালের খিলান ফ্রেমগুলোও একসময় যথেষ্ট অলংকৃত ছিল। বর্তমানে খিলান শীর্ষে স্প্যানড্রিলের দুইপাশে রোজেট ও কোনার খিলান ফ্রেম ও স্প্যানড্রিলের পার্শ্ব অলংকরণের হতে এর প্রমাণ মেলে।

সাধারণ আলোচনা

ধুনিচক মসজিদের এই আদি অংশটুকু থেকে ধারণা করা যায় যে, মসজিদটি ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট ও একসময় জাঁকালোভাবে অলংকৃত ছিল। মসজিদ অলংকরণে তাঁতীপাড়া মসজিদকে আদর্শ হিসাবে ধরা হয়েছিল।

রাজবিবি মসজিদ

রাজবিবি মসজিদটি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে উপজেলায় অবস্থিত। এটি গৌড় নগরীর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে খনিয়া দীঘির পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি খনিয়া দীঘি মসজিদ নামেও পরিচিত।

চিত্র: ৪.২৭

এটি বারান্দা সম্বলিত একটি বর্গাকার পরিকল্পনার মসজিদ। মসজিদটি সম্বন্ধে আহমেদ হাসান দানী যে বর্ণনা দিয়ে ছিলেন তা অনেকটা এ রূপ 'মসজিদটি চামকাট্টি মসজিদের পরিকল্পনার অনুরূপভাবে তৈরী। এর পূর্ব দিকে একটি

বারান্দা রয়েছে যা তিনটি গোলাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এর সবগুলোই ধ্বসে পড়েছে।'[১] ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক মসজিদটি সংস্কার করা হয়। বর্তমানে বারান্দাসহ মসজিদটির আয়তন ১৩.০৫ মিটার/১৭.৭৮ মিটার। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে বারান্দায় প্রবেশের জন্য তিনটি প্রবেশপথ ও বারান্দা উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। বারান্দার পূর্ব দেয়ালের তিনটি প্রবেশপথ বরাবর মূল মসজিদে প্রবেশের জন্য তিনটি খিলানপথ রয়েছে। মূল মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণেও দুটি প্রবেশপথ আছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের সংখ্যা তিনটি। মূল নামাজকক্ষের উপরে রয়েছে একটি বৃহৎ গম্বুজ। গম্বুজটি স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে নির্মিত। বারান্দার গম্বুজ নির্মাণে পেনডেটিভ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে বারান্দা তিনটি অর্ধগোলাকার গম্বুজ আচ্ছাদিত। তবে আবু সাইদ এম. আহমেদ বারান্দার মাঝখানের গম্বুজটি লট্টন মসজিদের ন্যায় চৌচলা ভল্ট হবার সম্ভাবনার কথা বলেছেন।[২]

মসজিদের বাইরের চারিদকের দেয়াল উন্নত ও অবনত অংশে বিভক্ত। এর প্রবেশপথগুলোকে কিছুটা অন্তর্নিবিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। ফ্রেমটি সরু পাড় নকশায় সজ্জিত। ফ্রেমের মধ্যে প্রবেশ খিলানের স্প্যানেড্রিলে দুটি রোজেট ছাড়া আর কোন নকশা নেই। দরজার ফ্রেমের উপরে রয়েছে তিনটি রোজেট ও এর উপরে একটি উদ্গাত মোল্ডিং ও একসারি মারলন। দরজার দুই পাশের দেয়ালে উপরে ও নীচে দুটি করে উদ্গাত প্যানেল নকশা রয়েছে। প্যানেলের উপর ও নীচের অংশ উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ। দুটি ব্যান্ডের মধ্যবর্তী স্থান নকশাকৃত ফ্রেমে আবদ্ধ। ফ্রেমের মধ্যে দুটি অলংকৃত স্তম্ভের উপর খাঁজ-খিলান স্থাপন করা হয়েছে। খিলানের অভ্যন্তর ভাগ অলংকৃত প্রদীপ নকশায় সজ্জিত। খিলানের ওপরের অংশে অলংকৃত পাড়ে তিনটি রোজেট পরিলক্ষিত হয়।

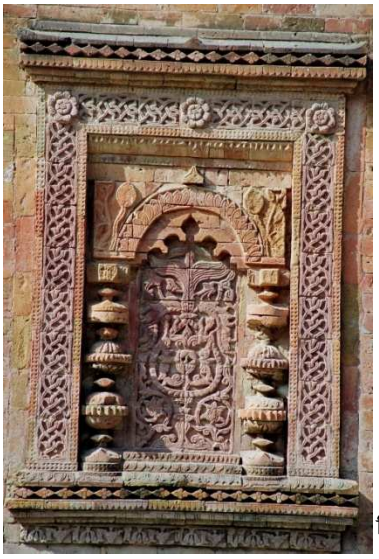
চিত্র: ৪.২৮

১. A.H. Dani, op.cit., p.112
২. Abu Sayeed M Ahmed, *op.cit.*, 2006,p. 109

পার্শ্ববুরুজগুলো অষ্টকোনাকার। এর ভিত্তিতে রয়েছে চারটি মোল্ডিং। মোল্ডিংগুলোর মধ্যবর্তী অংশ এবং এদের উপওে ও নীচে পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায়। সবচেয়ে নীচে রয়েছে একসারি অলংকৃত খিলান নকশা এবং সবচেয়ে উপরে একসারি অলংকৃত মারলন। মধ্যবর্তী অংশগুলো জালি বা লতা নকশায় সজ্জিত। পাশ্ববুরুজগুলোতে উন্নত ও অবনত দেয়ালাংশ রয়েছে। বুরুজসমূহের গাত্র ভিত্তির মোল্ডিংসমূহ ও ফ্রিজের মধ্যবর্তী অংশে দুটি উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত। প্রতিটি অন্তর্নিবিষ্ট অংশে চারপত্র জালি নকশায় সজ্জিত। মসজিদের কার্নিশের নিচে তিন সারি অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দুই সারিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিলান ফুল ও পাতা নকশায় শোভিত। এর নিচে রয়েছে একসারি চারপত্র ফুলের জালি নকশা। ফ্রিজ অলংকরণের এই বৈশিষ্ট্যটি একলাখী সমাধিতে লক্ষ্য করা যায়।

মসজিদ অভ্যন্তরে বৃহৎ খিলানগুলোর প্রান্ত রেখায় বহুখাঁজ নকশা রয়েছে। দুই খিলানের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে একটি করে রোজেট। রোজেটগুলোর চারদিকে পত্র নকশা দ্বারা সূর্যকিরণের ন্যায় আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে। গম্বুজ উত্থানের অংশে রয়েছে একটি মোল্ডিং, এর নিচে একসারি চারপত্র জালি নকশার পাড় ও উপরে অলংকৃত ক্ষুদ্র খিলান নকশা ও পাঁচপত্র বিশিষ্ট নকশার ধারাবাহিক উপস্থাপন।

সাধারণ আলোচনা

মসজিদটি ১৯৯০ সালে সংস্কার করে এর বারান্দা পার্শ্ব বুরুজ ও ফাসাদের অলংকরণসমূহ পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এর দক্ষিণ ও পশ্চিম দেয়ালের অলংকরণগুলো আদি। সংস্কারের পূর্বে দানী ঐ সকল দেয়ালে ফ্রিজ ও প্যানেলের অলংকরণগুলো দেখেছিলেন।[১]

২. অন্যান্য স্থানের স্থাপত্য

ষাট গম্বুজ মসজিদ

বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত ষাট গম্বুজ মসজিদটি এযুগের সবচেয়ে বৃহৎ ও রাজকীয় স্থাপত্য। মসজিদটি থেকে কোন শিলালিপি পাওয়া না গেলেও মনে করা হয় এই জামে মসজিদটি খান জাহান আলী কর্তৃক পনের শতকে স্থাপিত হয়েছিল।[২] মসজিদটি ষাট গম্বুজ মসজিদ নামে খ্যাতি লাভ করলেও আদতে এর গম্বুজের সংখ্যা সাতাত্তরটি এর মধ্যে সত্তরটি অর্ধগোলাকার ও সাতটি চৌচালা। মসজিদের পার্শ্ব-বুরুজগুলোও ক্ষুদ্র চারটি গম্বুজে আচ্ছাদিত। মসজিদটি একটি বিশাল প্রাচীরঘেরা অঙ্গনের মাঝখানে নির্মিত। মসজিদের পূর্ব ও উত্তর

১. A.H. Dani, *Ibid.*

২. L.S.S. O Malley, *Bengal District G azetteers, Khulna*, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot , 1908, p. 27

দিকের দুটি বেষ্টনী প্রাচীরে দুটি প্রবেশপথ রয়েছে। পূর্ব দিকের প্রবেশপথটি অধিক অলংকৃত ও বৃহদাকারে নির্মিত।

চিত্র: ৪.২৯

মসজিদটি ৪৮.৯৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৩২.২৫ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি আয়তকার ইমারত। মসজিদের চারদিকে চারটি গোলাকার পার্শ্ব বুরুজ রয়েছে। এদের মধ্যে সামনের বুরুজ দুটির মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় তলে উঠার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে এগারটি, দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালে সাতটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। এর পশ্চিম দেয়ালে কেন্দ্রীয় মিহরাবের পার্শ্বে আর একটি প্রবেশপথ সম্ভবত মসজিদের ঈমাম বা প্রশাসনিক প্রধানের জন্য সংরক্ষিত ছিল। মসজিদের অভ্যন্তরভাগ পূর্ব-পশ্চিমে সাতটি আইল ও উত্তর-দক্ষিণে এগারটি আইলে বিভক্ত। এর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আইলের কেন্দ্রীয় আইলটি অপেক্ষাকৃত চওড়া ও উঁচু। মসজিদের সকল দিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথগুলো অপেক্ষাকৃত চওড়া করে নির্মিত। মসজিদের পশ্চিম বা কিবলা দেয়ালে প্রবেশপথ বরাবর দশটি মিহরাব রয়েছে, দক্ষিণ থেকে সপ্তম মিহরাবের স্থানে রয়েছে একটি প্রবেশপথ। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহবাবটি বৃহত্তর ও পাথরের তৈরী। বাকী নয়টি মিহারাব ইটের তৈরী। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের পার্শ্ববর্তী খিলানগুলো পূর্বে সম্ভবত ইটের জালি দ্বারা বন্ধ ছিল। মসজিদের উত্তর দেয়ালের একটি খিলানে এখনও এর নিদর্শন পাওয়া যায়।

অভ্যন্তরে পঞ্চান্নটি পাথরের ও পাঁচটি ইটের স্তম্ভসহ মোট ষাটটি স্তম্ভের উপর মসজিদের ছাদটি স্থাপিত। মসজিদের কেন্দ্রীয় আইলের উপরে রয়েছে সাতটি চারচালা ভল্ট বাকী অংশ অর্ধগোলাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। ছাদ নির্মাণে চারচালার ব্যবহারের এটিই সম্ভবত প্রাচীনতম নিদর্শন।

অলংকরণ

মসজিদটি খুবই স্বল্প অলংকরণ সম্বলিত এর বাইরে দেয়ালে চারদিকের প্রবেশপথ কিছুটা অন্তর্নিবিষ্টাকারে ফ্রেমের মধ্যে নির্মিত। বাইরের অলংকরণগুলো এই ফ্রেমগুলোর উপরের অংশে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি সবচেয়ে অলংকৃত।

চিত্র: ৪.৩০

মসজিদের প্রবেশ-খিলানগুলো দ্বিকেন্দ্রীক। প্রবেশ-খিলানের দুইপাশে স্প্যানড্রিলে স্থাপন করা হয়েছে দুটি পোড়ামাটির পদ্ম নকশা। এর উপরে রয়েছে তিনটি মোল্ডিং। সবচেয়ে উপরে রয়েছে একসারি লতা নকশা, দ্বিতীয় সারিতে চার পাপড়ি যুক্ত ফুলের নকশা যুক্ত পাড়, তৃতীয় সারিতে চার পাপড়ির ফুল ও বরফি বা লজেন্স নকশার ধারাবাহিক বিন্যাস, এর পরের সারিতে রয়েছে একসারি ঝুলন্ত বিমূর্ত নকশা। সর্বশেষে সারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ দ্বারা এগারটি বর্গাকার প্যানেলে বিভক্ত। এসকল প্যানেলে প্রান্তহীন ফিতার বুনট নকশা, প্রদীপ নকশা[১] (চিত্র:)পুষ্পিত বৃক্ষ ইত্যাদির নকশা দেখা যায় । প্যানেলগুলির নীচে একসারি সরু ঝুলন্ত ফুলের নকশা রয়েছে। কেন্দ্রীয় খিলানের প্রান্তরেখার কিছুটা উপরে, একসারি ঝুলন্ত পাড়ের খিলানকৃত নকশা রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ খিলানের দুই পাশের দেয়ালের উর্ধ্বাংশের দুটি পদ্ম নকশা স্থাপিত হয়েছে।

১. এই ধরনের প্রদীপ নকশার প্রতীক পালযুগের তাম্রশাসনে পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন, বর্তমানে মালদহ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

চিত্র: ৪.৩১ (ক)

চিত্র: ৪.৩১ (খ)

কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের দুই পাশের প্রবেশ থের অন্তর্নিবিষ্ট ফ্রেমের উর্ধ্বাংশ তাঁতীপাড়া মসজিদের মত অলংকৃত স্তম্ভশীর্ষ নকশা দেখা যায়। এছাড়া দ্বিকেন্দ্রীক খিলানের দুইপাশে পদ্ম চক্র ও খিলান-শীর্ষে অলংকৃত বরফি/লজেন্স ব্যবহৃত হয়েছে। স্তম্ভশীর্ষের নকশার অলংকরণে বরফি/লজেন্স, পুঁতি ও ঝুলন্ত মালা নকশার ব্যবহার দেখা যায়। মসজিদের বক্র কার্নিশের নীচে একসারি বরফি নকশার ব্যান্ড ছাড়া আর কোন অলংকরণ চোখে পরে না।

মসজিদ অভ্যন্তরে অলংকরণ মূলতঃ মিহরাবগুলোতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পাথরের তৈরী। পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায় পার্শ্ব-মিহরাবগুলোতে। মিহরাব খিলানগুলো বহুখাঁজ বিশিষ্ট ও একটি উদ্গাত ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। মিহরাবগুলো একসময় খুব জাঁকালো নকশায় অলংকৃত ছিল বলে মনে হয়। এর সম্পূর্ণটুকু বর্তমানে টিকে নাই, মিহরাবস্তম্ভগুলো ইটের, মুসলিম-পূর্ব যুগের স্তম্ভ নকশায় তৈরী। খিলান-খাঁজগুলো তিনটি শীর্ষযুক্ত। খিলানের প্রান্তরেখা ধরে চওড়া একটি ফুল-লতার নকশাযুক্ত পাড় রয়েছে। এর দুপাশে স্প্যানড্রিলে

চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা দেখা যায়। খিলানের উপরে ফ্রেমের অভ্যন্তরে কয়েক সারি পোড়ামাটির পাড় নকশা রয়েছে। সবচেয়ে উপরে একসারি খাঁজ নকশা, এর নিচে পর্যায়ক্রমে, ক্ষুদ্র মারলনের পাড়, লজেন্স পাড়, ঝুলন্ত মালা নকশার পাড়, চার পাঁপড়ির ফুলের পত্র ইত্যাদি পাড়ের সারি সন্নিবেশিত হয়ে সমগ্র স্প্যানড্রীলটি পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। খিলান ফ্রেমটি দুই পার্শ্বে বেশি ভাগ ক্ষেত্রে সমতল হলেও দুটি মিহরাব ফ্রেমে ফুল ও খোপের ধারাবাহিক নকশার পাড় দেখা যায়। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, অপরাপর খিলান ফ্রেমগুলোও এক সময় এ ধরণের নকশায় সমৃদ্ধ ছিল যা কালের আঘাতে বিলীন হয়ে গেছে। উপরের অংশ পাঁচটি চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশায় পাড় অলংকৃত। খিলান ফ্রেমের উপরের অংশটি বেশ জাঁকালো। দুটি উদ্গাত ব্যান্ড এর মধ্যবর্তী অংশ এর উপরে ও নিচের পাড় নকশা দ্বারা সজ্জিত। মিহরাব ফ্রেমের ঠিক উপরে রয়েছে একসারি স্তম্ভ নকশা পাড়। এর নিচে সরু একসারি ফুলের পাড় নকশা। স্তম্ভ নকশাটির উপরে রয়েছে একটি উদ্গাত ব্যান্ড এর উপর এগারটি ফুলদানী সদৃশ্য স্তম্ভ দ্বারা দেয়ালটিকে কয়েকটি প্যানেলে বিভক্ত করে প্রতিটি প্যানেলে বৃক্ষ ও লতা নকশা সংযুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র: ৪.৩২

এর উপর আরও দুইসারি পাড় নকশা যুক্ত হয়েছে। এই নকশাগুলো আর একটি উদ্গাত ব্যান্ডে দ্বারা আবদ্ধ। ব্যান্ড উপরে সাতটি তিন-শীর্ষ যুক্ত অলংকৃত প্যানেল নকশা রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই মসজিদের পূর্বে এগারটি ও উত্তর দক্ষিণে সাতটিটি করে খিলানপথ রয়েছে। মিহরাব নকশায় এগারোটি স্তম্ভ ও সাতটি শীর্ষ প্যানেলের সংখ্যা কাকতালীয় ভাবেই প্রবেশপথের সংখ্যার সাথে মিলে যায়। সমগ্র খিলান ফ্রেমের উপর বৃহৎ খিলানের খিলান-পটহে রয়েছে একটি বৃহৎ চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা। এই বৃহৎ পদ্মের চারপাশে রয়েছে আরও আটটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পদ্ম। মিহবারের অবতল অংশ খিলান উত্থানের স্থান হতে নিচে পর্যন্ত আড়াআড়ি ব্যান্ড দ্বারা

কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অংশ বিভিন্ন লতা ও উদ্ভিজ্জ নকশায় সজ্জিত ছিল। উপরের ব্যান্ড হতে একটি শিকল উল্লম্বভাবে চারটি ব্যান্ড পর্যন্ত নেমে মিহরাব অবতলে নির্মিত পঞ্চম ব্যান্ডের উপরে একটি পেনডেন্ট আকারে শেষ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য প্রতিটি মিহরাবে সম্পূর্ণ একই নকশার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়নি। পাড় নকশার উপস্থাপনে এক মিহরাব হতে অন্য মিহরাবের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তবে প্রায় সবগুলো পাড় নকশায় লতা ও উদ্ভিজ্জ মোটিফ প্রাধান্য পেয়েছে। মসজিদের প্রতিটি প্রবেশপথের অভ্যন্তরভাগের খিলানের উপরে দুই কোণে দুটি পদ্ম ও মাঝে একটি বরফি নকশা এর উপরে পাড় নকশার সারি সংযুক্ত হয়েছে।

সাধারণ আলোচনা

বাগেরহাট মসজিদটি পনের শতকের একটি স্থাপত্য। গৌড়ে রাজকীয় স্থাপত্যের সাথে এর বাইরের অবয়বে বেশ কিছু অমিল রয়েছে। এই মসজিদে ব্যবহৃত গোলাকার পার্শ্ব-বুরুজ গৌড়ের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে নির্মিত নয় বরং এখানে বুরুজ নির্মাণে দিল্লীর তুঘলক স্থাপত্যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[১] উল্লেখ্য, এই অঞ্চলের বেশ কিছু মসজিদে এই ধরণের বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় যাকে কোন কোন শিল্প ঐতিহাসিক 'খলিফাতাবাদ রীতি' বা 'খানজাহানী রীতি' বলে আভিহিত করেছেন। রাজধানী গৌড় নগরের জাঁকজমকপূর্ণ অলংকরণের বিপরীতে এখানকার সজ্জায় কঠোর সংযম এ অঞ্চলের স্থাপত্য এমন ভিন্ন নামে অভিহিত হওয়ার আর একটি কারণ। এখানকার অলংকরণের জাঁকজমকহীনতা সেলজুক অলংকরণ রীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।[২] এই মসজিদের মিহরাব অংশের খাঁজ-খিলান ও পোড়ামাটির অলংকরণ গৌড়-পান্ডুয়ার স্থাপত্যের সাথেই তুলনীয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতীক যেমন পালযুগীর তাম্র শাসনে ব্যবহৃত প্রতীক, প্রান্ত বিহীন ফিতার জাল নকশা ইত্যাদিও মসজিদ অলংকরণে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে অলংকরণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় লতা-গুল্মের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যা বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের স্থাপত্য নকশা হতে ভিন্ন স্বাদের। সামগ্রিক বিচারে তাই ইমারতটি পরবর্তী ইলিয়াস শাহী স্থাপত্য ধারার ধারক হয়েও তুঘলীক স্থাপত্যে প্রভাবিত ও স্থানীয় অলংকরণ ধারায় একটু স্বতন্ত্র ধরনের স্থাপত্য উদাহরণ। সব মিলিয়ে মসজিদের আয়তনের তুলনায় অলংকরণ স্বল্প মনে হলেও মসজিদটিতে অলংকরণের পরিমাণ একেবারে কম ছিল না।

বাবা আদমের মসজিদ

মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপাল উপজেলায় অবস্থিত বাবা আদমের মসজিদটি গৌড় নগর হতে বহু দূরে অবস্থিত পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন। মসজিদে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি অনুসারে মসজিদটি

১. এ.বি.এম. হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪

২. *প্রাগুক্ত.*

১৪৮৩-৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান জালাল-উদ্-দীন ফাতেহ শাহের সময় মালিক কাফুর কর্তৃক নির্মিত হয়। বাবা আদম নামে স্থানীয় একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির নামানুসারে মসজিদটি বাবা আদমের মসজিদ নামে পরিচিত।

চিত্র: ৪.৩৩

ছয় গম্বুজ সম্বলিত মসজিদটি দৈর্ঘ্য ১৩.৯৩ মিটার ও প্রস্থ ১০.৩৪ মিটার। মসজিদটির চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকার পাশ্ববুরুজ রয়েছে। এর বহির্দেয়ালে পাশ্ব-বুরুজ সংলগ্ন দেয়ালগুলো কিছুটা অন্তর্নিবিষ্ট ভাবে বিন্যস্ত এবং পশ্চিম দেয়ালের কেন্দ্রীয় মিহরাবের স্থানটি কিছুটা বাইরের দিকে বর্ধিত আকারে নির্মিত হয়েছে। মসজিদের প্রবেশপথ তিনটি পূর্ব দেয়ালে নির্মিত। মসজিদের কার্নিশ এই যুগের অন্যান্য মসজিদের মতই বক্রাকারে নির্মিত। এর অভ্যন্তরকে দুটি স্তম্ভ দ্বারা ছয়টি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম বা কিবলা দেয়ালে রয়েছে তিনটি মিহরাব। এছাড়া এর উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি করে বদ্ধ খিলান রয়েছে।

অলংকরণ

মসজিদের ভেতর ও বাইরের দেয়াল একসময় জাঁকালো অলংকরণে সজ্জিত ছিল। এদের বেশীরভাগ বর্তমানে হারিয়ে গেলেও কিছু নিদর্শন এখনও তার সাক্ষ্য বহন করছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালের প্রবেশ খিলানগুলো অন্তর্নিবিষ্ট প্যানেলের মধ্যে স্থাপিত। খিলান তিনটি উচ্চতায় সমান হলেও কেন্দ্রীয় খিলান প্যানেলটি এর উভয় পার্শ্বস্থ খিলান-প্যানেল অপেক্ষা উঁচু। কেন্দ্রীয় প্যানেলের উর্ধ্বাংশ দুটি উদ্গত ব্যান্ড ও তিনটি পোড়ামাটির নকশাকৃত পাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। পাড় নকশায় লজেন্স, জিগজ্যাগ ও ত্রিকোন নকশার সারি লক্ষ্য করা যায়।

সর্বশেষ সারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ দ্বারা কয়েকটি প্যানেলে বিভক্ত করে তাতে ফুল ও লতার নকশার বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের দুই পাশের দেয়াল খিলান উত্থানের স্থান হতে খিলান প্যানেলের উর্ধ্বাংশ পর্যন্ত কিছুটা প্রক্ষিপ্ত আকারে নির্মিত এবং এই অংশ দুটি অন্তর্নিবিষ্ট প্যানেল গঠন করে তাতে স্তম্ভযুক্ত অলংকৃত খাঁজ-খিলান নকশা উপস্থাপিত হয়েছে। খাঁজ-খিলানের প্রান্ত রেখা ধরে লতা নকশা ও এর স্প্যানড্রিলে দুটি রোজেট রয়েছে। খিলানশীর্ষ হতে শিকলে ঝুলছে একটি প্রদীপদানের নকশা। খিলানের উপরে একসারি ক্ষুদ্র স্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত প্যানেলে বিভিন্ন ফুল-লতা নকশা দ্বারা পূর্ণ। এর উপরে দুটি উদ্গাত ব্যান্ড রয়েছে যার মধ্যবর্তী অংশে একসময় পোড়ামাটির পাড় নকশা শোভা পেত। দুই পাশের প্রবেশ খিলানগুলোও একই ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট প্যানেলে সংস্থাপিত। তবে এদের শীর্ষে একটি উদ্গাত ব্যান্ড নকশা রয়েছে যার নিচে একসারি স্তম্ভযুক্ত খোপে ফুল-লতার নকশা রয়েছে এবং ব্যান্ডে এর উপরে সম্ভবত আর একসারি পোড়ামাটির পাড় নকশা ছিল।

পূর্ব দেয়ালের খিলান তিনটি একটি স্বল্প উদ্গাত দেয়ালাংশে স্থাপিত। এর দুই পার্শ্বের দেয়াল কিছুটা অবনত ভাবে নির্মিত। পার্শ্ব-বুরুজগুলো অষ্টকোণাকার। পার্শ্ব-বুরুজের ভিত্তিতে চারটি উদ্গাত ব্যান্ড রয়েছে। ব্যান্ডগুলি বুরুজগুলোর পার্শ্বস্থিত অবনত দেয়ালের ভিত্তি জুড়ে বিস্তৃত। ব্যান্ডগুলোর উপরে একসারি মারলন নকশা রয়েছে। পার্শ্ব বুরুজগুলির মাঝ বরাবর আর একটি উদ্গাত ব্যান্ড রয়েছে যার নিচে একসারি অলংকৃত ক্ষুদ্র খিলান- ফুল ও লতা নকশায় পূর্ণ। বহির্দেয়ালের কার্নিশের নীচে আর একসারি ক্ষুদ্র খিলান নকশা দেখা যায়। যা একইভাবে ফুল ও লতার নকশা দ্বারা অলংকৃত।

চিত্র: ৪.৩৪

মসজিদের পশ্চিমের বাইরের দেয়ালে কেন্দ্রীয় মিহরাবের অংশটি কার্নিশ পর্যন্ত বর্ধিত আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। এই বর্ধিত অংশে একটি খিলান নকশার প্যানেল অলংকরণ রয়েছে। খিলানটি একটি লতানো বর্ডার দ্বারা আবদ্ধ। খাঁজ-খিলানের শীর্ষ হতে একটি ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা রয়েছে। খিলান স্প্যানড্রিলে রয়েছে দুটি রোজেট। মসজিদের

অভ্যন্তরে কিবলা দেয়ালে তিনটি সমান উচ্চতা বিশিষ্ট মিহবার রয়েছে। মিহরাবের খিলানগুলো মুসলিম-পূর্ব যুগের নকশায় তৈরী দুটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। স্তম্ভের গায়ে শিকল-ঘণ্টার ঝুলন্ত নকশা রয়েছে। প্রতিটি খিলান বহুখাঁজ বিশিষ্ট। খাঁজসমূহের সূঁচালো প্রান্তের পরিবর্তে ত্রিপত্র নকশায় শেষ হয়েছে। খিলানের দুইপার্শ্ব দুটি অর্ধ-মারলন নকশায় সজ্জিত। স্প্যানড্রিলের উপরের দিকে দুটি চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা রয়েছে। খিলান শীর্ষ হতে উপরের দিকে ফ্রেমের অভ্যন্তরের প্রান্তসীমা পর্যন্ত কয়েকটি মোল্ডিং দ্বারা অলংকৃত। সর্বনিম্ন সারিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভসারি দ্বারা বিভক্ত প্যানেলে ফুল-লতা নকশা উপস্থাপিত হয়েছে। এর উপরে রয়েছে দুটি উদ্গাত ব্যান্ড। ব্যান্ডগুলোর মধ্যবর্তী অংশ লজেন্স, পুঁতি ও ক্ষুদ্র পদ্ম নকশার পাড় দ্বারা পরিপূর্ণ। খিলানের তিন দিকের উদ্গাত ফ্রেমটি বর্তমানে সাদামাটা, অলংকরণ বিহীন। তবে পূর্বে হয়তো তা পোড়ামাটির নকশায় সজ্জিত ছিল। ফ্রেমের উপরে একসারি ঝুলন্ত মালা নকশা রয়েছে। এর উপরে একটি উদ্গাত ব্যান্ডে দন্ত নকশার সারি পরিলক্ষিত হয়। ফ্রেমের সবচেয়ে উপরের অংশটি উদ্গাত ও কিছুটা ছড়ানো এখানে বাঁকানো মারলন নকশা দেখা যায়। এর উপরে এক সারি লতা ও ফুলে অলংকৃত মারলন নকশায় মিহরাব ফ্রেমটি শেষ হয়েছে।

মিহরাবের অবতল অংশে খিলান উত্থানের উচ্চতায় আড়াআড়িভাবে কয়েকসারি পোড়ামাটির নকশাকৃত পাড় রয়েছে। নকশাগুলোর মধ্যে লজেন্স নকশা, দন্ত নকশা ও স্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত পৃথক পৃথক প্যানেলে চক্রকার ফুল নকশার পাড় রয়েছে। এই মোল্ডিংগুলোর মাঝখান রয়েছে একটি ঝুলন্ত প্রদীপ নকশা।

সাধারণ আলোচনা

মুন্সিগঞ্জের বাবা অদমের মসজিদটি পরিকল্পনা ও অলংকরণে গৌড় স্থাপত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হলেও বেশ কিছু নতুন ধারাও এখানে লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে তিন খিলান প্রবেশপথের দুই পাশের দেয়ালগুলোকে কিছুটা অবনত ভাবে নির্মাণ করার ফলে তিন খিলান প্রবেশপথ যে ভাবে চোখে পরে তা ইতোপূর্বের ইমারতগুলোতে দেখা যায়নি। উদ্গাত প্যানেলে স্তম্ভ নির্ভর খিলান অলংকরণের প্রয়োগ পনের শতকের স্থাপত্যগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও (খলিফাতাবাদের স্থাপত্যগুলো ছাড়া) বাবা আদমের মসজিদে এই নকশাটি উদ্গাত না হয়ে দেয়ালে অন্তর্নিবিষ্ট আকারে উপস্থাপিত হয়েছে যা ব্যতিক্রম। এছাড়া পার্শ্ব-বুরুজের ভিত্তিতে সৃষ্ট একাধিক ব্যান্ড নকশা এর উভয় পার্শ্বের অবনত দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে তিন-খিলান সম্বলিত উদ্গাত দেয়াল অংশটিকে আরও দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছে।

মসজিদের গম্বুজের চুঁড়া নির্মাণে তিনটি গোলাকার চাকতি ব্যবহৃত হয়েছে যা বাংলার অন্য কোন গম্বুজ নির্মাণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। হাফিজুল্লাহ খান একটিকে আনাতোলিয়ার সেলজুক স্থাপত্যের প্রভাব বলে মনে করেন।[১]

ঙ. আবিসিনীয় শাসনামল (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রি.)

১৪৮৬ খ্রিঃ সুলতান জালাল-উদ্-দীন ফতেহ শাহ নিহত হলে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের অবসান ঘটে। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ সনাতন অভিজাত শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সামরিক বাহিনী ও প্রাসাদরক্ষী বাহিনীতে বিরাট সংখ্যক (প্রায় ৮০০০ এর মত) অবিসিনিয় দাস নিয়োগ করেন। এই অবিসিনিয় দাসগণ ক্রমে রাষ্ট্রের উচ্চপদসমূহ দখল করে এবং ফতেহ শাহকে হত্যার মধ্য দিয়ে রাজক্ষমতার অধিশ্বর হয়। আবিসিনীয় দাসগণ পরবর্তী ছয় বছর বাংলার শাসন ক্ষমতা নিজেদের দখলে রেখেছিল। এরা ইতিহাসে অবৈধ্য ক্ষমতা দখলকারী হিসাবে চিহ্নিত এবং তাদের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় হিসাবে গণ্য হয়। অনবরত ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এসময় উন্নয়ন কার্যক্রম তেমন ভাবে অগ্রসর হয়নি। আবিসিনীয় বংশের দ্বিতীয় শাসক সইফুদ্দিন ফিরুজ শাহ কর্তৃক ফিরোজ মিনার এ যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

ফিরোজ মিনার

মিনারটি গৌড় নগরীর বাইরে বারদুয়ারী মসজিদ (বড় সোনা মসজিদ) থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। মিনারটির নির্মাতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। *রিয়াজ-উস-সালাতিন* এ প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে মিনারটি সইফুদ্দিন ফিরুজ শাহ কর্তৃক নির্মিত।[২] অপরদিকে কানিংহামের মতে মিনারটি সইফুদ্দিন হামজা শাহর সময়ে (১৪১০-১১খ্রি.) নির্মিত হয়েছিল।[৩] বর্তমানে মিনারটি একটি উঁচু টিবির উপরে অবস্থিত। সমতল ভূমি হতে একটি সিঁড়ির মাধ্যমে মিনারের প্রবেশপথে পৌছানো যায়। ইটের নির্মিত মিনারটির উচ্চতা ২৬ মিটার, এর ভিতের ব্যাস ৬ মিটার। পূর্বে মিনারটিতে বেষ্টনকরে পাথরে সিঁড়ি ছিল। কিন্তু ১৯১১ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এর ভিত্তি মজবুত করণের জন্য তা মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়।[৪] মিনারটি পাঁচতলা উচ্চতা বিশিষ্ট এর

---

১. Muhammad Hafizullah Khan, *op.cit.*, p. 154

২. গোলাম হোসেন সলীম , প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; A.H. Dani, *op.cit.*, p.114; James Fergusson, *History of Indian and Eastern Architecture*, vol. I. New Delhi, Munshiram Monoharlal, (First published in 1876, Revised by James Burgess and R. Phene Spiers). 1972, p. 26 ; J. Marshall, *op.cit.*, p. 607 এই মতকে সমর্থন করেন।

৩. Alexander Cuninghum, *op.cit.*, p. 58

৪. Abid Ali Khan, *op.cit.*, p. 58

নিচের তিনটি তলা পর্যন্ত দ্বাদশভূজাকৃতির। উপরের দুই তলা গোলায়িত। মিনারের প্রতিটি স্তর ক্রমহ্রসমান ব্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে শেষ হয়েছে। বর্তমানে মিনারটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট কিন্তু পূর্বে তা ক্ষুদ্র গম্বুজাবৃত ছিল বলে জানা যায়।[১] মিনারের দ্বাদশভূজ অংশে প্রতিটি তল পাথরের আনুভূমিক মোল্ডিং দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। দ্বাদশভূজ অংশ ও গোলায়িত অংশের মাঝে একটি ব্রাকেট সমর্থিত পাথরে ছাজ্জা (chhaja) রয়েছে। মিনারের প্রবেশপথ বরাবর প্রতিটি তলে জানালার ব্যবস্থা রয়েছে। নিচ থেকে মিনারের উপরের তলে ওঠার জন্য তিহাত্তরটি ধাপ বিশিষ্ট একটি প্যাঁচানো সিঁড়ি পথ আছে।

চিত্র: ৪.৩৫

অলংকরণ

মিনার অলংকরণে পোড়ামাটির নকশা, পাথর ও মিনা করা টালী তিনটি মাধ্যম ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পোড়ামাটির অলংকরণের প্রাধান্যই বেশী। মিনারের ভিত্তিটি পাথরের তৈরী। পাথরের তিনটি ব্যান্ড সম্পূর্ণ মিনারটি ঘিরে রেখেছে। ব্যান্ড তিনটি উপরে পাথরে খোদাই দুই সারি পাড় নকশা রয়েছে। প্রবেশ-খিলান ও খিলান-ফ্রেম উভয়ই পাথরের তৈরী। দরজার দুই পাশে পাথর খোদাই লতানো নকশা রয়েছে। মিনারের দ্বাদশভূজ অংশে প্রতিটি তলের

১. Abid Ali Khan, *Ibid.*

প্রতিটি বাহুতে রয়েছে একটি করে অন্তর্নিবিষ্ট প্যানেলে খাঁজ খিলান নকশা। খিলানশীর্ষ হতে ঝুলছে একটি শিকলে ঝোলানো পেনডেন্ট। প্রতিটি তলা পৃথককরণে যে পাথরের মোল্ডিং ব্যবহৃত হয়েছে তার উপরে ও নিচে দুই সারি চারপত্র বিশিষ্ট ফুলের জালি নকশায় সজ্জিত। দ্বাদশভূজ অংশের উপরে যে গোলায়িত চতুর্থতল রয়েছে তার ভিত্তিতে তিনটি উদ্গাত ব্যান্ড নকশা দেখা যায়। প্রতিটি ব্যান্ডের নিচে একটি করে চারপত্রযুক্ত ফুলের জালি অলংকরণ রয়েছে। সবচেয়ে উপরে রয়েছে একসারি মারলন নকশা। এই গোলায়িত তলের খিলানকৃত জানালার উপরে আরও একটি পাথরের উদ্গাত মোল্ডিং আছে, যার উপরে ও নিচে একই রকম ফুলকারী জালি নকশা দেখা যায়। একই জালি নকশা এর ফ্রিজেও উপস্থাপিত হয়েছে। মিনারে পঞ্চমতলটির ভিত্তি চতুর্থতলের অনুরূপ পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত। তবে এই তলের জানালার উপরে এক সারি মারলন ও তার উপর এক সারি জালি নকশা রয়েছে। এই তলে জানালার সংখ্যা চারদিকে চারটি।

সাধারণ আলোচনা

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় নির্মিত টিকে থাকা দুটি মিনারের মধ্যে ফিরোজ মিনার একটি। অপরটি হুগলী জেলার পান্ডুয়ায় অবস্থিত বরী মসজিদের মিনার যা পান্ডুয়া মিনার নামে পরিচিত। গৌড়ে অবস্থিত ফিরোজ মিনারের সাথে দিল্লীর কুতুব মিনারের গঠনগত মিল রয়েছে। দুটি মিনারই লৌকিক স্থাপত্য নিদর্শন বিজয় স্তম্ভ হিসাবে তৈরী হয়েছিল। দিল্লীর কুতুব মিনার কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ সংলগ্ন করে নির্মাণ করা হয়েছে। ধারণা করা হয় গৌড়ের ফিরোজ মিনারও কোন মসজিদ সংলগ্ন মিনার ছিল যা একধারে বিজয় স্তম্ভ ও মাজিনা হিসাবে ব্যবহৃত হত। গৌড় নগরীর কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় এটাকে সমবেত হওয়ার স্থান বা নগর দৃশ্য উপভোগের উদ্দেশ্যে নির্মিত হওয়ায় সম্ভবনার কথাও বলা হয়।[১]

চ. হোসেন শাহী শাসনামল (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)

শাসক মোজাফ্ফর শাহ এর গুপ্ত হত্যার মধ্য দিয়ে ১৪৯৩ সালে বাংলার গোলাযোগ পূর্ণ একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। মোজাফ্ফর শাহর মৃত্যুর পর তার উজির সৈয়দ হোসেন ক্ষমতা দখল করেন এবং সমস্ত অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।[২] তিনি সুলতান আলা-উদ-দুনিয়া-ওয়াল দীন আবুল মুজাফ্ফর হোসেন শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ একজন অনন্য সাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁর বংশের মোট চারজন শাসক ১৫৩৮ খ্রি. পর্যন্ত বাংলা শাসন করেছেন। প্রাক মুঘল যুগে হোসেন শাহী আমলকে 'বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করা হয়।[৩]

---

১. এ.বি.এম. হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৯২
২. আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪
৩. *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২৯৭

হোসেন শাহী শাসনামলে বাংলার সীমানা পশ্চিমে গোগরা ও গঙ্গার সংযোগ স্থল, পূর্বে চট্টগ্রাম এবং উত্তরে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১] এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প-সংস্কৃতি সকল দিক থেকে বাংলায় উন্নয়ণের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। সমৃদ্ধির প্রমাণ স্বরূপ রাজধানী গৌড়সহ রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায় যা অন্য যে কোন বংশের শাসনকাল অপেক্ষা অধিক। হোসেন শাহী শাসনামল অপেক্ষা অধিক স্থাপত্য এ দেশে আর কোন রাজবংশীয়দের শাসনামলে নির্মিত হয়নি।

সংখ্যার দিক দিয়ে অধিক হলেও এ যুগে স্থাপত্য পরিকল্পনা বা অলংকরণে কোন সৃষ্টিশীল অগ্রগতি সাধিত হয়নি।[২] এ সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নয়ন ঘটেছিল। ইলিয়াস শাহী শাসনামলের সাথে সাথে বাংলা স্থাপত্যে ধ্রুপদী যুগের অবসান ঘটে যা এই সমৃদ্ধির যুগে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইলিয়াস শাহী শাসনামলে স্থাপত্য পরিকল্পনা ও অলংকরণের সুক্ষ্মতায় যে সামঞ্জস্যতা ও নান্দনীকতার প্রকাশ ঘটেছিল এ যুগে নির্মিত কোন স্থাপত্যে তা খুজে পাওয়া যায় না। দানী বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-

"Buildings, no doubt, were erected in greater number and throughout the kingdom. The style also that prevailed everywhere was uniform. The features that were evolved in earlier period were faithfully copied and the terracotta art also found expression in the usual places. But there was no outstanding creation, except in the richness of glazed tiles"[৩]

এ সময় ইলিয়াস শাহী আমলে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া পাথর খোদাই শিল্পের পুনরুত্থান ঘটে। তবে শিল্পনৈপূণ্যে তা খুব একটা উন্নতমান অর্জন করতে পারেনি বরং পোড়ামাটির অলংকরণকে খোদাই পাথরে উৎকীর্ণ করে শিল্প বিবর্তনের পথে এ যুগের সীমাবদ্ধতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

হোসেন শাহী শাসনামলে 'ইটের তৈরী স্থাপত্য' ও 'ইট ও পাথরের তৈরী স্থাপত্য' এই দুই ধরণের স্থাপত্য নির্মিত হতে দেখা যায়। ইটের তৈরী স্থাপত্যের মধ্যে গুমতি দরওয়াজা (১৫১২ খ্রি.), লট্টন মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) কদম রসুল (১৫৩১ খ্রি.) ও জান জাহানিয়া মসজিদ (১৫৩৫ খ্রি.) অন্যতম। ইট ও পাথরের তৈরী স্থাপত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য হল ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), বড় সোনা মসজিদ (১৫২৬ খ্রি.) এবং গুনমন্ত মসজিদ ইত্যাদি। ইটের স্থাপত্যগুলোতে পোড়ামাটির অলংকরণ আবশ্যিক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় ধরনের স্থাপত্যে পাথর খোদাই অলংকরণের পাশাপাশি ইটের খিলান ও গম্বুজে সামান্য পোড়ামাটির অলংকরণেও দেখা মেলে।

---

১. M.R.Tarafder, *Husain Shahi Bengal*, Dacca , Asiatic Society of Pakistan, 1965, p. 347

২. A.H.Dain, *op.cit.*, p. 27

৩. *Ibid*, op.cit., p. 117

গুমতি দরওয়াজা

এটি গৌড় দূর্গের পূর্ব দিকের প্রবেশপথ হিসাবে ব্যবহৃত হত। তোরণটি চিকা বিল্ডিং এর পূর্ব দিকের লোকোচুরি দরওয়াজা হতে দক্ষিণে অবস্থিত। তোরণটির দুই পাশে এখনও প্রতিরক্ষা বেষ্টনির নিদর্শন রয়েছে। তোরণটি সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

চিত্র: ৪.৩৬

তোরণটি ১৩.০৪ মিটার পার্শ্ব বিশিষ্ট একটি বর্গকার ইমারত। এর চলাচলের পথটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, ১.৫০ মিটার প্রশস্ত খিলানপথের দুপ্রান্তে নির্মিত হয়েছে। তোরণের চারদিকে চারটি খাঁজকাটা গাত্রের গোলাকার পাশ-বুরুজ ছিল যার ভিত্তিগুলো বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায়। একই ধরনের খাঁজকাটা স্তম্ভ তোরণের দুই প্রান্তে ও প্রবেশ খিলানের দুই পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। তোরণের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালেও দুটি প্রবেশপথ রয়েছে। এই দুই পার্শ্বের দেয়াল উল্লম্বভাবে উন্নত ও অবনত অংশে বিভক্ত। তোরণের ছাদ একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজ নির্মাণে বর্গাকার কক্ষের চার কোণে চারটি খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। ইমারতটির ভিত্তি ও প্রবেশপথের দেয়াল খিলান উত্থনের স্থান পর্যন্ত পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত।

অলংকরণ:

তোরণের পূর্বে দেয়ালের প্রবেশ খিলানটি একটি স্বল্পোন্নত ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ খিলানটি কিছুটা অন্তর্নিবিষ্ট আকারে নির্মিত। খিলানটি দ্বিকেন্দ্রীক। খিলানের প্রান্তরেখা ধরে একসারি খাঁজ-খিলান নকশা রয়েছে। খিলান

ফ্রেমের উপরের বাহুর দুই কোনায় দুটি চতুস্কোনার ফাঁকা অংশ দৃষ্টে মনে, হয় এখানে আদিতে দুটি রোজেট বসানো ছিল। প্রবেশ খিলানের দুই পাশে দুটি সংযুক্ত স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভদুটির ভিত্তিতে তিনটি ব্যান্ড নকশা রয়েছে। নিচে দুটি ব্যান্ড লজেন্স নকশার পাড় দ্বারা সজ্জিত।

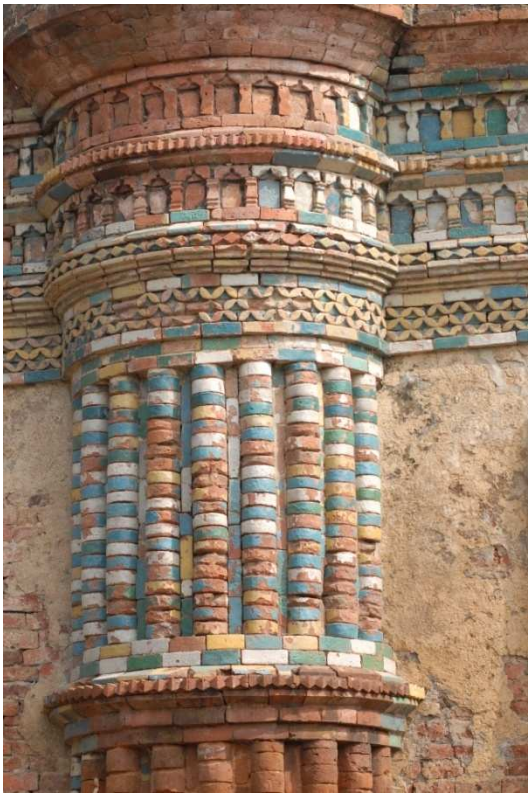

চিত্র: ৪.৩৭

চিত্র: ৪.৩৮

এদের নীচে ক্ষুদ্র খিলান নকশার দুটি সারি রয়েছে। খিলানগুলোর ভিতর অংশ বর্তমানে শূণ্য। একলাখী সমাধিসহ ইতোপূর্বে নির্মিত বহু স্থাপত্যে এই ধরনের খিলান নকশা দেখা যায় যাতে পোড়ামাটির ফুল, পাতা ও লতা নকশা ছিল। তবে এই তোরণের খিলান নকশাগুলো সম্ভবত রং দ্বারা চিত্রিত ছিল, যার নিদর্শন এই একই ইমারতের ফ্রিজ নকশায় দেখা যায়। সবচেয়ে উপরের ব্যান্ডের নিচে একসারি লজেন্স নকশায় অলংকৃত। ভিত্তি হতে ইমারতের ফ্রিজ অবধি স্তম্ভ অংশটি আরও দুটি উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগ উল্লম্ব গোলায়িত খাঁজ-নকশায় নির্মিত। সংলগ্ন স্তম্ভ দুটি ডানপার্শ্বের দেয়ালে একটি উদ্গাত প্যানেল নকশার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্যানেলটির ফ্রেমটি শুধু টিকে আছে, ভেতরের নকশাগুলো এখন আর নেই। প্যানেলের নিচের ঝুলন্ত মালা নকশার কিছু অংশ এখনও দেখা যায়। বাম পার্শ্বের দেয়ালেও সম্ভবত আদিতে একই ধরনের উদ্গাত প্যানেল নকশা ছিল, যার কোন নিদর্শন বর্তমানে টিকে নাই। তোরণের পশ্চিম দেয়াল পূর্ব দেয়ালের অনুরূপ। তবে এর পার্শ্ব দেয়ালে কোন প্যানেল নকশা নাই। পূর্ব দেয়ালটি তোরণের বাইরের অংশ বিধায় সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে বাড়তি অলংকরণ

হিসাবে সম্ভবতঃ প্যানেল নকশাগুলো যুক্ত করা হয়েছিল। ইমারতটির উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের অলংকরণ পূর্ব ও পশ্চিম দেওয়াল অপেক্ষা ভিন্ন। এখানে প্রবেশপথের দুই ধারের দেয়ালে দুটি উদ্গাত প্যানেল নকশা ও এদের মধ্যবর্তী অংশের অবনত উল্লম্ব প্যানেলে খাঁজ-খিলান নকশার মধ্যে ঝুলন্ত পেনডেন্ট নকশা রয়েছে। উদ্গাত প্যানেলটির মাঝখানে রয়েছে একটি খাঁজ-খিলান নকশা, যার শীর্ষ হতে ঝুলছে একটি প্রদীপদান।

চিত্র: ৪.৩৯

প্রদীপদানটির উভয়পার্শ্বের স্থান চার-পল্লব বিশিষ্ট ফুলের জালি নকশায় পূর্ণ। খিলানের দুইপার্শ্বে ও উপরে একটি লতানো নকশার বর্ডার রয়েছে। সমগ্র প্যানেলটির উপরে একটি উদ্গাত ব্যান্ড যা লজেন্স পাড়ে সজ্জিত। এর উপর রয়েছে একসারি মারলন। প্যানেলের নীচে উদ্গাত ব্যান্ডের দুটি সারি, উপরের ব্যান্ডের ন্যায় একইভাবে সজ্জিত। এর নীচে একসারি ঝুলন্ত মালা নকশা রয়েছে। অলংকরণগুলো এনামেল রঙে রঞ্জিত। প্যানেল ভেদে নকশাগুলো পরিবর্তিত হয়েছে। তবে উপস্থাপন ভঙ্গি একই। তোরণের পার্শ্ব বুরুজগুলোর ভিত্তিতে চারটি উদ্গাত ব্যান্ড নকশা রয়েছে। দুটি ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অংশ লজেন্স নকশা, জিগজ্যাগ নকশা ও ত্রিকোণ নকশার পাড়ে সজ্জিত। ভিত্তির উপরের অংশ ফ্রিজ অবধি প্রবেশ-খিলানের পার্শ্বের সংলগ্ন স্তম্ভগুলির মত ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত ও গোলায়িত খাঁজ-নকশায় সজ্জিত ছিল। বুরুজগুলো উপরের অংশ বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। তোরণের ফ্রিজে রয়েছে তিনটি ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত তিন সারি অলংকরণ। একলাখী সমাধির ন্যায় এখানকার ফ্রিজের উপরের পাড় দুটি ক্ষুদ্র খিলান সারিতে সজ্জিত, তবে এতে কোন অলংকরণ নেই। এই খিলান সারির নিচে রয়েছে চার-পল্লব বিশিষ্ট ফুলের জালি নকশা। তোরণের ভেতরে অলংকরণসমূহ এর গম্বুজের ভিত্তি ও কোণের খিলানগুলোর ভেতর অংশে সীমাবদ্ধ গম্বুজের ভিত্তিতে তিনটি ব্যান্ড নকশার সর্বনিম্নে একসারি ফুলকারি জালি নকশা, এর উপর ফুল ও লজেন্স নকশার ধারাবাহিক ব্যবহারে সৃষ্ট পাড় ও সবচেয়ে উপরে একসারি লজেন্স নকশার পাড় রয়েছে। ইমারতের চারকোণের স্কুইঞ্চ খিলানের প্রান্ত রেখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোজেট নকশা রয়েছে।

সাধারণ আলোচনা

গৌড় দূর্গের অন্যতম ফটক গুমতি দরওয়াজাটি হোসেন শাহী আমলে নির্মিত একটি অন্যতম রাজকীয় স্থাপত্য নিদর্শন। পরিকল্পনা ও অঙ্গ সজ্জায় পূর্ববর্তী কালে বিকশিত প্রচলিত ধারার অনুসরণে নির্মিত এই ইমারতে নতুন যে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে তা হল অলংকরণগুলোকে রঞ্জিত করণ। ইমারতটিতে সাদা, নীল, হলুদ ও হালকা সবুজ ইত্যাদি রঙের ব্যবহার দেখা যায়। আদিতে সম্ভবত সম্পূর্ণ ইমারতটি এই সমস্ত রঙে রঞ্জিত ছিল। এর পুরু দেওয়াল ও ভারী পার্শ্ববুরুজ হাফিজুল্লাহ খান পৌরুষের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন।[১] আবার এ.বি. এম হোসেন এর সাথে দিল্লীর কুয়াতুল ইসলাম মসজিদের দক্ষিণ প্রবেশপথ আলাই দরজার অনুকরণ বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২] তবে গুমতি দরওয়াজার রঞ্জিত অলংকরণ দেখে এ.এইচ.দানী যথাযথ ভাবে একে নারীসুলভ সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করেছেন।[৩] দাখিল দরওয়াজার বিশালত্ব ও অলংকরণের যে সংযম প্রকাশ করা হয়েছে, তার নিকট গুমতি দরওজার সাজসজ্জা নারীসুলভই বটে।

লট্টন মসজিদ

কোতয়ালী দরওয়াজা থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভারতের মালদহ অভিমুখী রাস্তার ডানপার্শ্বে লট্টন মসজিদটি অবস্থিত। গৌড় নগরীর ইটের তৈরী মসজিদগুলোর মধ্যে এটি সবচাইতে ভাল অবস্থায় রয়েছে। ক্রেইটনের বর্ণনা অনুযায়ী, মসজিদটি শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ কর্তৃক ৮৮৫ হি./১৪৮০ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছিল।[৪] কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ মসজিদটি ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করেন।[৫]

মসজিদটি একটি পুকুরের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত। এটি সম্মুখে বারান্দাযুক্ত একটি বর্গাকার ইমারত । মসজিদটি বাইরের দিকে ২২.১২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১৫.৬৫ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট, এর মূল নামাজঘরটির অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ১০.৪৫ মিটার বর্গ ও বারান্দা ৩.৩৫ মিটার চওড়া। মসজিদের চারদিকে চারটি গোলাকার পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। এছাড়া মূল নামাজকক্ষ ও বারান্দা সংযোগস্থলে দুটি অর্ধগোলাকার সংলগ্ন-বুরুজ লক্ষ্য করা যায়। বুরুজগুলো গোলায়িত, খাঁজ বিশিষ্ট (fluted)। বারান্দার পূর্ব দেয়ালে প্রবেশপথের সংখ্যা তিনটি। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দিকের আরও দুটি খিলানপথ দিয়ে বারান্দা অংশে প্রবেশ করা যায়। মূল নামাজকক্ষে প্রবেশের জন্য এই কক্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দেয়ালে তিনটি করে মোট নয়টি প্রবেশপথ রয়েছে। পূর্ব দেয়ালের তিনটি প্রবেশপথের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে নামাজকক্ষের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহবার নির্মিত হয়েছে।

---

১. Muhammad Hafizullah Khan, *op.cit.,* p. 162
২. এ.বি.এম. হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭
৩ .A.H. Dani, *op.cit.*,p. 120
৪. H. Creighton, *op.cit.,* pl. lX
৫. A.H. Dani, *op.cit.,* p. 122; M.R Tarafder, *op.cit.,* p. 298

মূল নামাজকক্ষটি একটি বৃহৎ গম্বুজে আচ্ছাদিত। কক্ষের ন্যায় চার কোণে চারটি স্কুইঞ্চ নির্মাণ করে তার উপর গম্বজটি নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র: ৪.৪০

নামাজকক্ষের প্রতিটি দেয়ালে স্থাপিত দুটি করে সংলগ্ন পাথরের স্তম্ভ অভ্যন্তরীণ খিলানগুলোর ভার বহন করছে। বারান্দাটি মাঝখানে একটি চৌচালা রেখে দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র অর্ধগোলাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। লট্টন মসজিদটি তার ভেতর ও বাইরের রঙিন অলংকরণের জন্য বিখ্যাত। মসজিদটির বাইরে স্টাকো বা পাথরের বহিরাবরণের পরিবর্তে রঞ্জিত ও অলংকৃত ইট ব্যবহৃত হয়েছে। ইট রঞ্জনে গাঢ় নীল,সবুজ, হলুদ ও সাদা মোট চারটি রং ব্যবহৃত হয়েছে।

অলংকরণ:

মসজিদের বাইরের দেয়ালের সকল দিকে উন্নত ও অবনত দেয়াল অংশ দেখা যায়। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে অবস্থিত প্রবেশপথগুলো একটি বৃহৎ ও প্রক্ষিপ্ত দেয়ালের মধ্যে নির্মিত। প্রতিটি প্রবেশ পথই কিছুটা অন্তর্নির্বিষ্ট ভাবে স্থাপিত। প্রবেশ খিলানগুলো দ্বিকেন্দ্রীক। কেন্দ্রীয় খিলানটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, সবগুলো খিলানের স্প্যানড্রিলে দুটি চক্রকার রোজেট ও শীর্ষে একটি বরফি আকার ফুলের নকশা রয়েছে। যে অন্তর্নিবিষ্ট দেয়ালে খিলানটি নির্মিত তার উপরে অংশে তিনটি উদ্গাত ব্যান্ড নকশা ও তাদের মধ্যবর্তী অংশ ও এর উপরে ও নীচে পোড়ামাটির পাড় নকশা রয়েছে। নিচের পাড়টি কিছুটা চওড়া ও বরী মসজিদের মিহবার ফ্রেমের ন্যায় পরস্পর সংযুক্ত। নিচ থেকে

প্রথম ব্যান্ডটির উপর একটি ক্ষুদ্র ত্রিকোণ নকশার সারি রয়েছে। দ্বিতীয় ব্যান্ডের উপরে পোড়ামাটির পুঁতি নকশার সারি ও এর দুই কোণে ও মাঝখানে মোট তিনটি ক্ষুদ্র চক্রবদ্ধ রোজেট দেখা যায়।

চিত্র: ৪.৪১

সবচেয়ে উপরের ব্যান্ডে সরু একসারি ঝুলন্ত নকশা, তার নিচে অর্ধগোলাকার পুঁতির নকশা ও এর নিচে একসারি ঝুলন্ত নকশা রয়েছে। উপরের দুটি ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অংশে একসারি বরফি নকশার পাড় দেখা যায়। দুটি খিলানের মধ্যবর্তী দেয়ালে অন্তর্নিবিষ্ট অংশে উল্লম্বভাবে স্থাপিত দুটি প্যানেলে খিলান নকশা রয়েছে। উপরের খিলানগুলো মুসলিম-পূর্ব যুগের নকশার স্তম্ভ সমর্থিত। স্তম্ভের ভিত্তিতে একটি করে অলংকৃত মারলন দ্বারা সজ্জিত। মারলন অলংকরণে কখনো ফলবান বৃক্ষ কখনো টব থেকে উত্থিত ফুলগাছ ইত্যাদি উৎকীর্ণ হয়েছে। খিলানটি বহুখাঁজ বিশিষ্ট এর খাঁজের শীর্ষগুলো তিন-পত্র বিশিষ্ট নকশায় সজ্জিত। খিলানের প্রান্তরেখা ধরে একসারি লতানো নকশা রয়েছে। স্তম্ভশীর্ষের উপরে খিলানের দুইপাশে দুটি অলংকৃত অর্ধ-মারলন নকশা দেখা যায়। খিলান স্প্যানড্রিলে রয়েছে দুটি চক্রবদ্ধ রোজেট। এর উপরের অংশ প্রবেশ খিলানের উপরে উপস্থাপিত নকশার অনুরূপ তবে এখানে সর্বনিম্নে উৎকীর্ণ পাড়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ সহযোগে কয়েকটি প্যানেলে বিভক্ত করে তাতে চক্রবদ্ধ রোজেট বসানো হয়েছে। খিলানশীর্ষ হতে শিকল দ্বারা ঝুলন্ত একটি চারকোনা পেনডেন্ট রয়েছে। নিচের খিলান অলংকরণে কোন স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়নি। এর খাঁজখিলানের দুই পার্শ্বে রয়েছে দুটি চক্রবদ্ধ রোজেট ও শীর্ষে বরফি আকারে মধ্যে ফুলের নকশা। খিলানশীর্ষ হতে শিকল দ্বারা ঝুলন্ত একটি আয়তাকার পেনডেন্ট। খিলানগাত্রের নিম্নাংশে রয়েছে এক সারি মারলন। অন্তর্নিবিষ্ট প্যানেলটির উপরে ও নিচে একটি করে উদ্গাত ও পাড় নকশা রয়েছে। তিন খিলান প্রবেশপথ সহযোগে গঠিত প্রক্ষিপ্ত দেয়ালের দুই পার্শ্বের অবনত দেয়ালাংশে দুটি অন্তর্নিবিষ্ট প্যানেলে একই ধরনের অলংকৃত খিলান নকশা উপস্থাপিত হয়েছে। এই দেয়ালে নিচের অংশ চারটি উদ্গাত ব্যান্ড নকশা দ্বারা বিভক্ত। প্রতিটি ব্যান্ড নকশার নিচের অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিলান সারি দ্বারা শোভিত। খিলানগুলোর অভ্যন্তর ভাগে পোড়ামাটির ফুল বা চক্রবদ্ধ ফুল নকশা আছে। ব্যান্ডগুলোর উপরে একসারি মারলন নকশা রয়েছে। নিম্ন দেয়ালের এই সম্পূর্ণ অলংকরণটি পার্শ্ব বুরুজের নিম্নাংশেও দৃশ্যমান ও ধারাবাহিক নকশা আকারে

বিদ্যমান। মসজিদের চারদিকের পার্শ্ব বুরুজ ও এর পার্শ্ব দেয়ালে একই ধরনের নকশা উপস্থাপিত হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে কেন্দ্রীয় মিহরাবের পশ্চাতে বহির্দেয়াল চারটি ক্রমহ্রাসমান ধাপে উৎক্ষিপ্ত আকারে নির্মিত। এই উৎক্ষিপ্ত দেয়ালাংশে উপরে নিচে স্থাপিত দুটি অন্তর্নিবিষ্ট প্যানেলে মসজিদের অন্যান্য দেয়ালের মত অলংকৃত খিলান নকশা দেখা যায়। মিহবারের পশ্চাতের উন্নত দেয়ালের দুই পাশে দুটি অন্তর্নিবিষ্ট দেয়ালের মাঝে একটি উন্নত দেয়ালাংশে খিলানযুক্ত প্যানেল নকশা দেখা যায়, প্যানেল দুটি উপরে ও নিচে বিন্যস্ত। দুই পার্শ্বের অন্তর্নিবিষ্ট দেয়ালের উপরের অংশে একই ধরনের খিলানযুক্ত প্যানেল নকশা রয়েছে। তবে নিচের অংশ উদ্গাত ব্যান্ড ও এর মধ্যবর্তী অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুস্কোনাকার প্যানেলে পোড়ামাটির অলংকৃত ফলকে সজ্জিত। এদের বেশিরভাগ ফলক বর্তমানে অনুপস্থিত। ব্যান্ডগুলোর উপরের অংশে একসারি মারলন নকশা রয়েছে। পার্শ্ববুরুজগুলোর নিচের অংশ চারটি উদ্গাত ব্যান্ড নকশাসহ এর পার্শ্ব দেয়ালের অনুরূপ নকশায় সজ্জিত। বুরুজের ফ্রিজ পর্যন্ত বিস্তৃত অংশটি একটি উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উদ্গাত ব্যান্ডটি লজেন্স নকশায় সজ্জিত। এর নিচে একসারি ক্ষুদ্র খিলান নকশা রয়েছে ও ব্যান্ডের উপরে রয়েছে একসারি মারলন নকশা। এই নকশার উপরে ও নীচে, বুরুজের দেয়াল গোলায়িত খাঁজ-নকশা সহযোগে নির্মিত।

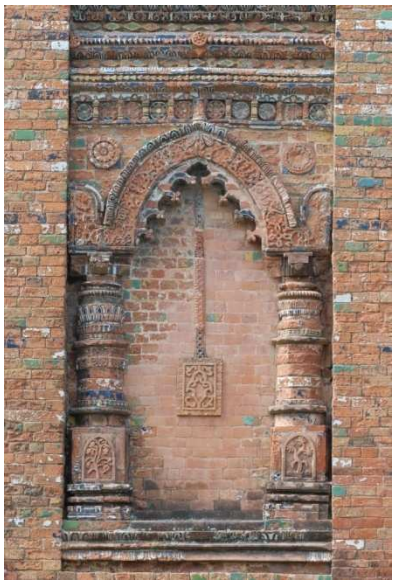

চিত্র: ৪.৪২

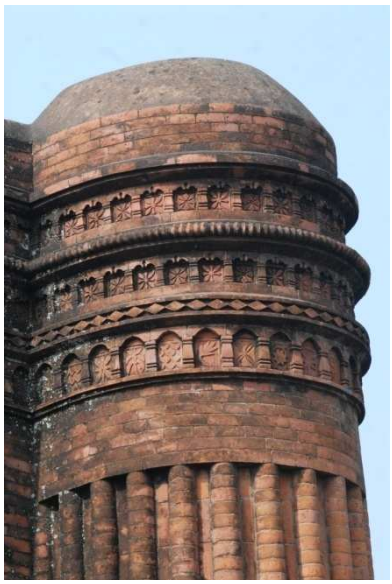

চিত্র: ৪.৪৩

মসজিদের বক্রাকার কর্ণিশের নিচে অবস্থিত তিনটি উদ্গাত ব্যান্ড মসজিদের চতুর্দিকে বেষ্টন করে রেখেছে। প্রতিটি ব্যান্ডের নিচে রয়েছে একসারি করে ক্ষুদ্র খিলান পাড়। প্রতিটি খিলান পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত। তবে কিবলা দেয়ালের ফ্রিজে পোড়ামাটির অলংকরণের পরিবর্তে টাইলস এর ব্যবহার দেখা যায়। গম্বুজটি একটি অনুচ্চ ড্রামের উপর স্থাপিত। ড্রামের চতুর্দিকে একসারি মারলন নকশা রয়েছে।

মসজিদের বাইরের দেয়ালের ফ্রিজ থেকে ভিত্তির উপর পর্যন্ত প্রতিটি ইট এক সময় সবুজ, হলুদ, সাদা নীল এই ভাবে আড়াআড়ি রেখায় রঞ্জিত ছিল। পোড়ামাটির ফলকগুলোতেও রঙের ব্যবহার দেখা যায়।

মসজিদ অভ্যন্তরেও অত্যন্ত জমকালো অলংকরণ ছিল বলে মনে হয়। প্রতিটি প্রবেশপথ, এর বাইরে অংশের ন্যায় অলংকৃত। সবচেয়ে বেশী অলংকরণ রয়েছে মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের মিহরাব অংশে। যদিও মিহরাবগুলো খুবই ক্ষতিগ্রস্থ। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত উঁচু। প্রতিটি মিহরাব খিলান একটি ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত। ফ্রেমের সবচেয়ে উপরে একসারি অলংকৃত পোড়ামাটির মারলন নকশায় সজ্জিত। এর নিচে আরও তিনসারি পাড় নকশা রয়েছে। এর মধ্যে উপরের পাড়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যানেলে বিভক্ত। প্যানেলগুলোতে টেরাকোটা ফুল ও পাতার নকশা আছে। দ্বিতীয় সারিতে পরস্পর সংযুক্ত ফিতা নকশার ভিতর নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর স্থাপিত হয়েছে ক্ষুদ্র রোজেট। তৃতীয় সারিতে রয়েছে ঝুলন্ত মালা নকশা।

চিত্র: ৪.৪৪

মূল মিহরাবের খিলানটি সম্ভবত খাঁজ খিলান রূপে নির্মিত হয়েছিল। খিলান স্তম্ভদুটি অপেক্ষাকৃত সরু। খিলানের শীর্ষে একটি বরফি আকৃতির নকশা ছিল যার আকার এখনও দৃশ্যমান। এর দুই পাশে ছিল দুটি রোজেট। খিলানের উপরের এই অংশটি একটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান নকশার মধ্যে সংযোজিত। এই অর্ধবৃত্তাকার খিলানের ভিতরের বাকি অংশে আড়াআড়িভাবে লতানো নকশার পাড় সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে স্থানটি পূর্ণ করা হয়েছে। অর্ধ বৃত্তাকার খিলান নকশার দুই পার্শ্বে দুটি চক্রবদ্ধ রোজেট রয়েছে। মিহরাবের অবতল অংশে একটি ঝুলন্ত পেনডেন্টসহ খিলান নকশা রয়েছে। মসজিদের গম্বুজ ধারণের জন্য যে আটটি বৃহৎ খিলান নির্মিত হয়েছে এই প্রতিটি খিলানের-পটহতে স্থাপন করা হয়েছে একটি করে রোজেট। গম্বুজের ভিত্তি একসারি ক্ষুদ্র প্যানেল নকশা ও

এর উপরে একসারি মারলন নকশায় সজ্জিত। প্যানেল ও মারলন উভয়ই একসময় রঞ্জিত টালি দ্বারা পূর্ণ ছিল। গম্বুজটি নির্ধারিত দূরত্বে অবস্থিত টেরাকোটা দ্বারা বিভক্ত ছিল।

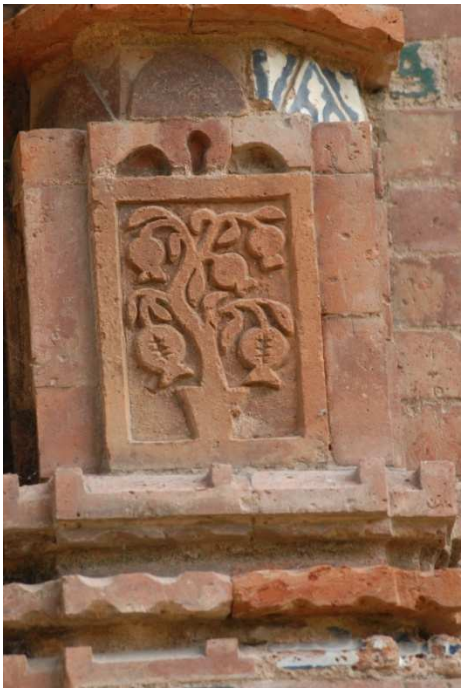

চিত্র: ৪.৪৫

রীবগুলোর ভিত্তি ফুলদানীর ন্যায় পোড়ামাটির নকশায় সজ্জিত ছিল। বর্তমানে মসজিদের বারান্দার মেঝেতে সাদা ও নীল রঙের টালির তৈরী একটি তারকা নকশা দেখা যায়। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগও এর বহির্দেয়ালের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে রঙিন ইটের বিন্যাসে সজ্জিত ছিল। এখনও এদের কিছু কিছু নিদর্শন দৃশ্যমান।

সাধারণ আলোচনা

১৮১০ সালে মেজর ফ্রাঙ্কলিন যখন গৌড় পরিদর্শন করেন তখন লট্টন মসজিদকে আরও ভাল অবস্থায় দেখেছিলেন। লট্টন মসজিদের সৌন্দর্য তাঁকে এতই মুগ্ধ করে ছিল যে তিনি তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন-

"I have not myself met with any thing superior to it for elegance of style, lightness of construction or tasteful decoration in any pant of upper Hindustan"[১]

তবে কানিংহাম তাঁর ১৮৭৯-৮০ সালের রিপোর্টে লট্টন মসজিদের ব্যাপারে ফ্রাঙ্কলিনের সাথে দ্বিমত পোষন করে বলেন-

"I freely admit that the general appearance of the building is decidedly pleasing but I dispute the lightness of construction, and deny altogether the tastefulness of the decoration."[২]

১. John Henry Ravenshaw, *Gaur: It's Ruins and Inscriptions*, London, Kegan Paul & Co., 1878, p. 32

২. Alexander Cunningham, *op.cit.*, pp 62-65

নির্মাণ কৌশল ও লট্টন মসজিদের অলংকরণে রঙের বিন্যাসকে তার নিকট যথেষ্ট মানসম্মত ও রুচিশীল বলে মনে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলক ও মিনাকার ইটের সমন্বিত ব্যবহার আদিনা মসজিদ হতে দেখা যায়। পরবর্তীতে এটা সুলতানী আমলের অন্যান্য মসজিদেও পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ ইরানে স্থাপত্য অলংকরণে রঙিন টালির ব্যবহার চৌদ্দশত হতেই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। সম্ভবত বাংলার স্থাপত্যে রঙিন টালির ব্যবহার পারসিক প্রভাবেরই ফল। তবে লট্টন মসজিদের রঞ্জিত টালির বিন্যাস একে চাকচিক্য দান করেছিল বটে তবে তা মর্জিত রুচির পরিচয় দিতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে পোড়ামাটির ফলকগুলোতে রঙের ব্যবহারের ফলে ফলকগুলো এর প্রকৃত লাল রঙের মহত্ব ও বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলে। তবে এর ফ্রিজের নীল সাদা রঙে রঞ্জিত টালির অলংকরণ বেশ রুচিশীল ও অভিজাত।

কদম রসূল

গৌড় দূর্গ প্রাচীরেরর অভ্যন্তরে, গৌড় প্রাসাদের পূর্বদিকে ইমারতটির অবস্থান। এই অসাধারণ স্থাপত্যটি সুলতানী বাংলায় এই প্রকারের স্থাপত্যেও একমাত্র নিদর্শন।[১] কদম রসূলের আক্ষরিক অর্থ রসুলের (মহানবী) পদযুগল। ইমারতের মাঝখানে মহানবীর পায়ের ছাপ বিশিষ্ট একটি প্রস্তরখন্ড সংরক্ষিত থাকায় ইমারতটি এই নামে ভূষিত। ইমারতের পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে স্থাপিত একটি শিলালিপির অনুযায়ী এটি সুলতান নসরত শাহ কতৃক ৯৩৭ হিজরী (১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে) নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

চিত্র: ৪.৪৬

সুলতানী আমালের মসজিদের আদলে তৈরী ইমারতটি উত্তর-দক্ষিণে ১৮.৩০ মিটার দৈর্ঘ্য ও পূর্ব-পশ্চিমে ১২.৫০ মিটার প্রস্থের একটি আয়তাকার ইমারত। এর চারদিকে চারটি অষ্টকোণাকার পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলোতে

১ . এ.বি.এম. হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

প্রস্তর নির্মিত গুলদস্তা (ক্ষুদ্র মিনার) রয়েছে। পূর্বদিকের প্রবেশপথ দুটি ভারী স্তম্ভ দ্বারা তিনটি খিলান সহযোগে নির্মিত। ইমারতটি একটি বর্গকার কক্ষ ও তার তিন দিকে (উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব) ৩.৬০ মিটার প্রশস্ত একটি বারান্দা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের বারান্দায় রয়েছে দুটি প্রবেশপথ। মূলকক্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকেও তিনটি দরজা নির্মিত হয়েছে। পশ্চিম দেয়াল সম্পূর্ণ বন্ধ। এর বারান্দার পেছনের বর্গাকার কক্ষটি একটি বৃহৎ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজের উপরে একটি পদ্ম সম্বলিত উচ্চ শিখর রয়েছে। বারান্দাগুলো খিলান ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। ইমারতের কার্নিশ সুলতানী বাংলার অন্যান্য স্থাপত্যের ন্যায় বক্রাকারে নির্মিত। এর দেয়ালগুলো পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ।

অলংকরণ

কদম রসূলের পূর্ব দিকের দেয়ালটি সবচেয়ে বেশী অলংকৃত ও পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ। ইমারতের তিন খিলান প্রবেশপথটি দুটি বহুপার্শ্ব বিশিষ্ট খর্বাকৃতির পাথরের স্তম্ভ ও দুটি সংলগ্ন স্তম্ভ দ্বারা সমর্থিত। খিলানগুলো দ্বিকেন্দ্রীক ও সুঁচালো। প্রতিটি খিলান কিছুটা অন্তর্নিবিষ্ট প্যানেলের মধ্যে স্থাপিত। খিলানের প্রান্তরেখা ধরে একসারি ক্ষুদ্র রোজেট নকশা উৎকীর্ণ হয়েছে। খিলানশীর্ষে রয়েছে একটি শীর্ষদন্ড। খিলান স্প্যানড্রিলে দুটি রোজেট নকশা দেখা যায়। খিলান প্যানেলের উপরের দিকে তিনটি উদ্গাত ব্যান্ড রয়েছে। ব্যান্ডগুলো লজেন্স নকশায় সজ্জিত। সবশেষ ব্যান্ডের নীচে একসারি আঙ্গুর ঝোপা ও টারসেলে নকশার ধারাবাহিক বিন্যাসে সৃষ্ট পাড় রয়েছে, নিচের দুটি ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অংশে জালি নকশা ও তৃতীয় ব্যান্ডের উপরে একসারি পাঁচ-খাঁজ বিশিষ্ট পত্রের সারির পাড় নকশা দেখা যায়। ইমারতে বাকি তিনদিকে উন্নত ও অবনত দেয়াল বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি অন্তর্নিবিষ্ট দেয়ালের ভিত্তি অংশে তিনটি মোল্ডিং, মাঝ বরাবর একটি ও এর উপর আর একটি মোল্ডিং রয়েছে। ভিত্তির মোল্ডিংগুলোর উপরে একসারি মারলন নকশা রয়েছে। দেয়ালে উদ্গাত অংশ অলংকরণ বিহীন। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশ খিলান দুটি ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ ও উপরে একসারি স্টাইলাইজড (stylized) মারলন নকশায় সজ্জিত।

চিত্র: ৪.৪৭

ইমারতের পার্শ্ব বুরুজগুলো অষ্টকোণাকার। বুরুজগুলোর ভিত্তিতে তিনটি উদ্গাত মোল্ডিং রয়েছে। মোল্ডিংগুলো লজেন্স নকশা সজ্জিত। সবচেয়ে উপরের মোল্ডিংটির উপরের অংশে একসারি স্টাইলাইজড মারলন নকশা দেখা

যায়। এর নিচের তিনটি ব্যান্ডের নিচের তিনসারিতে রয়েছে লতা, ফুল ও জ্যামিতিক নকশার মিশ্রণে সৃষ্ট পাড় নকশা। বুরুজটিকে ভিত্তির উপর হতে ফ্রিজ পর্যন্ত দুটি ব্যান্ড দ্বারা তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অংশের প্রতিটি পার্শ্বে একটি করে আয়তকার প্যানেলে এর পূর্ব দেয়ালের প্যানেল অলংকরণটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে। শুধুমাত্র প্যানেল ফ্রেমটি এখানে অনুপস্থিত। ব্যান্ডগুলোর উপরে ও নীচে পাঁচ-খাঁজ বিশিষ্ট পত্র নকশা রয়েছে। মাঝখানের স্তম্ভ দুটি উপরে দুটি অলংকৃত প্যানেল নকশা রয়েছে। আয়তকার প্যানেলটি একটি প্যাঁচানো লতার পাড় দ্বারা আবদ্ধ। প্যাঁচানো লতার মধ্যে ফুল নকশা দেখা যায়। ফ্রেমের মধ্যে রয়েছে খাঁজ-খিলান নকশা যার শীর্ষ হতে একটি লতায় ঝোলানো পেনডেন্ট নকশা রয়েছে। খিলান স্প্যানড্রিলে প্যাঁচানো লতার মধ্যে স্থাপিত রোজেট নকশা রয়েছে। প্যানেলটির উপরে ও নিচে দুই সারি খোপ নকশা মধ্যে ঝুলন্ত পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায়। সবচেয়ে উপরে রয়েছে একটি উদ্গাত ব্যান্ড ও পাঁচ-খাঁজ বিশিষ্ট পত্রের পাড় নকশা ।

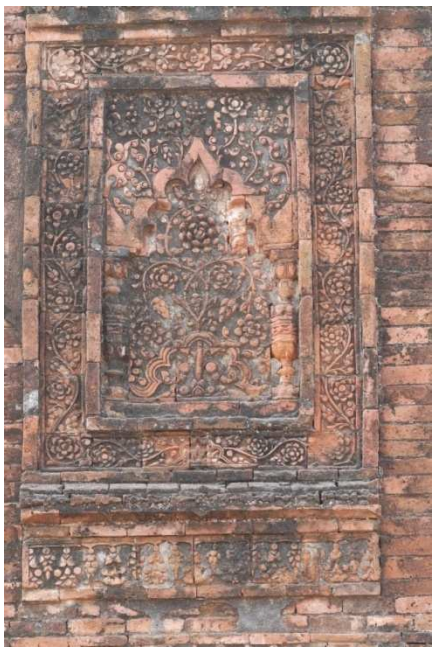

চিত্র: ৪.৪৮

ইমারতটি পার্শ্ববুরুজসহ চার দেয়ালে একটি আড়াআড়ি উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। ব্যান্ডেটির উপরে ও নীচে সারিবদ্ধ পাঁচ-খাঁজ বিশিষ্ট পত্র নকশার পাড় দ্বারা সজ্জিত। পূর্ব দেয়ালে তিন খিলান অংশের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ প্যানেল নকশা রয়েছে। দেয়ালের প্রত্যেক দিকে ব্যান্ডের উপরের অংশে দুই সারিতে মোট বারটি ও নিচের অংশে দুই সারিতে দশটি প্যানেল আছে। প্রত্যেকটি প্যানেল বিভিন্ন লতা, জালি, ফুল নকশার পাড় দ্বারা আবদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে একটি খিলান-নকশা যার শীর্ষ হতে ঝুলন্ত ফুলের লতাটি একটি স্টাইলাইজড পেনডেন্ট শোভিত। খিলান স্প্যানড্রিলে লতানো নকশা দেখা যায়। ইমারতের বক্র কার্নিশের নিচে দুটি উদ্গাত মোল্ডিং

রয়েছে। মোল্ডিংগুলোর উপরে, নীচে ও মাঝখানে মোট তিনসারি পোড়ামাটির পাড় নকশা দেখা যায়। উপরের দুই সারিতে চারপত্র বিশিষ্ট ফুলের জালি নকশা ও নিচের সারিতে ঝুলন্ত লতা ও ফুলের নকশার কারুকাজ রয়েছে। ইমারতের অভ্যন্তরীণ কক্ষটির তিনদিকের দরজা উদ্গাত ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। দ্বিকেন্দ্রীক খিলানের স্প্যানড্রিলে দুটি রোজেট ও শীর্ষে একটি লতা নকশা রয়েছে। খিলান স্প্যানড্রিলের পাশ ঘেঁষে স্টাইলাইজড লতার পার্শ্ব নকশা রয়েছে। এর একটু উপরে দুই সারি ঝুলন্ত ও ফুলের পাড় নকশা দেখা যায়।

সাধারণ আলোচনা

বাংলার স্থাপত্যে কদম রসূলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কদম রসূলের ফাসাদ ব্যবস্থাপনা এসময়ের মসজিদ ও মন্দির উভয় স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল। এখানকার ফাসাদের খিলানে ব্যবহৃত স্তম্ভের বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তিকালে বহুদিন পর্যন্ত মন্দির স্থাপত্যে অনুসৃত হয়েছে।

ঝন-ঝনিয়া/জাহানিয়ান মসজিদ

গৌড়ের সাগর দীঘির উত্তর পশ্চিমে আঁখি সিরাজউদ্দীন এর সমাধির কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত ঝন-ঝনিয়া মসজিদটি আলাউদ্দীন হোসেন শাহর পুত্র গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহর রাজত্বকালে বিবি মত্তি কর্তৃক ৯৪১ হিজরী /১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত। এটি গৌড়ে সুলতানী আমালে নির্মিত প্রাপ্ত ইমারতগুলোর মধ্যে সর্বশেষ। ঝন-ঝনিয়া নামটি স্থানীয়ভাবে প্রচলিত।

চিত্র: ৪.৪৯

রেভেন'শ একে 'জান-জান মিঞা মসজিদ' নামে বর্ণনা করেছিলেন।[১] অপর দিকে আবিদ আলী খাঁনের ধারনা এটি মহান দরবেশ জাহানিয়া জাহানগস্তের নামেরই বিকৃত উচ্চারণ।[১] ইটের তৈরী মসজিদটির বাইরের দিকের পরিমাপ

১. Ravenshaw, *op.cit.*, p. 10

১৭.০৬ মিটার × ১২.৮০ মিটার এবং অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ১২.২০ মিটার × ৮০ মিটার। মসজিদের চারকোণে চারটি পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো উপরে রয়েছে চারটি ইট নির্মিত শিখর বা গুলদস্তা। এর পূর্ব দেয়ালে প্রবেশপথের সংখ্যা তিনটি, উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। এর কার্নিশ সুলতানী আমলের বক্রতা সমৃদ্ধ। মসজিদের অভ্যন্তর দুটি আড়াআড়ি আইলে ও তিনটি উল্লম্ব বে'তে বিভক্ত। দুটি পাথরের স্তম্ভ দ্বারা অভ্যন্তরীণ অংশটি এভাবে ছয়টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বর্গের উপরে নির্মিত হয়েছে একটি করে মোট ছয়টি গম্বুজ। গম্বুজগুলোর শীর্ষ পদ্ম শোভিত ও উঁচু শিখর যুক্ত। মসজিদের ভেতর ও বাহির টেরাকোটার ভারী অলংকরণে সমৃদ্ধ।

অলংকরণ

মসজিদের বাইরের দেয়ালে তিনটি উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা চারটি ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগ একই মাপের সারিবদ্ধ প্যানেলে পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত। ব্যান্ডগুলোর সজ্জায় টেরাকোটা লজেন্স নকশার পাড় ব্যবহার করা হয়েছে।। এদের উপরে ও নীচে রয়েছে মারলন নকশার পাড়। দেয়ালের সারিবদ্ধ প্রতিটি প্যানেলে বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলানের মধ্যে ঝুলন্ত পেনডেন্ট নকশায় সজ্জিত। মসজিদের প্রবেশপথগুলো কিছুটা অন্তর্নিবিষ্ট দেয়ালে স্থাপিত। প্রবেশ-খিলানগুলোর দুই পাশের প্যানড্রিলে চক্রবদ্ধ রোজেট রয়েছে। খিলানশীর্ষ শিখর নকশা দ্বারা সজ্জিত।

মসজিদের পার্শ্ববুরুজগুলো অষ্টকোণাকার। বহির্দেয়ালের সাথে সঙ্গতি রেখে বুরুজের দেয়ালও তিনটি ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত। বুরুজের প্রতিটি পার্শ্বে ও তিন সারিতে দেয়ালের অনুরূপ টেরাকোটা প্যানেল নকশা রয়েছে। বুরুজের ভিত্তি অংশে রয়েছে তিনটি ব্যান্ড, এদের মধ্যবর্তী অংশ পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত। ব্যান্ডগুলোর সবচেয়ে উপরেরটি মসজিদ দেয়ালের ব্যান্ডের সাথে সংযুক্ত। উপর ও নীচের সারিতে রয়েছে জালি নকশার পাড়। মাঝখানের সারিতে রোজেট ও চারপত্রে ফুলের ধারাবাহিক নকশার পাড়।

মসজিদের কার্নিশ তিনটি ব্যান্ডে বিভক্ত। ব্যান্ডগুলো লজেন্স পাড় নকশায় সজ্জিত। সবচেয়ে উপরের দুটি ব্যান্ডের মাঝখানে রয়েছে জালি নকশা, দ্বিতীয় ব্যান্ডের নীচের সারিতে সংযুক্ত রোজেটের একটি পাড় ও তৃতীয় সারিতে ত্রিকোণাকার ফল ও ঘন্টার ধারাবাহিক নকশা।

মসজিদের কিবলা দেয়ালে অবস্থিত তিনটি মিহরাব পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ। মিহরাবগুলো একটি বৃহৎ আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে স্থাপিত। প্যানেলগুলো দুটি ফ্রেমদ্বারা আবদ্ধ। ভেতরের ফ্রেমটি জালি নকশায়

---

২. Abid Ali Khan, *op.cit.*, p. 92

সজ্জিত। বাইরের ফ্রেমে প্যাঁচানো লতার মধ্যে রয়েছে প্রস্ফুটিত ফুল নকশা। ফ্রেমের উপরের বাহুতে স্থাপিত হয়েছে তিনটি চক্রাবদ্ধ রোজেট । এর উপরে একসারি ঝুলন্ত লতা ও টারসেলের ধারাবাহিক নকশার পাড়ে সজ্জিত। পাড়ের উপরে দুটি উদ্গাত ব্যান্ড নকশা রয়েছে যাদের মধ্যবর্তী অংশে জালি নকশা দেখা যায়। ব্যান্ডগুলোর উপরের অংশ ক্ষুদ্র খিলান নকশার পাড়ে সজ্জিত। মিহরাব খিলানগুলো দুটি অষ্টকোণাকার স্তম্ভের উপর নির্মিত। স্তম্ভগুলো ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত। ব্যান্ডগুলোর মধ্যবর্তী অংশে স্তম্গাত্র ঝুলন্ত লতা ও ফলের নকশায় সজ্জিত। স্তম্ভের ভিত্তিতে আয়তাকার প্যানেলে উদ্ভিজ্জ নকশা দেখা যায়। মিহরাবের স্প্যানড্রিলের দুই পাশে প্যাঁচানো লতার মধ্যে চক্রবদ্ধ রোজেট নকশা রয়েছে। এর একটু উপরে একসারি ফল ও পাতার ঝুলন্ত নকশা দেখা যায়। মিহরাবের অবতল অংশ একটি উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা উল্লম্বভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগ আয়তাকার অলংকৃত প্যানেলের সারি দ্বারা পরিপূর্ণ। প্যানেলগুলোতে অলংকৃত খিলনের মধ্যে ঝুলন্ত পেনডেন্টের একই ধরনের নকশার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। খিলান স্প্যানড্রিলগুলো ফুল ও লতায় সজ্জিত।

মসজিদের গম্বুজের ভারবহনকারী খিলানগুলোর স্প্যানড্রিলে স্থাপিত হয়েছে রোজেট নকশা । এর উপরে একসারি ঝুলন্ত লতা ও ফলের ধারাবাহিক নকশা রয়েছে। গম্বুজের ভেতরে চক্রাকারে নির্মিত একটি উদ্গাত ব্যান্ডের উপরে এখানে মারলন নকশা দেখা যায়।

সাধারণ আলোচনা

ঝন-ঝনিয়া/ জাহানিয়া মসজিদের অলংকরণ বাংলায় মুসলিম পোড়ামাটির অলংকরণের অবক্ষয়ে পর্যায়ের একটি উদাহরণ। হোসেন শাহী শাসনামলের মুসলিম আমলে বিকাশিত পোড়ামাটির অলংকরণ কিভাবে তার স্বকীয়তা হারিয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। জাহানিয়া মসজিদের একই ধরনের অলংকরণের পুনারাবৃত্তি ও অর্থহীন উপস্থাপনা স্থাপত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির বদলে একে একঘেয়ে ও অতিরঞ্জনে পরিণত করেছে। স্থাপত্যের ভাবগাম্ভীর্য হানীতেও এই ধরনের অতিরঞ্জন ও পুনরাবৃত্তি যথেষ্টভাবে দায়ী ছিল। মসজিদের দেয়ালের একাধিক ব্যান্ডর ব্যবহার সেই সাথে কার্নিশ ও ব্যান্ডের বক্রতায় পূর্ববর্তী স্থাপত্যের সরল ও নান্দনিক গতিময়তার অনুপস্থিতি একে যান্ত্রিক ও রুচিহীন প্রকাশে পরিণত করেছে। সর্বপরি ফ্রেমবিহীন অন্তর্নিবিষ্ট প্রবেশখিলানগুলো সাধারণের দৃষ্টি আর্কষণে ব্যর্থ হয়েছে।

বাঘা মসজিদ

পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ স্থাপত্যের মধ্যে রাজশাহীর বাঘা মসজিদটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। রাজশাহী শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত বাঘা সুলতানি আমলের একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বর্তমানে বাঘায় অবস্থিত প্রাচীন মসজিদটি সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ কর্তৃক নির্মিত। মসজিদে প্রাপ্ত একটি

শিলালিপি হতে জানা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহ এর পুত্র নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ উক্ত মসজিদটি ৯৩০ হিজরী তথা ১৫২৩-২৪ সালে নির্মাণ করেন।[১] ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মসজিদটির সকল গম্বুজ ও পূর্ব দিকের দেওয়াল সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে পড়েছিল।[২] ১৯০৭ সালে মসজিদটিকে সংরক্ষিত ইমারত হিসাবে ঘোষনা করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর সংস্কার করে।[৩] বাংলাদেশে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত দুটি মসজিদের মধ্যে বাঘা একটি ।[৪]

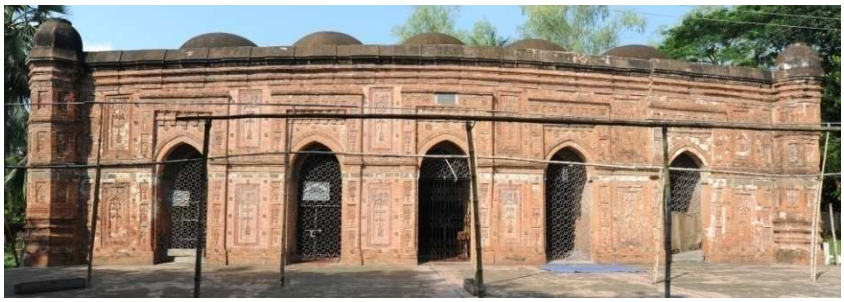

চিত্র: ৪.৫০

দশ গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার এই মসজিদটি একটি উচ্চ ভূমির পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। চারপাশের অঙ্গনসহ মসজিদটি একটি অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অঙ্গনসহ মসজিদটি প্রায় ১৬০ ফুট বর্গ। মসজিদ অঙ্গনে প্রবেশের জন্য এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সিঁড়ি যুক্ত দুটি প্রবেশপথ রয়েছে। দক্ষিণের প্রবেশপথটি অনুষ্ঠানিকভাবে তৈরী। এই প্রবেশ পথের চার দিকে রয়েছে চারটি অষ্টকোনাকৃতির পার্শ্বস্তম্ভ। খিলান ভিত্তিক এই প্রবেশপথের ছাদে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র গম্বুজ। এর পার্শ্ব-দেয়ালসমূহ পোড়ামাটির অলংকরণে শোভিত।

মসজিদের উচ্চভূমির সন্নিকটে পূর্ব দিকে ৪০০ x ২০০ গজ আয়তনের একটি দীঘি রয়েছে। মূল মসজিদটির আয়তন বাইরের দিকে ২৬.৩৬ মি. x ১২.৮৬ মি.। এর চারকোণে রয়েছে চারটি অষ্টকোনাকৃতির পার্শ্ববুরুজ। বুরুজগুলোর ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদের পূর্ব দেওয়ালে রয়েছে পাঁচটি দ্বিকেন্দ্রীক খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে দুটি করে মোট চারটি খিলান রয়েছে তবে এগুলো বদ্ধভাবে নির্মিত। এর পশ্চিমের কিবলা দেওয়ালের কেন্দ্রীয় অংশটি কিছুটা উদ্গাতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। কর্নিশে সুলতানী মসজিদ স্থাপত্যের বক্রতা সহজেই চোখে পড়ে। মসজিদের অভ্যন্তরভাগ চারটি প্রস্তরস্তম্ভ দ্বারা দুই বে' ও

১. Shansud-din-Ahmed, *Inscriptions of Bengal*, Rajshahi,Varendra Research Museum, 1960, pp. 213; Abdul Karim, *op. cit.*, p . 334-335
২. Shamsud-din-Ahmed, *Ibid.*
৩. Nazimuddin Ahmed (ed.), *Bangladesh Archaeology*, no.-1(1979), Dacca,The Department of Archaeology and Museum, GOB, 1979, p. 102
৪. Perween Hasan, *Sultans and Mosques: The Early Muslim Architecture of Bangladesh*, New York, I.B. Tauris, 2008, p.161

দশটি আইলে বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ দেওয়ালে আরও বারটি প্রস্তরস্তম্ভ সংলগ্নাকারে স্থাপন করা হয়েছে। দক্ষিণ থেকে চতুর্থটি ছাড়া প্রতিটি খিলান-পথ বরাবর এর পশ্চিম দেওয়ালে নির্মিত হয়েছে চারটি মিহরাব। চতুর্থ মিহরাবের জায়গাটিতে সম্ভবত আগে মিম্বারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল । পশ্চিম দেওয়ালের সর্বোত্তরের মিহরাবটি ক্ষুদ্রাকারে দেওয়ালের উর্ধ্বাংশে নির্মিত। এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, এই স্থানে এক সময় একটি মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল যা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। মসজিদের উত্তর দিকে কোন উন্মুক্ত খিলান না থাকায় আরও অনুমান করা যায় যে, এই মঞ্চে উপবেশনের জন্য মসজিদের ভেতরে কোন সোপানের ব্যবস্থা ছিল। যে ধরনের সোপানশ্রেনী কুসুম্বা মসজিদে পরিলক্ষিত হয় সম্ভবত এখানেও একই ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। সমগ্র মসজিদটি পান্দানতিভ (pendentive) সমর্থিত দশটি অর্ধগোলাকার গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত।

২.২৩ মিটার পুরু দেওয়াল বিশিষ্ট এই মসজিদ নির্মাণে ভিত্তি ও মাঝ-দেওয়াল বরাবর এক প্রস্থ প্রস্তরস্তর ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাকি অংশ ইটের তৈরী। মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপরে একটি প্রস্তর ফলকে যে লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে তাতে মসজিদের নির্মাতার নাম নাসির-আল-দুনিয়া-আদ-দীন নসরত শাহ এবং এর নির্মাণকাল ৯৩০ হিজরী উল্লেখিত হয়েছে ।

অলংকরণ

বহির গাত্রের অলংকরণ **:** ইট নির্মিত মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে পোড়ামাটির অলংকৃত ফলকে আবৃত। এর বাইরের দিকে পূর্ব দেওয়াল কর্নিশ হতে দরজার ফ্রেম পর্যন্ত পঁয়ত্রিশটি অগভীর, উলম্ব, উন্নত ও অবনত অংশে বিভক্ত। মসজিদের কর্নিশের ঠিক নীচে কিছুটা বিরতি দিয়ে দুটি আড়াআড়ি ব্যান্ড রয়েছে। এই ব্রান্ডদ্বয়ের উপরে ও মাঝের অবনত অংশে দু'সারি ইটের খোদাই নকশা দেখা যায়। উপর থেকে দ্বিতীয় ব্যন্ডটি এক সারি বরফি সদৃশ অলংকরণে সজ্জিত। দ্বিতীয় ব্যান্ডটির ঠিক নীচে পোড়ামাটির ফলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা দ্বারা গলার হার সদৃশ নকশার সৃষ্টি করা হয়েছে যা সারিবদ্ধভাবে একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত অবস্থায় উপস্থাপিত হয়েছে। কর্ণিশ থেকে সংযুক্ত হার নকশা পর্যন্ত সমগ্র অলংকরণটি শুধু পূর্ব দেওয়ালে নয় বরং মসজিদের উর্দ্ধাংশের চতুর্দিকের পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব দেওয়ালের প্রতিটি খিলান-পথ একটি করে ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। প্রতিটি ফ্রেমের দুই পাশ আয়তাকার ও উপরের অংশ বর্গাকার প্যানেলে বিভক্ত করা হয়েছে। দুই পাশের প্যানেলগুলোতে পাঁচ-খাঁজ বিশিষ্ট খিলানের মধ্যে একটি ঝুলন্ত কানের দুলের ন্যায় গহনা সদৃশ্য মোটিফ উপস্থাপিত হয়েছে। খাঁজ খিলান নকশার ঠিক উপরের স্থানটি ফুল ও লতা সদৃশ মোটিফ দ্বারা পূর্ণ । প্রবেশ খিলান এর উপরের বর্গাকার প্যানেলগুলো ধারাবাহিক ভাবে রোজেট ও বহু খাঁজ খিলানের মধ্যে ঝুলন্ত দুল নকশায় সজ্জিত। ফ্রেমসমূহের একেবারে উপরের অংশে রয়েছে এক সারি পাঁচ

খাঁজ বিশিষ্ট পত্র-নকশা। খিলান ফ্রেমের চারিদিকে নির্ধারিত দূরত্বে স্থাপন করা হয়েছে একটি করে রোজেট। খিলানগুলোর স্প্যান্ড্রিলে রোজেট মোটিফ ও খিলান শীর্ষে চাঁদ-তারা বা বিমূর্ত উদ্ভিজ্জ্য নকশার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এর ঠিক উপরে খিলান ফ্রেম পর্যন্ত বিস্তৃত অংশটি চতুস্কোনাকার সংলগ্ন স্তম্ভের ন্যায় পাঁচটি উদ্গাত অংশ দ্বারা বিভক্ত। এর মাঝামাঝি একটি উদ্গাত ব্যান্ড স্তম্ভসহ সমগ্র স্থানাটকে আড়াআড়িভাবে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। ব্যান্ডের উপরে ও নীচের অবনত অংশে একসারি করে ইটের খোদাইকৃত ফুলের নকশা ও ঝুলন্ত নকশা স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: ৪.৫১

চিত্র: ৪.৫২

মসজিদটির মাঝ দেয়াল বরাবর প্রস্তর স্তরটির ঠিক উপরে খিলানের বক্রতা প্রাপ্তির উচ্চতায় এটি উদ্গাত ব্যান্ড নকশা স্তম্ভসহ মসজিদের চতুর্দিক ঘুরে এসেছে। এই ব্যান্ডের উপরে ও নীচে দুই সারি পাঁচ-খাঁজ বিশিষ্ট পাতার অলংকরণ ব্যান্ডটিকে আরও দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে। দুটি খিলান পথের মধ্যবর্তী অংশে উলম্ব ভাবে দুটি বৃহৎ আয়তাকার প্যানেলে সাত-খাঁজ বিশিষ্ট খিলানের ভেতর দুল বা টিকলি সদৃশ্য ঝুলন্ত মোটিফ এর অলংকরণ দেখা যায়। খাঁজ খিলানের প্রতিটি খাঁজ হতে উত্থিত হয়েছে একটি করে পদ্ম কলি। খিলানশীর্ষের দু'পাশে রয়েছে দুটি রোজেট। সমগ্র প্যনেলটি ইটের খোদাই নকশার ফ্রেমে আবদ্ধ। এর চারধারে নির্ধারিত দূরুত্বে রয়েছে একটি করে রোজেট। মসজিদ ফাসাদের সর্বোত্তর ও সর্বোদক্ষিণে উল্লম্ব রেখায় ছয়টি প্যানেলে খিলানের ভেতর ঝুলন্ত নকশার অলংকরণ সংযুক্ত হয়েছে।

মসজিদের পশ্চিম দেয়াল উপর থেকে নীচ পর্যন্ত কতগুলো অগভীর উল্লম্ব, উন্নত ও অবনত অংশে বিভক্ত। প্রতিটি উন্নত ও অবনত অংশে রয়েছে দুটি করে উল্লম্ব প্যানেল । প্যানেলগুলোতে খিলানের ভেতর ঝুলন্ত নকশার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবের অংশটি কিছুটা উদ্গাত ভাবে নির্মিত। দেওয়ালের এই

অংশটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য এর দুই প্রান্তে কিছুটা অন্তর্নিবিষ্ট আকারে স্থাপন করা হয়েছে দুটি চতুস্কোনাকার স্তম্ভ। এদের নিম্নাংশে তিনটি উদ্গাত মোল্ডিং দ্বারা বিশেষায়িত করা হয়েছে। মোল্ডিংগুলোর মধ্যবর্তী অবতলাংশ ইটের খোদাই নকশায় অলংকৃত। প্রতিটি স্তম্ভের দৃশ্যমান অংশগুলো ছয়টি আয়তাকার প্যানেলে বিভক্ত করে তাতে খিলান অন্তঃস্থিত ঝুলানো নকশার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালের অলংকরণ পূর্ব দেওয়ালের অনুরূপ তবে এই অংশের বদ্ধ খিলানগুলোতে আয়তাকার প্যানেল তৈরী করে পোড়ামাটির ফলক দ্বারা ক্ষুদ্র পাতার আকৃতির জালি নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্যানেলটির চারদিকে খোদাই ইটের পাড় রয়েছে। পাড়গুলো প্রত্যেক বাহুর মাঝামাঝি স্থানে একটি বর্গাকার প্যানেলে সংস্থাপিত হয়েছে একটি রোজেট। এর অষ্টকোনাকার পার্শ্ব বুরুজগুলো ড্যাডোর উপরিভাগে তিনটি উদ্গাত ব্যান্ড পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যবর্তী অংশে পোড়ামাটির ফলকে লতানো নকশা ও ফুলের নকশা পরিলক্ষিত হয়। ব্যান্ডগুলোও ক্ষুদ্র ফুল ও জ্যমিতিক নকশায় সজ্জিত। ব্যান্ডগুলোর উপরে একসারি পাড় নকশা স্তম্ভগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই পাড় নকশা হতে ফ্রিজ পর্যন্ত বিস্তৃত স্তম্ভগাত্র আরও দুটি ব্যান্ড দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি অংশের প্রতি দিকে একটি করে আয়তাকার প্যানেলে খিলান অন্তঃস্থিত ঝুলন্ত নকশা রয়েছে।

চিত্র: ৪.৫৩

চিত্র: ৪.৫৪

অভ্যন্তরীণ অলংকরণ: মসজিদের অভ্যন্তরভাগে অলংকরণ মূলতঃ এর পশ্চিম দেয়ালের মিহরাবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এর দক্ষিণ হতে তিনটি মিহরাব সমান উচ্চতা সম্পন্ন ও পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক দ্বারা সজ্জিত। মিহরাবগুলো দুটি ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। মিহরাবের দুটি অষ্টকোণাকার স্তম্ভের উপর নয়-খাঁজ বিশিষ্ট সূঁচালোভাবে নির্মিত। স্তম্ভগুলোর ভিত্তি চতুস্কোণাকার । এর উপরে প্রতি বাহুর মাঝখানের অংশটি কিছুটা বর্ধিত করে স্তম্ভ ভিত্তিকে ত্রিরথ পরিকল্পনার অনুরূপ করে নির্মাণ করা হয়েছে। এর উপরে রয়েছে এর অষ্টকোনাকার গাত্র

বা shaft । স্তম্ভের নিম্নাংশে খোদাই ইটের নকশা ও খিলানাকৃতির প্যানেলে ফুল ও ফল সম্বলিত বৃক্ষের চিত্র পোড়ামাটির ফলকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফলকগুলোর শীর্ষ পদ্মকলি বা ত্রিকোনাকার নকশায় শোভিত। স্তম্ভগাত্রের মাঝামাঝি একটি উদ্গাত ব্যান্ড রয়েছে। এর উপরে একসারি পোড়ামাটির পুঁতি বা মতি নকশা ও এর দুই পার্শ্বে এরসারি পদ্মকলির নকশা দেখা যায়। স্তম্ভ শীর্ষের ঠিক নীচে পরস্পর সংযুক্ত মতির হারের ন্যায় একসারি নকশা রয়েছে। এই নকশা থেকে নীচের দিকে শিকল দ্বারা ঝুলানো ঝুমকার ন্যায় এক ধরনের নকশা সংযুক্ত হয়েছে। স্তম্ভশীর্ষটি শিরাল ও পদ্মকলির সমন্বয়ে অনেকটা অলংকৃত অমলক সদৃশ্য করে নির্মাণ করা হয়েছে। খিলানের উপরিভাগের প্যানেলে দুটি রোজেট এবং এর চারদিক ফুল ও কলি যুক্ত লতানো নকশায় অলংকৃত। প্যানেলের উপরিভাগে পাঁচটি স্বল্প উচ্চ উদ্গাত অংশ রয়েছে। সমগ্র খিলানটি একটি লতানো পাড় দ্বারা আবদ্ধ। পাড়ের তিন বাহুতে রয়েছে তিনটি করে বর্গাকার প্যানেলে আবদ্ধ রোজেট। পাড় যুক্ত এই ফ্রেমের দুই পাশে পাঁচটি করে আয়তাকার উল্লম্ব প্যানেল রয়েছে। প্যানেলগুলোতে ক্ষুদ্রাকার খিলানের মধ্যভাগ বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফলের গাছ , বিভিন্ন নকশা ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ। এর মধ্যে বেশকিছু দেশজ ফুল ও ফল রয়েছে যেমন আম, বেল, ডালিম, গোলাপ, গাঁদা ইত্যাদি। উল্লম্ব প্যানেল দুটির উপরে একটি আড়াআড়ি প্যানেলে রোজেট নকশা ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র প্যানেলের উপরিভাগ দুটি পাড় নকশা দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে।

চিত্র: ৪.৫৫

মিহরাব খিলানের অবতল অংশে নীচে ও উপরে তিন সারি করে পাড় নকশা দিয়ে এর মাঝের অংশটি ইটের খোদাই নকশার পাড় দিয়ে ছয়টি বর্গাকার প্যানেলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি বর্গ ক্ষুদ্রাকার খিলান নকশা ও

এর ভিতর ঝুলন্ত গহনার নকশা দ্বারা অলংকৃত। দক্ষিণ হতে তিনটি মিহরাবের মধ্যে দ্বিতীয় মিহরাবটি অধিক জাঁকজমকপূর্ণ। মসজিদের চতুর্থ মিহরাবটি এর পঞ্চম খিলান পথ বরাবর অবস্থিত। দেওয়ালের উপরের অংশে নির্মিত এই মিহরাবটি অন্যান্য মিহরাব থেকে আকারে ছোট। এই মিহরাবটি একটি ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ এবং মিহরাব খিলানের অবতল অংশে একসারি বর্গাকার প্যানেল রয়েছে । তবে অলংকরণের বিষয়বস্তু একই। মসজিদ অভ্যন্তরে মিহরাব ছাড়া গম্বুজের নিম্নাংশে দুইসারি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ পাড় নকশা দেখা যায়। পাড় অলংকরণে পাঁচ-খাঁজ বিশিষ্ট পাতা নকশা ব্যবহার করা হয়েছে।

সাধারণ আলোচনা

বাঘা মসজিদের অলংকরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মসজিদ অলংকরণে খোদিত ইট ও ফলক ভিত্তিক পোড়ামাটির নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। এটি হোসেন শাহী শাসনামলে নির্মিত পোড়ামাটি চিত্রফলক অলংকৃত মসজিদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। মসজিদের বাইরের চার দেওয়ালই নীচ থেকে কর্নিশ পর্যন্ত পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত। অলংকরণের বিষযবস্তুর ক্ষেত্রে বৈচিত্র খুব বেশী না। মসজিদের বহির্গাত্রে অধিকাংশ স্থানে ঝুলন্ত নকশার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে দেখা যায়। সুলতানী আমলে নির্মিত বাংলার প্রায় সকল মসজিদসহ, সমাধি ও তোরণ স্থাপত্যে এই বিশেষ অলংকরণটি সংযোজিত হয়েছে। আদিনা মসজিদে ঝুলন্ত মোটিফটি প্রদীপদান বা চক্রাকার পদ্ম এর রূপ পরিগ্রহ করলেও পরবর্তিকালে মোটিফটি বিভিন্ন উপসর্গ সংযোজন ও বিয়োজনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে হোসেনশাহী শাসনামলে তা গহনার রূপ পরিগ্রহ করে।[১] বাঘা মসজিদে এসে শিকলের স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের সারি ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদ গাত্রে নকশাটির এই বিশেষ উপস্থাপন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এর সময় কাল পর্যন্ত চর্চিত হয়েছে। আলোচিত বাঘা মসজিদে নকশাটির ব্যবহার সাধারণ চর্চা থেকে ব্যতিক্রমী। এখানে নকশাটির যে ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার উদাহরণ কেবলমাত্র হোসেন শাহ এর শাসনামলে নির্মিত ছোট সোনা মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের ফ্রেম অলংকরনে পাওয়া যায়। বাঘা মসজিদে খিলানের ভিতর ঝুলন্ত গহনা নকশার পৌনঃপুনিক ব্যবহার একঘেয়েমীর সৃষ্টি করলেও পরবর্তী স্থাপত্যসমূহ অলংকরণে বিশেষভাবে এই ধারাটিই অনুসৃত হয়েছে।

পোড়ামাটির ফলকে অলংকৃত মিহরাবের মধ্যে বাঘা মসজিদের মিহরাবটি সম্ভবত সুন্দরতম। দুই স্তর ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ বাঘা মসজিদের মিহরাবের বাইরের দিকের ফ্রেমটির দুই পাশে পাঁচটি উল্লম্ব প্যানেল রয়েছে । প্রতিটি প্যানেলের মধ্যে বিভিন্ন দেশজ ফল ও ফুলের গাছ খিলানের মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে যা মসজিদ অলংকরনে এক

১. Perween Hasan, *op.cit.*, p.162

নতুন মাত্রা যুক্ত করে। এ সব ফল ও ফুলের মধ্যে আম, ডালিম, বেল ও গোলাপ গাছ সহজে চিহ্নিত করা যায় । খিলান স্প্যান্ড্রিলে পাত্র হতে উত্থিত পুস্পিত লতানো বৃক্ষের অলংকরণ পারস্য শিল্প কলা হতে মুসলিম শিল্পকলায় প্রবেশ করেছে । জেরুজালেমে অবস্থিত কুব্বাতুস-সাখরায় এই নকশা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই নকশাটি উর্বরতার প্রতীক হিসাবে পারস্য শিল্পকলায় সমাদৃত হত। ভারতীয় শিল্পকলায় এটি জীবনী শক্তির প্রতিক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। খিলানশীর্ষের দুই পাশে রয়েছে দুটি চক্রাকার রোজেট। খিলানের স্প্যানড্রিলের পুস্পিত লতা ও এর উভয় পার্শ্বে রোজেটের বা চক্র নকশার ব্যবহার মধ্য এশিয়ার মুসলিম স্থাপত্যে বহুল চর্চিত বিষয়। ভারতের মুসলিম স্থাপত্যে আজমিরের 'আড়াই দিনকা ঝোপড়া' মসজিদের ফাসাদের খিলান পর্দায় প্রথম রোজেটের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[১] বাঘা মসজিদের অলংকরনে গৌড়িয় ধারা অনুসৃত হলেও গুণগত বিচারে পোড়ামাটির শিল্পে অবক্ষয়ের ছাপ সুস্পষ্ট। একই মোটিফের বারবার ব্যবহার ও অলংকরণের আতিশয্যে পোড়ামাটির শিল্প তার মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।[২] তবে সামগ্রিক বিচারে মসজিদটি পোড়ামাটির অলংকরণের ধারাবাহিকতায় সুলতানী আমলের মসজিদগুলোর সাথে পরবর্তীকালে বিকশিত স্থাপত্যের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনকারী ইমারত। ইলিয়াসশাহী আমলের দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবির ফ্রেমের মত টেরাকোটা অলংকরণের বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে উপেক্ষিত। দেওয়াল সজ্জায় ও উপস্থাপনে দরাস বাড়ি ও তাঁতীপাড়া মসজিদকে অনুসরণ করলেও মসজিদের চতুর্দেওয়ালে অলংকরণের আধিক্য এবং দেশজ বৈশিষ্ট্যকে টেরাকোটা নকশার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে বাংলার স্থাপত্যেকে বিশেষায়িত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় যা বাংলার ইলিয়াসশাহী ও হোসেন শাহী অলংকরণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছে।

শুরা মসজিদ

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার চরগাছা গ্রামে শুরা মসজিদটি অবস্থিত। এটি একটি বৃহৎ জলাধারের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি উঁচু টিবির উপর নির্মিত হয়েছে। একটি দশ ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ি দিয়ে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৌছতে হয়। মসজিদটিতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। ষোল শতকের মসজিদগুলোর সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে একে ষোল শতকের প্রথম দিকে নির্মিত মসজিদ বলে মনে করা হয়।[৩]

---

১. David McCutchion, *op.cit*., p 222

২. Muhammad Hafizullah Khan, *op.cit.*, p. 184-85

৩. C.Asher, " Inventory of the Key Monuments of Bengal", *Islamic Heritage of Bengal*, George Michell (ed.), Paris, UNESCO, 1984, p. 134

মসজিদটি বর্গাকার নামাজঘর সম্বলিত, এর সামনে সংযুক্ত রয়েছে একটি বারান্দা। এর নামাজঘরটি ৪.৮৭ মিটার দৈর্ঘ্যের বর্গ এবং বারান্দাটির প্রস্থ ১.৮২ মিটার। বাইরে থেকে মসজিদের মোট আয়তন ৮.৫৩ মিটার x ১২.৫০ মিটার। এর বারান্দা ও মূল নামাজঘর উভয়েরই পূর্ব দিকে তিনটি করে এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকার পার্শ্ববুরুজ এবং বারান্দা ও নামাজঘরের সংযোগস্থলে দুটি সংলগ্ন পার্শ্ববুরুজ আছে। মসজিদের অভ্যন্তরে মিহরাবের সংখ্যা তিনটি। কেন্দ্রীয় মিহরাবের স্থানে বাইরে দেয়ালে কিছুটা বর্ধিত করে নির্মিত। মসজিদের পার্শ্ববুরুজগুলো পাথর আচ্ছাদিত ছিল। বর্তমানে পশ্চিম দেয়ালের দুটি পাশ্ববুরুজ সম্পূর্ণ পাথর আচ্ছাদিত অবস্থায় বিদ্যমান। বাকীগুলোর উপরের অংশের পাথর খসে পরেছে। এদের পাথর আচ্ছাদিত ভিত্তিটুক বর্তমানে টিকে আছে। একটি উদ্গাত পাথরের ব্যান্ড মসজিদটির বাইরের দেয়ালকে উপর ও নিচ এই দুই ভাগে ভাগ করেছে। প্রতিটি ভাগই পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত।

চিত্র: ৪.৫৬

মসজিদের অভ্যন্তরভাগে নামাজগৃহে আটটি খিলানের উপর নির্মিত হয়েছে একটি গম্বুজ। দেওয়ালগুলো এই খিলান উত্থানের উচ্চতা পর্যন্ত পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত। পশ্চিম দেয়ালের মিহারাব তিনটিও পাথরের তৈরী ও খোদাই করা।

মসজিদের বারান্দা আচ্ছাদনে তিনটি ক্ষুদ্র গম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদের কার্নিশে হালকা বক্রতা লক্ষ্য করা যায়।

অলংকরণ

মসজিদের বহিঃদেয়ালের সম্পূর্ণটাই (পাশ্ব-বুরুজবাদে) পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত। পাথরের একটি উদ্গাত ব্যান্ড মসজিদের চারদিকের দেয়াল উপর ও নীচ এই দুই সমান অংশে বিভক্ত করেছে। শুধুমাত্র প্রবেশপথগুলোতে

ব্যান্ডটির ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়েছে। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথ তিনটি। এর মাঝখানের প্রবেশ খিলানের উচ্চতা ও প্রশস্ততা পার্শ্ববর্তী প্রবেশ-খিলানগুলো অপেক্ষা বেশী। কেন্দ্রীয় প্রবেশ-খিলানটি অন্তর্নিবিষ্ট করে একটি প্যানেলের মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিকেন্দ্রীক এই খিলানের স্প্যানড্রিলে রয়েছে দুটি রোজেট। খিলান প্যানেলটি একটি বৃহৎ ফ্রেমদ্বারা আবদ্ধ এবং খিলান উখানের উচ্চতায় পাথরের ব্যান্ড দ্বারা উপর ও নিচে বিচ্ছিন্ন। ব্যান্ডের নিচের অংশে দুটি উল্লম্ব প্যানেলে খাঁজ খিলান নকশা ও এর শীর্ষ হতে ঝুলন্ত পেনডেন্ট নকশা রয়েছে। ঝুলন্ত নকশাটি উভয় পার্শ্বে পাতার ন্যায় লতা-পাতা ও ফুলের বিমূর্ত নকশায় সজ্জিত। নকশাগুলো এখানে বিমূর্ত ও অনেকটা গহনার নকশায় উপস্থাপিত। খাঁজ-খিলানের দুই পার্শ্বেও ফুল-লতার অলংকরণ রয়েছে। খিলান উত্থানের উচ্চতা হতে নীচ পর্যন্ত প্যানেলের তিনদিকে চারপত্র ফুলের জালি নকশার বর্ডার আছে। পেনডেন্টটির শেষ মাথায় কর্ণ কুন্তলের ন্যায় বাঁকানো ধারযুক্ত ত্রিভুজ এর নিচের রয়েছে কতগুলো পুঁতি নকশা। এর উপর থেকে দুই পার্শ্বে একটি লতা প্রথমে একটি প্যাঁচ খেয়ে ত্রিভূজ ছাড়িয়ে নিচে নেমে গেছে। এর উপরে দুই পাশে পাঁচটি করে ক্ষুদ্র প্যাঁচের বিন্দু নকশা রয়েছে। পাথরের ব্যান্ডের উপরে উভয় পাশে একটি মাত্র উল্লম্ব প্যানেল রয়েছে। ফ্রেমের উপরের বাহুটি নয়টি খোপে বিভক্ত। প্রতিটি খোপ ধারাবাহিকভাবে গোলাপ ও অলংকৃত খিলান নকশায় সজ্জিত। কেন্দ্রীয় খিলানের পার্শ্ববর্তী খিলানগুলো অন্তঃর্নিবিষ্ট প্যানেলের মধ্যে নির্মিত। স্প্যানড্রিলে রোজেট নকশাও দেখা যায় কিন্তু কেন্দ্রীয় খিলানের ন্যায় এরা কোন ফ্রেমে আবদ্ধ নয়। তিন খিলান প্রবেশপথের দুই প্রান্ত খিলান অলংকৃত নকশার সরু প্যানেলে সজ্জিত। উল্লম্ব এই অলংকরণটি পাথরের ব্যান্ডের নিচে দুটি প্যানেল ও উপরে একটি প্যানেলে বিন্যস্ত। এর দুই পাশের দেয়াল কিছুটা অন্তর্নিবিষ্ট। এই দেয়ালের নিচের অংশে দুটি উল্লম্বভাবে বিন্যস্ত প্যানেলে খিলান ও লতার পেনডেন্ট নকশা দেখা যায়। ব্যান্ডের উপরের প্যানেলটি একই অলংকরণের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

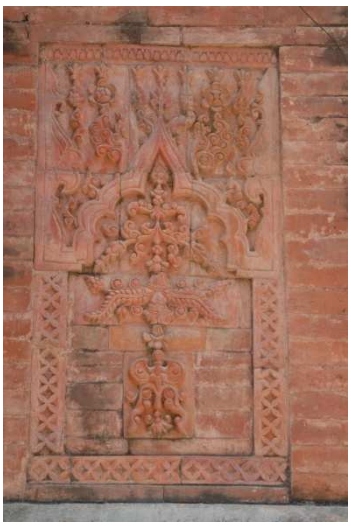

চিত্র: ৪.৫৭

মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে নামাজকক্ষে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ন্যায় অলংকৃত ও ফ্রেমবদ্ধ প্রবেশ খিলান রয়েছে। তবে খিলান ফ্রেমটি এখানে সরু। এর উপরের আড়াআড়ি বাহুর নিচে তিনটি রোজেট ও উপরে একটি উদ্গাত মোল্ডিং রয়েছে। প্রবেশ-খিলানের উভয় পার্শ্বে তিনটি করে ছয়টি সারিতে উপরে ও নিচে প্যানেলে অলংকৃত খিলান ও ফুল লতার ঝুলন্ত পেনডেন্ট রয়েছে। তবে পাথরের ব্যান্ডের নিচের অংশে পূর্বে দেয়ালের মত দুটি উল্লম্ব প্যানেলের পরিবর্তে প্রতিটি সারিতে একটি করে প্যানেল উপস্থাপিত হয়েছে। বারান্দার প্রবেশ খিলানের একপাশে উল্লম্বভাবে দুটি প্যানেল নকশা রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালেও একই নকশা পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

মসজিদের বাঁকানো কর্ণিশের নিচে দুটি উদ্গাত ব্যান্ডের নিচের তিনসারি পাড় নকশার বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। ব্যান্ডগুলোর উপরেরটি নিদিষ্ট দূরত্বে ত্রিকোণাকার মোটিফ সম্বলিত। নীচের ব্যান্ডে নির্দিষ্ট দূরত্বে চক্র নকশা দেখা যায়। উল্লেখ্য, মসজিদে ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি ব্যান্ডেই এই ধরনের চক্রনকশা ব্যবহৃত হয়েছে। কর্ণিশ ও উপরের ব্যান্ডের নিচে একসারি করে চারপত্র ফুলের পাড় নকশা রয়েছে। দ্বিতীয় ব্যন্ডের নিচে ধারবাহিকভাবে বড় ঝুলন্ত পেনডেন্ট ও ক্ষুদ্র ঝুলন্ত নকশা বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। নকশাটি এই মসজিদেই প্রথম দেখা যায়।

সাধারণ আলোচনা

পাথর ও ইটের সম্মিলিত ব্যবহার শুরা মসজিদকে একটি বিশেষরূপ প্রদান করেছে। এর একদিকে বাইরের সবগুলো দেয়ালে পোড়ামাটি অলংকরণের প্রাচুর্য অপরদিকে ভিতরের দেয়ালে ও মিহরাব অলংকরণে পাথরের আচ্ছাদন ও খোদাই অলংকরণ মসজিদের ভেতর ও বাহির সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। অপরদিকে লালপোড়ামাটির অলংকরণের বিপরীতে কালো পাথরের পার্শ্ব-বুরুজ ও দেয়ালে মাঝামাঝি উদ্গাত পাথরের কালো ব্যান্ড মসজিদটিকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে। ইতোপূর্বে কোন মসজিদে পাথর ও টেরাকোটার এই ধরনের মেল-বন্ধন লক্ষ্য করা যায়নি।

মসজিদটির সম্মুখে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি প্রাচীন দীঘি রয়েছে যার আয়তন প্রায় ৩২০ মিটার × ১৮৩ মিটার।[১] মসজিদের সম্মুখে দীঘির পাড়ে দুটি বড় আকারের গ্রানাইট পাথর রয়েছে। এছাড়া এর আশেপাশে আরও কিছু ভাস্কর্য সম্বলিত প্রস্তরখন্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যা দেখে এখানে অতীতে কোন প্রস্তর মন্দির ছিল বলে অনেকে মনে করেন। মন্দিরের পাথরগুলো মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বাকি পাথর আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে।[২]

১. আ কা ম যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমি, ১৯৮৪, পৃ. ১১১
২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

মজলিস আওলিয়া মসজিদ

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার পাথরাইল গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত। একজন স্বনামধন্য আওলিয়া 'মজলিস আবদুল্লাহ খানের' নাম অনুসারে মসজিদটির নামকরণ করা হয়। যিনি এই এলাকায় ধর্মপ্রচার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।[১] তিনি মজলিস আওলিয়া সাহেব নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। মসজিদের নিকট তার সমাধি এখনও বিদ্যামন। মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে প্রথিত রয়েছে দুটি শিলালিপি। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত এগুলো এতই ক্ষয়প্রাপ্ত যে তা পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তবে রাজশাহীর বাঘা মসজিদের সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এ.এইচ. দানী মসজিদটি ষোল শতকের প্রথমদিকে নির্মিত হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেন।[২] মসজিদটি অত্যন্ত ধ্বংস প্রাপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল তবে বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক মসজিদটি সংস্কার করা হয়েছে। আয়তাকার এই মসজিদের ভেতরের আয়তন ২১.১৪ মিটার × ৮.৬১ মিটার। মসজিদের দেয়াল ২.১৪ মিটার পুরু। মসজিদের বাইরের দিকে চারকোণে চারটি বর্গাকার পাশ্ব-বুরুজ রয়েছে। পূর্বে দেয়ালে এর প্রবেশপথের সংখ্যা পাঁচটি।

চিত্রঃ ৪.৫৮

মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আরও দুটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। এর পশ্চিম দেয়ালে কেন্দ্রীয় মিহরাবে অংশে কিছুটা বর্ধিত করে নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ধিত অংশের দুই কোণে রয়েছে দুটি সরু সংলগ্ন স্তম্ভ । মসজিদের অভ্যন্তরভাগ চারটি ইটের স্তম্ভ দ্বারা দুটি আড়াআড়ি 'বে' ও পাঁচটি আইলে বিভক্ত। মসজিদের মিহরাব সংখ্যা পাঁচটি। মিহরাবগুলো পোড়ামাটি অলংকরণে সজ্জিত। মসজিদের ছাদ নির্মাণে দশটি গম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে। গম্বুজগুলি পুনরনির্মিত সংস্কারের পূর্বে মসজিদের সবকটি গম্বুজই ধ্বসে গিয়েছিল।

১. *Bangladesh District Gazetteer, Faridpur*, Dacca, Bangladesh Government Press, 1977, p. 74
২. A.H. Dani, *op.cit.*, p. 159

অলংকরণ

মসজিদটি পোড়ামাটির অলংকরণের প্রাচুর্যে ভরপুর। এর পূর্ব দেয়াল অপর তিনদিকে দেয়াল হতে ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত। পূর্ব দিকের পাঁচটি প্রবেশপথ সম্বলিত দেয়ালটি পার্শ্ববর্তী দেয়াল অপেক্ষা কিছুটা বর্ধিত করে নির্মিত। এই বর্ধিত অংশের কেন্দ্রে রয়েছে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ। প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথগুলো থেকে উচু করে নির্মিত। এর পার্শ্ববর্তী প্রবেশ খিলানগুলোর উচ্চতা উভয়দিকে ক্রমহ্রাসমানভাবে নির্মিত।

চিত্র: ৪.৫৯

চিত্র: ৪.৬০

খিলানগুলো দ্বিকেন্দ্রীক। প্রতিটি খিলান একটি ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। কেন্দ্রীয় খিলানটি সবচেয়ে উঁচু ও জাঁকালোভাবে অলংকৃত। এর দ্বিকেন্দ্রীক খিলানটি একটি প্যানেলের মধ্যে স্থাপিত। খিলানের স্প্যানড্রিলে দুটি রোজেট ও শীর্ষে ফুলদানী সদৃশ একটি শীর্ষদন্ড রয়েছে। স্প্যানড্রিলের দুই পার্শ্বে দেয়াল ঘেঁষে বিমূর্ত লতার নকশা দেখা যায়। খিলানশীর্ষ ও ফ্রেমের মধ্যবর্তী স্থান একটি উদ্গাত ব্যান্ড নকশা রয়েছে। এ ব্যান্ডের উপরে ও নীচে দুটি পোড়ামাটির পাড় নকশা দেখা যায়। উদ্গাত ব্যান্ডেটি লজেন্স নকশার পাড় ও উভয় দিকে অর্ধগোলাকার নকশায় সজ্জিত। ব্যান্ডের উপরে চারপত্র ফুলের জালি নকশা ও নীচে ত্রিকোণ ফুল ও লতার ঝুলন্ত নকশা উৎকীর্ণ করা হয়েছে। খিলান ফ্রেমটি দুটি উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা আবদ্ধ। ব্যান্ডের উপরে নির্দিষ্ট দূরত্বে ক্ষুদ্র রোজেট নকশা রয়েছে। ব্যান্ড দুটির মধ্যবর্তী অংশে একটি ধারাবাহিক লতা রয়েছে যার উভয় পার্শ্বের বাঁকগুলোতে একটি করে রোজেট নকশা রয়েছে। পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথগুলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যানেলে বিভক্ত এবং বিমূর্ত লতা নকশায় সজ্জিত। খিলানপথগুলোর উভয় পার্শ্বে উল্লম্বভাবে স্থাপিত দুটি করে প্যানেল নকশা রয়েছে। প্যানেলগুলো একটি লতানো নকশার বর্ডার দিয়ে আবদ্ধ। প্যানেলের মধ্যে রয়েছে একটি খাঁজ খিলান নকশা। খিলানের শীর্ষে হতে ঝুলছে একটি লতা যার শেষ মাথায় রয়েছে একটি ঝুলন্ত ফুল। নকশাটি গৌড়ে বিকশিত শিকলে বা লতার সঙ্গে ঝুলন্ত পেনডেন্ট নকশার অনুকরণ হলেও এখানে লতাটি এত চওড়া করে উৎকীর্ণ হয়েছে যে এর ফুলের পেনডেন্টটি

তেমন দৃশ্যমান নয়। নকশাটি এখানে লতাদন্ডের ন্যায় মনে হয়। খিলানশীর্ষে পদ্মকলি সদৃশ্য একটি শীর্ষদন্ড রয়েছে। স্প্যানড্রিলে দুটি চক্রবদ্ধ রোজেট নকশা দেখা যায়। রোজেট দুটি লতানো ডালপালা বেষ্টিত স্প্যানড্রিলের উভয় পার্শ্বের দেয়াল ঘেঁষে বিমূর্ত লতা সদৃশ্য নকশা দেখা যায়। প্রতিটি প্রবেশ খিলানের ফ্রেমের উপর তিনটি করে এবং খিলানগুলোর মধ্যবর্তী অংশে প্যানেল নকশার উপর একটি করে চক্রবদ্ধ রোজেট নকশা রয়েছে। কেন্দ্রীয় খিলানের খিলান ফ্রেমের উপরে দুটি শিলালিপি স্থাপিত হওয়ায় মধ্যবর্তী রোজেটটি এখানে অনুপস্থিত। পাঁচ-খিলান সম্বলিত পূর্ব দেয়ালের বর্ধিত অংশের দুই পাশের দেয়াল হতে শুরু করে মসজিদের বাকী তিন দিকের দেয়ালে বেশ কয়েকটি মোল্ডিং এর উপস্থিতি চোখে পড়ে। এর মধ্যে ভিত্তি অংশে তিনটি মোল্ডিং, কার্নিশে ও ভিত্তির মধ্যবর্তী অংশে দুটি মোল্ডিং রয়েছে। কার্নিশে তিনটি মল্ডিং সমগ্র মসজিদটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। ভিত্তির মোল্ডিং তিনটির তৃতীয়টির উপরে একসারি অর্ধগোলাকার ভিত্তির উপর পাঁচ পত্রযুক্ত ধারাবাহিক নকশা রয়েছে। দেয়ালে গাত্রের তিনটি মোল্ডিং এর উপর ও নিচের অংশ স্টাইলাইজড (stylized) খিলান সারির পাড় নকশায় সজ্জিত।

মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণের প্রবেশপথগুলো বর্ধিত দেয়াল অংশে স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রবেশ খিলানগুলোও অলংকৃত ফ্রেমে আবদ্ধ। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের তিনটি মোল্ডিং এর উপরে প্রবেশপথ দুটির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আর একটি আড়াআড়ি মোল্ডিং দেখা যায় এটিও উপরে ও নিচে ক্ষুদ্র খিলান নকশার পাড়ে সজ্জিত।

মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে কেন্দ্রীয় মিহরাব অংশে দুটি আয়তাকার সংলগ্ন স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত। দেয়ালের উপরের অংশে এই দুই স্তম্ভের দুই প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আর একটি উদ্গাত মোল্ডিং রয়েছে। এর উপর ও নিচে খিলান নকশার পাড় দেখা যায়। এই মোল্ডিং এর নিম্ন হতে একেবারে ভিত্তির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত একটি পেনডেন্ট যুক্ত শিকল নকশা রয়েছে। শিকলের দুই পাশে বিস্তৃত পাতার নকশা দেখা যায়। এত লম্বা শিকল যুক্ত ও এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঝুলন্ত নকশার এটাই সম্ভবত একমাত্র উদাহরণ।

চিত্র: ৪.৬১

মসজিদের কার্নিশের নিচে দুটি উদ্গাত ব্যান্ড রয়েছে। কার্নিশের নিচে ও দুই ব্যান্ডের মধ্যবর্তী স্থানে যে অলংকৃত পাড় ছিল তা বর্তমানে নিশ্চিহ্ন শুধুমাত্র ব্যান্ডের নিচের এক সারি অলংকরণ এখনও টিকে আছে। ঝুলন্ত ফুল ও পাতার একসারি পাড় নকশা এখানে উৎকীর্ণ রয়েছে।

মসজিদের অভ্যন্তরে এর পাঁচটি মিহরাব সবচেয়ে বেশী অলংকৃত তবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় বিদ্যমান। মিহরাবগুলো একটি আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত। অলংকরণে প্রবেশপথের অনুরূপ নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। মিহরাবের খিলানগুলো বহুখাঁজ বিশিষ্ট। খিলানগুলো ইটের ও মুসলিম-পূর্ব যুগের নকশায় তৈরী। স্তম্ভের ধাপযুক্ত ভিত্তি এতে খিলান নকশায় উদ্ভিজ্জ নকশা,ঝুলন্ত লতা রয়েছে। এই ধরণের অলংকরণ মুসলিম-পুর্ব যুগের পাথরের স্তম্ভে দেখা যায়। স্তম্ভশীর্ষে রয়েছে একটি টেরাকোটা অমলক। মিহরাবের অবতল অংশ আড়াআড়িভাবে তিনটি উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা তিনটি ভাগে বিভক্ত। খিলান শীর্ষ হতে আর একটি উল্লম্ব ব্যান্ড এই তিনটি অংশের মাঝ বরাবর নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবে সর্বনিম্নের প্যানেলে একসারি অলংকৃত মারলন নকশা রয়েছে। মারলনগুলো প্যাঁচানো দড়ি নকশার বর্ডারে আবদ্ধ। এর উপরে আর একসারি স্টাইলাইজড মারলন নকশা রয়েছে। দ্বিতীয় প্যানেলে একসারি খিলান হতে ঝুলন্ত ফুল সম্বলিত লতা ও উপর নিচে সাজানো দুটি করে রোজেট নকশার ধারাবাহিক বিন্যাস দেখা যায় । তৃতীয় প্যানেলে দুটি আড়াআড়ি পাড় রয়েছে। নিচের পাড়ে রয়েছে চক্রবদ্ধ রোজেট ও উপরের পাড়ে ত্রিকোনাকার ফুল ও ফলের ঝুলন্ত নকশা। অন্যান্য মিহরাব প্যানেলে এই নকশাগুলোর পাশাপাশি পরস্পর সংযুক্ত ঝুলন্ত নকশাও ব্যবহৃত হয়েছে।

সাধারণ আলোচনা

মজলিস আওলিয়া মসজিদ নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ইমারত। স্থাপত্যটির পরিকল্পনা ও অলংকরণে রাজশাহী জেলার বাঘা মসজিদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বৈসাদৃশ্যও প্রচুর। এখানকার বহির্দেয়ালে অলংকরণ মোটিফ সুলতানী আমলের ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করলেও উপস্থাপনে সামান্য হলেও ভিন্নতা চোখে পরে। পূর্ব দেয়ালের প্যানেলে ব্যবহৃত শিকল ও পেনডেন্ট এর মোটিফ যে ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা সুলতানী আমলে নির্মিত অন্যান্য ইমারত থেকে ভিন্ন যেমন - এর পেনডেন্ট ঝোলাবার জন্য ইতোপূর্বের ইমারতগুলোতে শিকল অথবা দড়ি অথবা লতা ব্যবহৃত হয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রে পেনডেন্টটি বৃহৎ করে দৃশ্যমান ছিল। কিন্তু এই মসজিদে একটি পেনডেন্ট ঝোলাতে চওড়া লতা ব্যবহৃত হতে দেখা যায় আর এর শেষ প্রান্তে পেনেডেন্ট হিসাবে যে ফুলটি ঝুলছে তার আকার লতার প্রস্থ হতে একটুও বেশী নয়। যার ফলে একে সহজেই পেনডেন্ট হিসাবে লক্ষ্য করা যায় না। এছাড়া কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছন দেয়ালে ফ্রিজের একটু নিচের

থেকে একটি শিকলে ঝোলানো পেনডেন্ট নকশা একদম ভিত্তি পর্যন্ত নেমে এসেছে। এই ধরনের নকশাও অন্য কোন মসজিদে এই পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি।

পঞ্চম অধ্যায়

মুঘল আমলে বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির অংলকরণ (১৫৭৬-১৭৫৭খ্রি.)

জহির উদ্দীন মুহম্মদ বাবুর ছিলেন ভারতবর্ষে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পুত্র সম্রাট হুমায়ূন ছিলেন প্রথম মুঘল যিনি বাংলা রাজধানী গৌড় দখলের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।[১] তবে তাঁর এই বিজয় দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। অতি শীঘ্রই তিনি আফগান নেতা শেরশাহ কর্তৃক বাংলা থেকে ও এর অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হন। সুলতানী ও মুঘল শাসনের মধ্যবর্তী কয়েক বছর বাংলা এই আফগানদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল যার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন শেরশাহ স্বয়ং; ১৫৩৮ সালে শেষ হোসেনশাহী বংশীয় সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মুহম্মদ শাহকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে।[২] আফগান শাসনের এই পর্যায়ে বাংলায় বেশ কিছু স্থাপত্য নির্মিত হয়। নওগাঁ এর কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮ খ্রি.) ও কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের কতুব মসজিদ (ষোল শতকের শেষভাগ) দুটি এই পর্যায়ে নির্মিত উল্লেখযোগ্য ইমারত। এর মধ্যে কুসুম্বা মসজিদটি ইট ও পাথর রীতিতে তৈরী। ছয়গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির শুধুমাত্র গম্বুজের ভিত্তিতে একসারি পোড়ামাটির ষ্টাইলাইজড মারলন নকশা ছাড়া সমগ্র ইমারতটি পাথর আচ্ছাদিত। পাথর খোদাই অলংকরণে পোড়ামাটির নকশাগুলোর পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

অপরদিকে কুতুব মসজিদটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরী এর আয়তন ১৩.৭১ মি × ৩.৯৩ মিটার। এর চারকোণে চারটি অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে রয়েছে তিনটি প্রবেশপথ । এর কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথ অপেক্ষা চওড়া। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের দুটি করে প্রবেশপথের সংখ্যা চারটি। মসজিদ অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব নির্মিত হয়েছে। প্রবেশপথের মত এখানেও কেন্দ্রীয় খিলানটি চওড়া করে নির্মিত, সবগুলো খিলানই দ্বিকেন্দ্রীক। কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছনে মসজিদের বাইরের দেয়াল কিছুটা বর্ধিত করে নির্মিত। মসজিদের বর্ধিত অংশের কোণগুলোতে একটি করে সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। মসজিদের কর্নিশ সুলতানী স্থাপত্যের অনুকরণে বাঁকানো। মসজিদের চারপাশের দেয়ালে দুই সারিতে আয়তাকার প্যানেল নকশা দেখা যায়। প্রতিটি প্যানেলে দ্বিকেন্দ্রীক খিলান নকশা রয়েছে। মসজিদটি একটি কেন্দ্রীয় বৃহৎ গম্বুজ ও চারকোণে চারটি ক্ষুদ্র গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদটিতে কোন শিলালিপি নাই। এ.এইচ দানী নির্মাণরীতির ভিত্তিতে মসজিদটিকে ষোল শতকের শেষ দিকের নির্মাণ বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৩] মসজিদে পোড়ামাটির অলংকরণ

১. J.N. Sarkar (ed.), *History of Bengal*, vol.-II, Dacca, The University of Dacca, p.168
২. *Ibid*, p. 164
৩. A.H.Dani, *Muslim Architecture of Bengal*, Dacca, p. 165

চিত্র: ৫.১

দেখা যায় এর কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও কেন্দ্রীয় মিহরাব, পার্শ্ববুরুজ ও প্যারাপেট ও কার্নিশের মধ্যবর্তী স্থানে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি দুটি ফ্রেমে আবদ্ধ একটি প্যানেলের মধ্যে স্থাপিত। ফ্রেম দুটি নির্ধারিত দূরত্বে স্থাপিত চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশায় সজ্জিত। দুই ফ্রেমের মধ্যবর্তী অন্তর্নিবিষ্ট অংশে পাত্র থেকে উত্থিত লতা ও এর দুইপার্শ্বে লতা আবদ্ধ ফুলের নকশা রয়েছে। ফ্রেমের উপরে পাঁচটি বৃহদাকৃতির মারলন ও এদের প্রতিটি মধ্যে একটি করে রোজেট নকশা রয়েছে। খিলানের স্প্যানড্রিলে দুটি চক্রবদ্ধ রোজেট ও দুই পার্শ্বে পার্শ্ব নকশা দেখা যায়। খিলান শীর্ষে একটি শীর্ষদন্ড রয়েছে। খিলানের কিছুটা উপরে একটি আড়াআড়ি ব্যান্ড দেখা যায়। ব্যান্ডের নিচে একসারি মারলন ও উপরে একসারি চারপত্র বিশিষ্ট ফুলের নকশার পাড় রয়েছে। পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথগুলোর খিলান স্প্যানড্রিলের দুই পার্শ্বে চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা ও শীর্ষদন্ড রয়েছে। খিলানের উপরে উদ্গাত ব্যান্ডের উপরে ও নীচে চারপল্লব ফুলের জালি ও মারলন নকশার পাড় রয়েছে। এদের উপরে আয়তাকার প্যানেলের ভিতর একটি করে রোজেট স্থাপিত হয়েছে। অলংকরণগুলো পোড়ামাটির তৈরী। উত্তর ও দক্ষিণের প্রবেশপথগুলোতেও একই ধরণের নকশা দেখা যায়। তবে দক্ষিণের খিলান-শীর্ষের শীর্ষদন্ডের উপরে একটি বাঁকানো চাঁদের নকশা রয়েছে। পার্শ্ববুরুজগুলোর ভিত্তির ঠিক উপরে রয়েছে তিনটি পোড়ামাটির নকশা পাড়। পাড়গুলো দুটি উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা পৃথক। সবচেয়ে নিচে চারপল্লব বিশিষ্ট ফুলের নকশার পাড়, এর উপরে পাশাপাশি স্থাপিত পদ্ম নকশার পাড় ও সবচেয়ে উপরে একসারি মারলন নকশা রয়েছে। ফ্রিজ পর্যন্ত বুরুজের দেয়ালে আরও দুটি ব্যান্ড রয়েছে। ব্যান্ডগুলোর উভয় পার্শ্ব মারলন নকশার সজ্জিত। কার্নিশের নিচে দুই সারি পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায়।

একটি উদ্গাত ব্যান্ড দিয়ে পাড় দুটি আলাদা করা হয়েছে। উপরের সারিতে চারপল্লব ফুলের জালি নকশা ও নিচে একসারি মারলন নকশা। ব্যান্ডসহ পাড় দুটি মসজিদের বুরুজসহ চার দেয়াল ঘিরে বিস্তৃত। মসজিদের মিহরাবে প্রবেশপথের ন্যায় একই ধরনের নকশার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। মসজিদটিতে সুলতানী বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাধান্য পেলেও এর পাঁচ-গম্বুজ পরিকল্পনা, অলংকরণে আয়তাকার প্যানেলের ব্যবহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো নতুন এবং মুঘল স্থাপত্যে এদের অধিক ব্যবহার দেখা যায়। তাই একটিকে সুলতানী স্থাপত্য হতে মুঘল স্থাপত্যে উত্তরণে পর্যায়ের একটি স্থাপত্য বলা যায়।

১৫৭৬ সালে দাউদ খান করানীকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে বাংলার মুঘলদের আগ্রাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে বাংলায় তাদেরকে স্থানীয় জমিদার ও আফগান নেতাদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। বাংলার বার-ভূঁইয়া নামে পরিচিত এই জমিদারদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঈসা খান। তাঁর জমিদারি ভাটি অঞ্চল তথা, ঢাকা, বিক্রমপুর, সোনারগাঁও ইত্যাদি এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল। ঈসা খান সম্রাট আকবরের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা দেন এবং ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মুঘল বশ্যতা স্বীকার করেননি।[১] অপর দিকে ধর্মীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের গৃহীত কিছু নীতির ফলে মুঘল সৈন্যদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বাংলা ও বিহারে যা বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। এই সমস্ত বিদ্রোহীদের একজন ছিলেন মাসুম খান কাবুলী যিনি পাবনার চাটমোহরে তাঁর ঘাঁটি স্থাপন করেন।[২] মুঘল নেতাদের এই বিদ্রোহের ফলে ষোল শতকের শেষদিকে বাংলার মুঘল অধিপত্য সাময়িকভাবে খর্ব হয় ফলে স্থানীয় নেতা ও জমিদারগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। সুলতানী হতে মুঘল শাসনে উত্তরণের এই অন্তর্বর্তীকালীন সময় খুব সামান্য স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায়। এদের মধ্যে পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলায় অবস্থিত শাহী মসজিদ (১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে)[৩] ও বগুড়া জেলার শেরপুরে অবস্থিত খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২ খ্রিঃ) মালদহ জেলার পান্ডুয়ার অবস্থিত কুতুবশাহী মসজিদ (১৫৮২ খ্রিঃ) ও মালদহ জামি মসজিদ (১৫৯৬ খ্রিঃ) উল্লেখযোগ্য।

চাটমোহর শাহী মসজিদ ও শেরপুরের খেরুয়া মসজিদ দুটি তিন গম্বুজ সম্বলিত আয়তাকার মসজিদ। মসজিদ দুটিতে নিচু গম্বুজ, বক্রাকার কণিশ ও ছাদ পর্যন্ত প্রলম্বিত পাশ্ববুরুজ, আড়াআড়ি মোল্ডিং দ্বারা দেয়ালকে দ্বিধাবিভক্ত করণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো নিঃসন্দেহে সুলতানী স্থাপত্য রীতির অনুসরণ। তবে মসজিদ ফাসাদে অলংকরণ বিহীন প্যানেলগুলো মুঘল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাতের চিহ্ন হিসাবে বিধৃত হয়েছে। পান্ডুয়ার কুতুবশাহী মসজিদটি সম্পূর্ণ ইট ও পাথর রীতির সুলতানী বৈশিষ্ট্যে নির্মিত। চাটমোহর শাহী মসজিদের

১.আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মুঘল আমল*, ১ম খন্ড, রাজশাহী, ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ, ১৯৯২, পৃ. ৫৪
২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯
৩. আয়শা বেগম, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২, পৃ. ৫৫-৫৮

মিহরাবগুলো একসময় পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত ছিল। মিহরাব ফ্রেমের উপরে ষ্টাইলাইজড মারলন নকশা, পরস্পর সংযুক্ত ঝুলন্ত নকশা ও খিলান স্প্যানড্রিলে রোজেট নকশা ছিল।[১] পান্ডুয়ার কুতুবশাহী মসজিদটি 'ইট ও পাথর' রীতিতে সুলতানী বৈশিষ্ট্যে নির্মিত হয়েছিল। তবে মালদহ জামী মসজিদে মুঘল সম্রাট আকবরের সময়কার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।[২] মসজিদটির আয়তন ২১.৯৪ মিটার × ৮.২২ মিটার। এর চারপাশে অষ্টকোনাকৃতির পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। মাঝখানের আইলটি পার্শ্ববর্তী আইল হতে উঁচু করে নির্মিত ও একটি ব্যারেল ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। পার্শ্ববর্তী আইলদুটি গম্বুজ আচ্ছাদিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালের মাঝখানের অংশটি দুটি সংলগ্ন স্তম্ভ দ্বারা বর্ডারকৃত। দেয়ালে স্বল্প উন্নত ও অবনত উল্লম্ব নকশা দেখা যায়। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে প্রবেশপথ তিনটি। মাঝখানের প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়, এতে বহু-খাজ খিলানের ব্যবহার দেখা যায়। প্রবেশ খিলানটি একটি অন্তর্নিবিষ্ট প্যানেলে স্থাপিত। খিলান-শীর্ষে একটি কলস সদৃশ্য শীর্ষদন্ড রয়েছে। খিলান স্প্যানড্রিলের দুই দেয়াল ঘেঁষে পার্শ্ব নকশা রয়েছে। এছাড়া বাকী সমস্ত অংশ পত্র নকশা দ্বারা পরিপূর্ণ। খিলানের একটু উপরে একটি উদ্গত ব্যান্ড নকশা রয়েছে। ব্যান্ডের উপরে ও নীচে পোড়ামাটির নকশা দেখা যায়। ব্যান্ডের উপরে লতা ও নীচে পরস্পর সংযুক্ত ঝুলন্ত নকশা রয়েছে। প্রবেশ-খিলানের প্যানেলটি দুটি ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। ফ্রেমগুলোতে নির্দিষ্ট দূরত্বে রোজেট স্থাপন করা হয়েছে। মসজিদের পার্শ্ববর্তী প্রবেশ-খিলানগুলোও প্যানেলে মধ্যে স্থাপিত ও ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। তবে আকারে ক্ষুদ্র খিলানগুলো দ্বিকেন্দ্রীক এখানে স্প্যানড্রিলের দুই পার্শ্বে রোজেট অলংকরণ রয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে আরও দুটি খিলানপথ রয়েছে যেগুলো বর্তমানে জালি দ্বারা আবদ্ধ। পূর্ব দেয়ালে কেন্দ্রীয় প্রবেশ-খিলানের ফ্রেমের দুই পাশে দুটি প্যানেলে খিলান নকশা ও এর মধ্যে খিলান-শীর্ষ হতে ঝুলন্ত লতার নকশা রয়েছে। প্যানেলটি নির্ধারিত দূরত্বে স্থাপিত রোজেট নকশার পাড় দ্বারা আবদ্ধ।

মসজিদের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় মিহরাবটিতে বেশ জাঁকালো অলংকরণ দেখা যায়। মিহরাব খিলানটি দুটি মুসলিম-পূর্ব যুগের পাথরের স্তম্ভ নকশায় নির্মিত ইটের স্তম্ভের উপর স্থাপিত। মিহরাব খিলানটি বহুখাঁজ বিশিষ্ট। খিলানের প্রান্ত রেখা ধরে পোড়ামাটির অলংকৃত বর্ডার রয়েছে। স্প্যানড্রিলের পার্শ্ব দেয়াল ঘেঁষে পার্শ্ব নকশা ও খিলানের দুই পাশে দুটি রোজেট নকশা রয়েছে। মিহরাব স্প্যানড্রিলের বাকী অংশ চারপত্র ফুলের জালি নকশা দ্বারা আবৃত। মিহরাব প্যানেলের বাইরে তিনটি বর্ডার ফ্রেম রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় ফ্রেমে নির্ধারিত দূরত্বে রোজেট স্থাপিত হয়েছে। আর মাঝখানের ফ্রেমটি লতার ধারাবাহিক নকশায় সজ্জিত। ফ্রেমের উপরের অংশে পরস্পর

১. আয়শা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬, চিত্র: ৫
২. A.H. Dani, *op.cit.*, p. 173

সংযুক্ত ঝুলন্ত নকশা রয়েছে। এর উপর একটি উদ্গাত ব্যান্ড ও তার উপরে একসারি লতা নকশার পাড় দেখা যায়।

মসজিদের প্রতিটি পার্শ্বের বক্র-কর্নিশ পোড়ামাটির অলংকরণ, উন্নত ও অবনত দেয়ালে নকশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুলতানী বৈশিষ্ট্যের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। আবার পূর্ব দেয়ালে পার্শ্ব-বুরুজ সম্বলিত ফ্রন্টনের ব্যবহার, রীব যুক্ত ব্যারেল ভল্ট ও গম্বুজের ব্যবহৃত প্লাষ্টার অন্তরণ ইত্যাদি মুঘল বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দিক দিয়ে মালদাহ জামি মসজিদটি যুগসন্ধিক্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হলে মুঘল শিল্পচিন্তা বাংলার স্থাপত্যকে প্রভাবিত করে। পূর্ববর্তী সুলতানী শাসনামলে বিকশিত স্থাপত্য শৈলীর পরিবর্তে উত্তর ভারতে বিকশিত মুঘল স্থাপত্য শৈলী ধীরে ধীরে বাংলার স্থাপত্যে জায়গা করে নেয়। বাংলায় পাথরের দুস্প্রাপ্যতার কারণে ইট নির্মাণ উপাদান হিসাবে ব্যাবহৃত হতে থাকে। স্থাপত্য পরিকল্পনা, ও অলংকরণে মূল পরিবর্তন সূচিত হয়। বহু গম্বুজ পরিকল্পনার পরিবর্তে এক গম্বুজ ও তিনগম্বুজ পরিকল্পনায় মসজিদ নির্মিত হয়। দ্বিকেন্দ্রীক খিলানের পরিবর্তে বহুখাঁজ বিশিষ্ট চতুর্কেন্দ্রীক খিলানের বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সুলতানী আমলের বক্রাকার কার্নিশের স্থলে মুগল আমলে সোজা কার্নিশ প্যারাপেট সহযোগে নির্মিত হয়। এছাড়া পার্শ্ব বুরুজগুলো ছাদ ছাড়িয়ে আরও প্রলম্বিত করে নির্মাণ, গম্বুজ নির্মাণে ড্রামে ব্যবহার, চতুকেন্দ্রীক গম্বুজের ব্যবহার, স্থাপত্যে প্লাস্টারের আবরণ, ছত্রী, মিনার ও গম্বুজে উঁচু শীর্ষদন্ড ইত্যাদি মুঘল রীতির বৈশিষ্ট্য প্রচলিত হয়।

স্থাপত্য অলংকরণেও বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। সুলতানী আমলের জনপ্রিয় পোড়ামাটির অলংকরণ ধীরে ধীরে মুসলিম স্থাপত্য থেকে হারিয়ে গিয়ে সেই স্থানে দেয়ালজুড়ে অলংকরণ বিহীন বা খিলান নকশা যুক্ত প্যানেল ইমারতের অভ্যন্তরে স্কুইঞ্চ নেট, দরজার দুইপার্শ্বে সরুস্তম্ভের ব্যবহার, খাঁজ কাটা বা রীবযুক্ত গম্বুজ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হয়। মুঘল স্থাপত্যের এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথমে প্রাদেশিক রাজধানী শহরগুলোতে দেখা যায়। পরবর্তীতে তা সমগ্র বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে। মুঘল আগমনের প্রথম পর্যায়ে নির্মিত স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাক্ত হয়নি। আঞ্চলিক স্থাপত্যসমূহে এর ব্যবহার বেশ কিছু দিন প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ টাঙ্গাইলের আটিয়া মসজিদ (১৬০৯ খ্রি.), কিশোরগঞ্জের এগারোসিন্দুরের সাদীর মসজিদ (১৬৫২ খ্রি.) ইত্যাদি এর নামে উল্লেখ করা যায়। মুসলিম ধর্মীয় ও লৌকিক স্থাপত্য হতে পোড়ামাটির অলংকরণের ব্যবহার ধীরে ধীরে বিলোপ পেয়েছিল সত্য তবে এই সময় স্থাপত্যের আর একটি ধারা মন্দির স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মন্দির স্থাপত্যে এর ব্যবহার ষোল শতক হতে আরম্ভ হয়ে ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম যুগে বিকশিত শৈলীতে নির্মিত পোড়ামাটির অলংকরণ

সমৃদ্ধ এই মন্দিরগুলি বাংলার একটি অনন্য সম্পদে পরিণত হয়। এ ধরনের মন্দির উপমাহাদেশে আর কোথায় দেখা যায় না।[১] হিন্দু সমাজে মন্দির স্থাপত্য শিল্পের পুনরুত্থান পনের শতক হতে শুরু হলেও বাংলায় মুঘল আগমনের পর থেকেই এই স্থাপত্য চর্চায় গতি সঞ্চারিত হয়। মুঘলদের প্রগতিশীল ব্যবস্থাপনায় বাংলায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। অপরদিকে এ সময় বাংলার জমিদারগণ হিন্দু-মুসলিম উভয়ই নিয়মিত খাজনা প্রদানের বিপরীতে কোন রকম হস্তাক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রায় স্বাধীনভাবে জমিদারি পরিচালনা করতে পারতেন। উপরন্তু মুর্শীদকুলি খানের মত মুঘল গর্ভণর ও পরবর্তীতে বাংলার নওয়াবের গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী রাজস্ব বিভাগে হিন্দু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ উচ্চপদ লাভ করে এতে ক্ষমতা ও সম্পদ অর্জনের পথ সুগম হয়। এর ফলে হিন্দু সম্পদশালী জমিদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যদা বৃদ্ধি হেতু মন্দির নির্মাণে তাদের সক্রিয়তা বাড়ে। পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরের প্রভাবশালী মল্লরাজাগণ সতের শতকে এ অঞ্চলে বহু সংখ্যক পোড়ামাটির মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যা পোড়ামাটির ফলকে অলংকৃত মন্দির নির্মাণের ঐতিহ্যকে সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত করতে সহায়ক হয়েছিল। [২]

বিভিন্ন মহাকাব্যিক ও পৌরানিক কাহিনীর দৃশ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের দৃশ্য সম্বলিত এই মন্দিরগুলি ষোল শতক হতে উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকাতে দেখা যায়। গণনা করলে এদের সংখ্যা কয়েকশত হবে। গবেষণার প্রয়োজনে এই সমস্ত মন্দির হতে ষোল শতকের নির্মিত বর্ধমানের বৈদ্যপুর দেউল (১৫৫০ খ্রি:) ফরিপুরের মথুরাপুর দেউল ও বাগেরহাটের কোদলা মঠ। সতের শতকে নির্মিত বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা মন্দির (১৬৫৫) ও শ্যামরায় মন্দির (১৬৪৩) এবং আঠার শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত দিনাজপুরের কান্তনগর মন্দির, রাজশাহীর পুঠিয়ায় অবস্থিত ছোট আহ্নিক মন্দির, কালনার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

আলোচনার সুবিধার্থে মুঘল আমলের পোড়ামাটির অলংকরণসমৃদ্ধ স্থাপত্যগুলোকে মসজিদ ও মন্দির এই দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল।

---

১. *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা ৮, চারু ও কারু কলা*, লালা রুখ সেলিম (সম্পা), ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৯৯

২. Zulekha Haque, *Terracotta Decorations in Late Mediaval Benal Portrayal of a Society*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1980, p. 24

ক. মসজিদ স্থাপত্য

আটিয়া মসজিদ

টাঙ্গাইল জেলা শহর হতে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে আটিয়া ইউনিয়নে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি অনুসারে মসজিদটি ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে বায়জিদ খান পন্নীর পুত্র সৈয়দ খান পন্নী কর্তৃক বিখ্যাত পীর আলী শাহানশাহ বাবা কাশ্মীরির সম্মানার্থে নির্মিত হয়েছিল।

চিত্র: ৫.২

মসজিদটি সুলতানী আমলে বিকশিত সামনে বারান্দা যুক্ত বর্গকার মসজিদ পরিবল্পনায় নির্মিত। মসজিদের বারান্দা তিনটি ক্ষুদ্র গম্বুজ ও বর্গাকার কক্ষটি একটি বৃহৎ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। সুলতানী আমলে গৌড়ের চামকাট্টি মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), দিনাজপুরের শুরা মসজিদ, (১৬শ শতক) ও সিলেটের উসাইল মসজিদসহ বেশ কিছু মসজিদ এই পরিকল্পনায় নির্মিত হতে দেখা যায়।

আটিয়া মসজিদের আয়তান ১৬.৫১ মিটার × ১০.৫২ মিটার। এর পূর্ব দেয়ালে প্রবেশপথে সংখ্যা তিনটি বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। মূল নামাজঘরে প্রবেশের জন্য বারান্দা থেকে তিনটি প্রবেশপথ আছে। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের সংখ্যা তিনটি কেন্দ্রীয় মিহরাবের বাইরের দিকে মসজিদের দেয়াল কিছুটা বর্ধিত আকারে নির্মিত।

মসজিদের চারকোণের চারটি অষ্টকোনাকার পার্শ্ববুরুজ রয়েছে। বুরুজসমূহ বদ্ধ ছত্রী শোভিত যা মুঘল রীতিকেই বিধৃত করে। মসজিদের গম্বুজগুলো অনুচ্চ ড্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটিও একটি মুঘল বৈশিষ্ট্য, তবে মসজিদের ধনুকাকৃতির বাঁকনো কর্ণিশ নিঃসন্দেহে সুলতানী স্থাপত্যের ধারাবাহিকতার অংশ।

অলংকরণ

মসজিদের বহির্দেয়াল পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ। এর পূর্ব ও উত্তর দিকের সম্পূর্ণ দেয়ালে টেরাকোটা অলংকরণে ঢাকা তবে পশ্চিম ও দক্ষিণের দেয়ালে একেবারে অলংকরণ বিহীন। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে স্থাপিত প্রবেশপথ তিনটি একটু উদ্গাত ও উপরের ফ্রিজ পর্যন্ত বিস্তৃত দেয়ালের মধ্যে স্থাপিত। এই উদ্গাত অংশটির একটি সরু ফ্রেমে আবদ্ধ। ফ্রেমটি নির্ধারিত দূরত্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোজেট দ্বারা অলংকৃত। প্রবেশপথগুলির ঠিক উপরে আড়াআড়ি একটি ব্যান্ড সমগ্র দেয়ালটিকে দুইভাগে ভাগ করেছে। ব্যান্ডটি লজেন্স নকশা দ্বারা সজ্জিত। ব্যান্ডটির নিচে মালা সদৃশ্য ঝুলন্ত নকশা ও টারসেলের ন্যায় ঝুলন্ত লতার ধারাবাহিক উপস্থাপন চোখে পরে। ব্যান্ডটি উপরে একই নকশা উল্টোভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যাতে করে নকশাটি খিলানের মত দৃশ্যমান হয়। প্রবেশ পথগুলির উপরের অংশটি আড়াআড়ি ভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগে একসারি করে আয়তাকার প্যানেল রয়েছে। প্যানেলগুলো নির্ধারিত দুরত্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র রোজেটের অলংকারসমৃদ্ধ বর্ডার দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক। প্রতিটি প্যানেল লতা নকশার পাড় দ্বারা আবদ্ধ। প্যানেলের ভেতর অলংকৃত খিলান ও ঝুলন্ত লতা নকশা রয়েছে। আড়াআড়ি ব্যান্ডের নীচে উদ্গাত দেয়ালে প্রতিটি প্রবেশ-খিলান একটি আয়তাকার ফ্রেমে স্থাপিত। ফ্রেমের দুই পার্শ্বে ও উপরের নির্ধারিত দূরত্বে একসারি রোজেট নকশা রয়েছে। খিলানের কিছুটা উপরে একটি উদ্গাত ব্যান্ড স্থাপিত হয়েছে যার উপরে ও নীচে পরস্পর সংযুক্ত ঝুলন্ত নকশার দুটি পাড় রয়েছে। আড়াআড়ি ব্যান্ড ও তিন খিলান প্রবেশ পথের মধ্যবর্তী অংশে একসারিতে নির্ধারিত দূরত্বে ক্ষুদ্র রোজেট উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি খিলান প্যানেলের দুই পার্শ্বের দেয়াল আড়াআড়িভাবে ছয়টি প্যানেলে বিভক্ত। প্রতিটি প্যানেলেকে উল্লম্ব তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এর মাঝখানের ভাগটি বড় ও দুই পাশের ভাগগুলো সরু। সরু প্যানেলগুলো একটি প্যাঁচানো লতার মধ্যে চারটি করে রোজেট দ্বারা সজ্জিত। মাঝখানের চওড়া প্যানেলটি আবার আড়াআড়ি তিনটি প্যানেলে বিভক্ত। এর উপরে ও নিচের প্যানেলে প্যাঁচানো লতার মধ্যে রোজেট নকশা রয়েছে। মাঝখানের প্যানেলে দেয়ালের আড়াআড়ি ব্যান্ডের উপরের খিলান নকশাটির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে। খিলানগুলোর মধ্যে ও শীর্ষে একটি করে ক্ষুদ্র কলস সদৃশ্য পাত্রের নকশা দেখা যায়।

কেন্দ্রীয় প্রবেশ-খিলান ও পার্শ্ববর্তী খিলান দুটির মধ্যবতী দেয়ালের মাঝখানে একসারিতে আরও ছয়টি প্যানেল রয়েছে। যা উল্লম্ব তিনটি প্যানেলে বিভক্ত। যার দুই পাশের সরু প্যানেলে লতা ও রোজেট নকশা ও মধ্যবর্তী প্যানেলে বৃহৎ রোজেট নকশায় সজ্জিত। বৃহৎ রোজেটগুলোর উপরে ও নিচে তিন শীর্ষ সম্বলিত লতার নকশা দেখা যায়।

দেয়ালের পার্শ্ববুরুজ ও উদ্গাত দেয়ালের মধ্যবর্তী অন্তর্নিবিষ্ট দেয়ালাংশ অলংকরণে খিলান পার্শ্ববর্তী দেয়ালের ন্যায় ছয় প্যানেল নকশার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে। ব্যান্ডের উপরের অন্তর্নিবিষ্ট দেয়ালে এর পার্শ্ববর্তী সারিবদ্ধ প্যানেল নকশার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে একই ধরনের নকশা উপস্থাপিত হয়েছে।

পূর্ব দেয়ালের কার্নিশে তিনটি বক্রাকার ব্যান্ড রয়েছে। এর সর্বনিম্ন ব্যান্ডের নিচে একসারি পরস্পর সংযুক্ত ঝুলন্ত নকশা, সবচেয়ে উপরের ব্যান্ডটির উপরে একসারি পদ্ম পাতায় বাঁকানো স্টাকো নকশা রয়েছে। পূর্ব দেয়ালে ভিত্তি অংশেও দুই সারি পোড়ামাটির নকশা দেখা যায়। এর নিচের সারিতে প্যাঁচনো লতায় রোজেট নকশা ও এর উপরে একসারি পাঁচ-খাঁজ বিশিষ্ট পত্র নকশা উপস্থাপিত হয়েছে।

মসজিদের অভ্যন্তরে মিহরাবগুলো পোড়ামাটির নকশায় অলংকৃত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি দুটি অলংকৃত বর্ডার দ্বারা আবদ্ধ। বাইরের বর্ডারটি প্যানেল অংলকরণে সজ্জিত। নিচের প্যানেলগুলোতে ঝুলন্ত পেনডেন্ট এর নকশা ও উপরেরগুলোতে উদ্ভিজ্জ নকশা রয়েছে। প্যানেলের বর্ডারগুলো রোজেট নকশায় সজ্জিত। ভিতরের বর্ডারটিতে ফুল কারির জালি নকশা দেখা যায়। মিহরাবের অবতল অংশে তিনখাঁজ বিশিষ্ট খিলান নকশা রয়েছে। খিলানের নকশার কিছুটা উপরে একসারি ঝুলন্ত ফুলের নকশার পাড় রয়েছে। মিহরাব প্যানেলের উপরের অংশ তিনটি উদ্গাত ব্যান্ড রয়েছে। ব্যান্ডগুলোর মধ্যবর্তী অংশে ফুলকারীর জালি নকশা রয়েছে। ব্যান্ডগুলোর নিচে একসারি ঝুলন্ত মালা নকশার পাড় দেখা যায়। ব্যান্ডগুলোর উপরে একসারি ক্ষুদ্র খিলান নকশা দ্বারা সম্পূর্ণ ফ্রেমটি শেষ হয়েছে। পাশ্ববর্তী মিহরাবগুলোও অলংকৃত বর্ডার দ্বারা আবদ্ধ। দক্ষিণ দিকের মিহরাবের বর্ডারে প্যানেল অলংকরণ রয়েছে। প্যানেলগুলো উদ্ভিজ্জ নকশার সজ্জিত। উত্তর দিকের মিহরাবের বর্ডারে আড়াআড়ি করে সরু মারলন নকশার দেখা যায়। পার্শ্ব মিহরাবের অবতল অংশ একসারি ঝুলন্ত ফুলের নকশার পাড় দ্বারা সজ্জিত।

গম্বুজের ভারবহনকারী খিলানের স্তম্ভগুলোর ভিত্তি শীর্ষ ও মাঝামাঝি স্থান পোড়ামাটির ফুলকারী নকশা, জালি নকশা ও পরস্পর সংযুক্ত উদ্ভিজ্জ নকশায় সজ্জিত।

সাধারণ আলোচনা

টাঙ্গাইলের আটিয়া মসজিদটি মুঘল শাসনামলে প্রথম পর্যায়ে একটি ইমারত। এতে সুলতানী ও মুঘল উভয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যই বিধৃত হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালের কার্নিশের বক্রতা যেমন সুলতানীধারাকে বহন করছে তেমনি কার্নিশের উপরে বাঁকেনো মারলনগুলো মুঘল আমলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে। মসজিদের অপর তিনদিকে বাঁকানো ব্যান্ড নকশা থাকলেও ঐ দিকগুলোর কার্নিশসমূহ একেবারে সোজা। যা হতে পারে মুঘল আমলের সোজা কার্নিশের বৈশিষ্ট্যে নির্মিত অথবা পরবর্তী কালের সংযোজন। মসজিদটি ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ও ১৯০৯

খ্রিষ্টাব্দে দুইবার সংস্কার করা হয়েছে।[১] যার ফলে মসজিদের সকল কার্নিশ বক্র ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

সাদীর মসজিদ

মসজিদটি কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুর গ্রামে অবস্থিত। এগারসিন্দুর ছিল বারভুঁইয়া নেতা ঈসা খানের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। মুঘল আমলে প্রহরা চৌকি হিসাবে স্থানটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। মসজিদটি ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ সিরুর পুত্র সাদী কর্তৃক নির্মিত[২] ৭.৬২ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি বর্গাকার ইমারত। মসজিদের চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকার পার্শ্ব-বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো ছাদের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত ও ক্ষুদ্র গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদের ছাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে একটি বৃহৎ গম্বুজ। গম্বুজটি একটি উঁচু ড্রামের উপর স্থাপিত ও গম্বুজ শীর্ষে একটি কলস শীর্ষদন্ড রয়েছে। মসজিদের কার্নিশ ও ছাদ প্রাচীর উভয় বাঁক যুক্ত। সমগ্র মসজিদটি পলেস্তারায় আবৃত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে প্রবেশপথের সংখ্যা তিনটি। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি বড় করে নির্মিত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে ক্ষুদ্র প্রবেশপথ রয়েছে। পূর্ব দিকের প্রবেশপথের সাথে সঙ্গতি রেখে মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের সংখ্যা তিনটি।

চিত্রঃ ৫.৩

১. Muhammad Abdul Bari, Mughal Mosque Type in Bangladesh Origins and Development, Unpublished thesis, Rajshahi, Institute of Bangladesh Studies,1989, p. 341

২. Abdul Karim, *Corpus of Arabic anf Persian Inscriptions of Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, p.448

অলংকরণ

মসজিদের পূর্ব দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি একটি বৃহৎ আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত। ফ্রেমটি দুই দিকে সরু বর্ডার যুক্ত। দুই বর্ডার লাইনের মধ্যে একটি লতা ও ফুলের তরঙ্গায়িত নকশা ফ্রেম জুড়ে বিস্তৃত। প্রবেশ খিলানটি দ্বিকেন্দ্রীক। এর সামনে স্তম্ভ সমর্থিত একটি বহুখাঁজ খিলান নির্মাণ করে প্রবেশ খিলানটিকে বিশেষায়িত করা হয়েছে। খিলান স্প্যানড্রিলে দুটি বৃহৎ চক্রবদ্ধ পদ্মনকশা রয়েছে। স্প্যানড্রিলে দুই প্রান্তে বিমূর্ত পত্রের পার্শ্ব নকশায় সজ্জিত। খিলান শীর্ষ কলস-দন্ডে শোভিত। খিলানের কিছুটা উপরে একটি উদ্গাত ব্যান্ড নকশা রয়েছে। ফ্রেমের উপরের অংশে একসারি মারলন নকশায় সজ্জিত। পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথ দুটিও প্যানেলের মধ্যে স্থাপিত। খিলান স্প্যানড্রিলে উভয়পার্শ্বে দুটি চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা রয়েছে। খিলানের কিছুটা উপরে রয়েছে একটি উদ্গাত ব্যান্ড যার উপরের অংশ এক সারি পদ্ম নকশায় সজ্জিত। পার্শ্ববর্তী প্রবেশ খিলান দুটির উপরে রয়েছে একটি করে আয়তাকার প্যানেল। একই রকম আরও তিনটি প্যানেল নকশা খিলান দুটির পার্শ্বে উল্লম্বভাবে বিন্যাস্ত। প্রতিটি প্যানেলের মধ্যে একটি করে পোড়ামাটির চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা রয়েছে। মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবটি বাইরের দিকে ছাদ পর্যন্ত কিছুটা বর্ধিত আকারে নির্মিত। পশ্চিম দেয়ালের এই অংশে উল্লম্বভাবে দুটি অংশে বিভক্ত। নিচের ভাগে একটি অন্তর্নিবিষ্ট প্যানেলে একটি খিলান নকশা রয়েছে। খিলান নকশাটি দ্বিকেন্দ্রীক এর স্প্যানড্রিলে দুটি বৃহৎ চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা রয়েছে। এর কিছুটা উপরে রয়েছে দুটি উদ্গাত ব্যান্ড। ব্যান্ডগুলোর নিচের অন্তর্নিবিষ্ট অংশে রয়েছে মারলন নকশা এবং রোজেট ও হীরক নকশার ধারাবাহিক পাড়। ব্যান্ড দুটির উপর একসারি চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশার ফ্রিজ দ্বারা শোভিত।

মসজিদের অভ্যন্তরের অলংকরণ মিহরাব অংশে সীমাবদ্ধ এর কেন্দ্রীয় মিহরাবটি বৃহৎ আয়তাকার ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। প্যানেলের উপর একসারি স্টাইলাইজড মারলন নকশা রয়েছে। প্যানেলটি দুটি ফ্রেমে আবদ্ধ। এর বাইরে ফ্রেমটি লতা নকশায় সজ্জিত। অপর দিকে ভিতরের ফ্রেমে প্যাঁচানো নকশার মধ্যে রোজেট স্থাপিত হয়েছে। মিহরাব খিলানটি একটি কলস-চুঁড়ায় শোভিত। খিলান স্প্যানড্রিলে রয়েছে দুটি করে রোজেট। স্প্যানড্রিলের প্রান্ত রেখায় অর্ধ-ত্রিখাঁজ পত্র নকশা রয়েছে। খিলানে কিছুটা উপরে রয়েছে একটি ব্যান্ড। খিলানের অবতল অংশে বেশ কয়েকটি আড়াআড়ি ব্যান্ড নকশা রয়েছে। এদের মাঝখান দিয়ে একটি ঝুলন্ত শিকল ঘন্টার নকশা শোভিত। পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলো অপেক্ষাকৃত কম অলংকরণে সজ্জিত। মিহরাব খিলানের স্প্যানড্রিলে চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা দেখা যায়।

সাধারণ আলোচনা

বাংলার মুঘল শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আরও প্রায় চল্লিশ বছর পরে নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও সাদীর মসজিদটি সম্পূর্ণ মুঘল বৈশিষ্ট্য অনুসরণে তৈরী হয়নি। মুঘল বৈশিষ্ট্যর পাশাপাশি সুলতানী আমলে বিকশিত স্থাপত্য শৈলীর প্রভাব এখানে অনুভুত হয়। মুঘলদের অলংকার বিহীন প্যানেল নকশার পরিবর্তে পোড়ামাটির অলংকরণ এই শিল্পের প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের প্রবল মমত্ব ও ভালবাসারই প্রকাশ।[১] সময়ের ধারাবাহিকতায় মুসলিম স্থাপত্য হতে পোড়ামাটির অলংকরণ বিলুপ্ত হলেও এই শিল্পের সমাধি রচিত হয়নি। এ সময় বাংলায় নির্মিত মন্দির স্থাপত্যে এর সরব ও নান্দানিক উপস্থিতি পোড়ামাটির শিল্প কলাকে আরও বেগবান ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

খ. মন্দির স্থাপত্য

তের শতকের প্রারম্ভে বাংলায় মুসলমানদের আগমন মন্দির স্থাপত্য ক্ষেত্রে একটি ছেদ সূচিত করেছিল।[২] চৌদ্দ শতকে পূর্ব ভারতে তুঘলক আক্রমণ এই বিপর্যয়কে আরও তরান্বিত করে[৩] যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম আগমনের পরবর্তী প্রায় দুইশত বছর পর্যন্ত বাংলায় মন্দির স্থাপত্য চর্চার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। পনের শতক হতে বাংলায় মন্দির নির্মাণের উদাহরণ মেলে। প্রায় ষোল শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেগুলো ছিল বিছিন্ন ও সংখ্যায় নিতান্তই স্বল্প। এই সময়কালে নির্মিত মন্দিরগুলোতে উড়িষীয় স্থাপত্য শৈলীর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বর্ধমান জেলার বরাকরে অবস্থিত তিনটি মন্দির (১৪৬১ খ্রিষ্টাব্দ)। উঁচু টাওয়ার সদৃশ্য বক্র শীর্ষযুক্ত রেখা রীতির এই মন্দিরগুলো উড়িষায় দেউল নামে পরিচিত।

চিত্র: ৫.৪

পনের শতকে শ্রী চৈতন্যের সংস্কার আন্দোলন বাংলায় হিন্দু নবজাগরণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলে। মুঘলদের বাংলা বিজয়ের পর এই আন্দোলন যেন আরও গতিশীল হয়। স্থাপত্যচর্চাও বৃদ্ধি পায়। এসময় বাংলার মন্দির স্থাপত্য উড়িষীয় বলয় হতে বেড়িয়ে এসে স্থানীয় ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়ে নির্মিত হতে থাকে। সুলতানী আমলে গড়ে উঠা স্থাপত্য

১. Muhammad Hafizullah Khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1988, p. 208

২. David J. McCutchion, *Late Mediaeval Temples of Bengal*, Calcutta, Asiatic Society,1972, p.1

৩. George Michell, " The Revival of Hindu Temple Architecture in Bengal in the Late-Sixteenth Century" in *Bangal Art*, Enamul Haque (ed.), vol-2, Dhaka, ICSBA, p. 196

শৈলী ও বাংলার স্থানীয় ঐতিহ্যে ছাদ নির্মাণ করে মন্দির স্থাপত্য পরিকল্পনা ও শৈলীতে বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম হয়। সুলতানী আমলে ইট ও পোড়ামাটির অলংকরণে স্থাপত্য নির্মাণের যে ধারা সূচিত হয়েছিল মুঘল আমলে মুসলিম স্থাপত্যে তার অবসান ঘটে। নতুন শাসনগোষ্ঠি কর্তৃক বিজিত রাজ্যে তাদের রাজকীয় চিহ্ন চাপিয়ে দেওয়াই সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী ঐতিহ্যের বিলুপ্তির কারণ ছিল। তবে মুসলিম স্থাপত্যে স্থানীয় ঐতিহ্যের অবসান হলেও মন্দির স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণ দ্বিগুণ উৎসাহে চর্চিত হতে থাকে।

কোদলা মঠ

বাগেরহাট জেলা সদরের কোদলা গ্রামে কোদলা মঠটি অবস্থিত। মঠের দক্ষিণ দিকের কার্নিশের নিচের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে মঠটি কোন একজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক কোন বিখ্যাত ব্যক্তি স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। শিলালিপিটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। প্রচলিত মত অনুযায়ী মঠটি রাজা প্রতাপাদিত্য তার সভাকবি (দ্বারপন্ডিত) অবিলম্ব সরস্বতীর স্মৃতির উদ্দেশ্য নির্মাণ করেছিলেন।[১] মঠটির নির্মাণের তারিখ পাওয়া না গেলেও বর্ধমানের বৈদ্যপুর দেউলের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এটি ষোল শতকের তৃতীয়ভাগে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[২]

চিত্র: ৫.৫

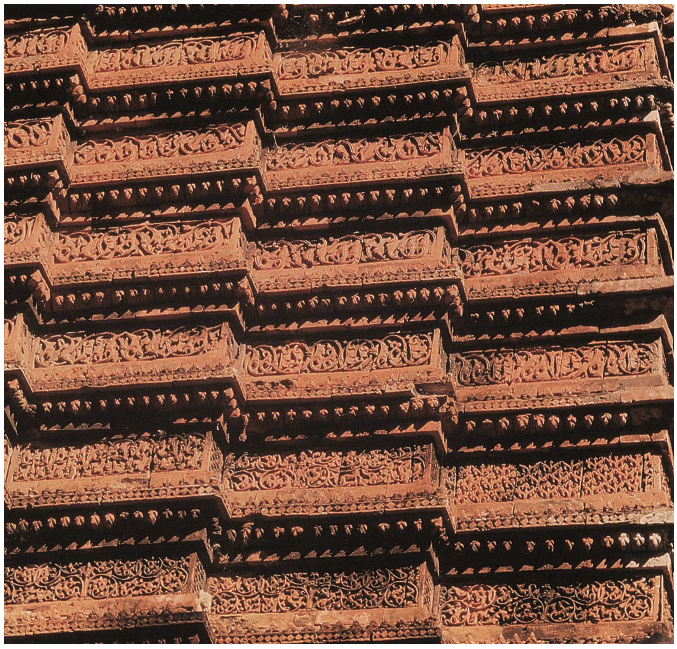

চিত্র: ৫.৬

১. সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোর খুলনার ইতিহাস*, খুলনা, রূপান্তর, পুনরমুদ্রণ ২০০১, পৃ. ৫৫৩

২. George Michell, *op.cit.*, p. 201

মঠটি একটি এককক্ষ বিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত। এর আয়তন ৮.৪৩ বর্গমিটার। মঠের বহির্দেয়াল প্রতিটি পাঁচটি ধাপে নির্মিত নবরথ পরিকল্পনা বলা যায়। মঠের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে মোট তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। প্রবেশপথগুলো দ্বিকেন্দ্রীক এবং এই খিলানের সামনে আর একটি বহুখাঁজ খিলান নকশা রয়েছে। খিলানগুলো আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে স্থাপিত। সমগ্র মঠটি ২১.৩৩ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। মঠের কোণাগুলো ছাদের দিকে ক্রমশঃ বাঁকা হয়ে একটি বিন্দুতে যেয়ে মিশেছে। এই ধরণের বাঁকযুক্ত মন্দির উড়িষায় 'রেখা দেউল' নামে পরিচিত। উত্তরভারতে একে 'নাগর' রীতি বলে। মঠের দেয়াল ২.৬১ মিটার পুরু।

অলংকরণ

মঠের মাঝামাঝি উচ্চতায় একটি চওড়া ব্যান্ড সমগ্র মঠটিকে দুইভাগে ভাগ করেছে। মঠের ভিত্তির উপর হতে শীর্ষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেয়ালে নির্দিষ্ট দূরত্বে আড়াআড়ি ভাবে নির্মিত স্বল্প উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত। দুই ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অংশ পোড়ামাটির ধারাবহিক পাড় নকশা দ্বারা পূর্ণ। ব্যান্ডগুলো লজেন্স নকশায় সজ্জিত। মধ্যবর্তী পাড় নির্মাণে পরস্পর সংযুক্ত লতা, প্যাঁচানো লতা ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ নকশার ব্যবহার দেখা যায়। লতা পাড় নকশাগুলো মঠের চার দেয়ালজুড়ে বিস্তৃত। দরজার ফ্রেমগুলোর উপরে একসাারি খোপ নকশা রয়েছে। সতীশ চন্দ্র মিত্র যখন এই মঠ পরিদর্শন করেছিলেন তখন তিনি এর পূর্ব দেয়ালে দুইজন গজারোহী ও দুই জন ধনুর্বিদের চিত্র সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক দেখেছিলেন। এছাড়া এর দক্ষিণ দেয়ালের কার্নিশে একটি মকর চিত্রিত ফলক দেখেছিলেন।[১] কিন্তু বর্তমানে এই ফলকগুলি বিলুপ্ত হয়েছে।

সাধারণ আলোচনা

কোদলা মঠ ষোল শতকে টিকে থাকা স্বল্প সংখ্যক হিন্দু স্থাপনার একটি। মঠটিতে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকগুলো আদতে হিন্দু বৌদ্ধ যুগের অলংকরণ। তবে তা মন্দির স্থাপত্যের ধারাবাহিকতায় ব্যবহৃত হয়নি বরং সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের মধ্যে দিয়ে তা পুনরায় হিন্দু মন্দিরের অলংকরণ হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। অলংকরণগুলো মুসলিম-পূর্ব যুগে পাথরে খোদাই অলংকরণে ব্যবহৃত হত। মুসলমানগণ কর্তৃক তা পোড়ামাটির অলংকরণে ব্যবহৃত হয়ে অপূর্ব সুক্ষতা অর্জন করেছে। স্থাপত্য অলংকরণে ভাস্কর্যের সীমিত ব্যবহার সম্ভবতঃ মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব।

১. সতীশচন্দ মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৩

বৈদ্যপুরের কৃষ্ণ মন্দির (জোড়া দেউল)

মন্দিরটি ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুর গ্রামে অবস্থিত। এটি একটি রেখা রীতির মন্দির। মন্দিরের দেয়ালে প্রথিত একটি শিলালিপি হতে এর নির্মাণের তারিখ পাওয়া যায় ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।[১]

চিত্র: ৫.৭

বৈদ্যপুরের দেউলটি দুটি বর্গাকার কক্ষ সহযোগে গঠিত। মন্দিরের ছাদ নির্মাণে সম্ভবতঃ চৌচালা ব্যবহৃত হয়েছিল যাদের প্রান্তীয় বক্রতা এখনও দৃশ্যমান। কক্ষ দুটির উচ্চতা ও আয়তন এক নয়। এর মধ্যে উঁচু টাওয়ার যুক্ত কক্ষটি গর্ভগৃহ হিসাবে চিহ্নিত। একটি নিচু খিলান-পথ দ্বারা কক্ষ দুটি সংযুক্ত। মন্দিরের ক্ষুদ্রাকার কক্ষ বিশিষ্ট অংশটি উত্তরমুখী প্রবেশপথ সম্বলিত। এর পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে আয়তাকার প্যানেলে স্থাপিত দুটি বদ্ধ খিলান নকশা রয়েছে। অপরদিকে বৃহদাকার মন্দির অংশের প্রবেশদ্বার পূর্বমুখী। এর পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি প্যানেলের মধ্যে স্থাপিত খিলান নকশা রয়েছে। পূর্ব দেয়ালে খিলানটি একটি অন্তর্নিবিষ্ট আয়তাকার প্যানেলে

১. George Michell, *op.cit*. p. 199; A. K. Bhattacharya, *A Corpus of Dedicatory Inscription from Temples of West Bengal (c 1500 AD to c 1800 AD)*, Calcutta, 1982, no. 6; মন্দিরের সম্মুখে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব জরিপ বিভাগ কর্তৃক স্থাপিত বোর্ডের বর্ণনায় এর নির্মাণকাল ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাপিত। দ্বিকেন্দ্রীক খিলানটির প্যানড্রিলে কোন আলংকরণ বর্তমানে টিকে নেই। খিলান হতে কিছুটা উপরে আয়তাকার প্যানেলের শীর্ষে একসারি পদ্ম ও ধনুকের ন্যায় অলংকরণের পাড় রয়েছে। সমগ্র খিলান প্যানেল দুটি সরু বর্ডার ফ্রেমে আবদ্ধ। সরু বর্ডার দুটির নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর পদ্ম মোটিফে শোভিত। অপর দিকে বর্ডার দুটির মধ্যবর্তী অন্তর্নিবিষ্ট অংশ একটি লতানো ধারাবাহিক অলংকরণ সজ্জিত। এই ধরণের ফ্রেম অলংকরণ অষ্টগ্রামের কুতুব মসজিদেও দেখা যায়। খিলান ফ্রেমের উপরের অংশে দুটি উদ্গাত ব্যান্ড রয়েছে। ব্যান্ডগুলো দুই পার্শ্বে দন্ত নকশায় সজ্জিত। এদের নীচে একটি করে নকশা যুক্ত পাড় রয়েছে। নিচ হতে প্রথম ব্যান্ডটির নিচে রয়েছে একসারি ঝুলন্ত মালা নকশা। দ্বিতীয় ব্যান্ডের নিচে চারপত্র যুক্ত ফুলের জালি নকশা দেখা যায়। এর উপরে একসারি ক্ষুদ্র ষ্টাইলাইজড মারলন নকশার পাড় দ্বারা খিলান ফ্রেমটি শেষ হয়েছে। খিলান ফ্রেমের কিছুটা উপরে আড়াআড়ি ভাবে বিন্যস্ত একটি সারিতে উপস্থাপিত হয়েছে ‘রাম-রাবণের যুদ্ধের কাহিনী’ সম্মলিত পোড়ামাটির ফলক। ফলকসারির মাঝামাঝি স্থানে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি।

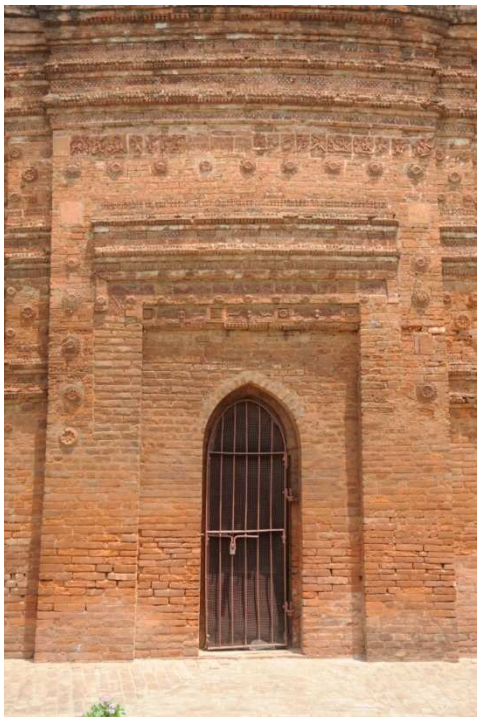

চিত্র: ৫.৮

ভাস্কর্য সম্বলিত এই সারির নিচে নির্দিষ্ট দুরত্বে একসারি পদ্ম নকশা রয়েছে যা খিলানের দুই পার্শ্বের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। মন্দিরটি সপ্তরথ পরিকল্পনায় নির্মিত। তাই এর মধ্যবর্তী অংশ পার্শ্ব দেয়াল থেকে বর্ধিত আকারে নির্মিত এবং দুই পার্শ্বের দেয়াল তিনটি ধাপে নির্মিত হয়েছে। এর খিলান ফ্রেমের উপরে নির্মিত উদ্গাত দুটি ব্যান্ড নকশা এর পার্শ্ব দেয়ালে আরও দুটি উদ্গাত ব্যান্ড রয়েছে। এর কিছুটা নিচে পার্শ্ব দেয়ালে আরও দুটি উদ্গাত ব্যান্ড

রয়েছে। এদের মধ্যবর্তী অংশ ছড়ানো ছিটানো পদ্ম নকশায় সজ্জিত। কার্নিশের নিচে দুটি উদ্গাত ব্যান্ড নকশা রয়েছে যার উপর নিচ ও মধ্যবর্তী অংশে তিনটি নকশাকৃত টেরাকোটা পাড় রয়েছে। সবচেয়ে নিচের পাড়টিতে ঝুলন্ত মালা নকশা, দুই ব্যান্ডর মধ্যবর্তী অংশে দাবার কোর্টের মত ছক নকশা, ও উপরে চারপত্র যুক্ত ফুলের জালি নকশা দেখা যায়। মন্দিরের দেয়ালের উদ্গাত ব্যান্ডগুলো লজেন্স নকশা ও তিন পত্রযুক্ত সূঁচালো নকশায় সজ্জিত।

চিত্র: ৫.৯

এদের উপরে ও নিচে ঝুলন্ত মালা নকশা রয়েছে। ব্যান্ডগুলো মন্দিরটিকে বেষ্টন করে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। বৃহৎ মন্দিরটির দক্ষিণ দেয়ালে রয়েছে একটি বদ্ধ খিলান । খিলানটি পূর্বদেয়ালের ন্যায় আয়তাকার অন্তর্নিবিষ্ট ফ্রেমে স্থাপিত। তবে এখানে নকশাগুলো অধিক সংরক্ষিত। খিলানটি দ্বিকেন্দ্রীক কিন্তু এর সামনে একটি বহুখাঁজ খিলান নকশা রয়েছে। খাঁজ খিলানের প্রান্তরেখা মাছের আঁশ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্ম পাপড়ির দ্বারা সৃষ্টি বর্ডার যুক্ত। প্রতিটি খাঁজ হতে একটি করে পদ্ম কলি উর্ধ্বমুখে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। খিলান স্প্যানড্রিলে রয়েছে দুটি চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা। স্প্যানড্রিলের প্রান্তীয় অঞ্চলে স্টাইলাইজড লতার নকশা রয়েছে। আয়তাকার প্যানেল দুটি ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। প্রথম ফ্রেমটি পদ্ম ও তিন সারিতে বিন্যস্ত মাছের আঁশের ন্যায় নকশার ধারাবাহিক বিন্যাসে সজ্জিত। দ্বিতীয় বা বাইরের ফ্রেমেটি দুইপার্শ্বে পদ্ম নকশার বর্ডার যুক্ত। মধ্যবর্তী অংশে পরস্পর সংযুক্ত ফিতা নকশার মধ্যে সৃষ্ট খোপে চারপল্লব বিশিষ্ট ফুল দ্বারা শোভিত। ফ্রেমের উপরে পূর্ব দেয়ালের খিলান ফ্রেমের ন্যায় ব্যান্ড ও পাড় নকশায় সজ্জিত। বৃহৎ দেউলটির কার্নিশের উপরের অংশ আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত বারটি উদ্গাত ব্যান্ড যুক্ত। ব্যান্ডগুলো চার দেয়াল বেষ্টন করে রেখেছে। ব্যান্ডগুলোর মধ্যবর্তী অংশে বর্তমানে কোন অলংকরণ নাই তবে দুটি

ব্যান্ড পর পর তৃতীয় ব্যান্ডে প্রতি দেয়ালে ছয়টি করে ফোঁকরের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের অভ্যন্তর আলোকিত করণে ও বায়ু চলাচলের উদ্দেশেই সম্ভবত এদের সৃষ্টি।

চিত্র: ৫.১০

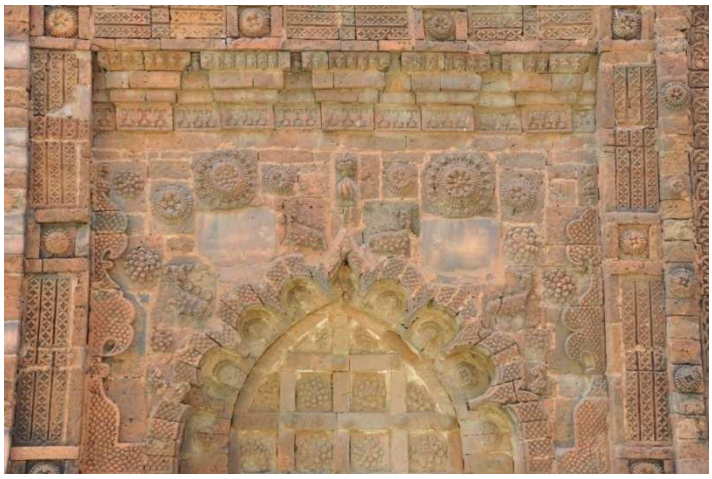

চিত্র: ৫.১১

চিত্র: ৫.১২

ক্ষুদ্র দেউলটির উত্তরপার্শ্বে একটি প্রবেশপথ রয়েছে। এই প্রবেশপথটিও আয়তাকার প্যানেলে স্থাপিত ও ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। খিলান প্যানেলের বাইরে দুটি ফ্রেমের মধ্যে ভিতরেরটি বৃহৎ দেউলের পূর্ব দেয়ালের খিলানের ভিতরের ফ্রেমের অনুরূপ আর বাইরের ফ্রেমটি বৃহৎ দেউলের দক্ষিণ দেয়ালের বদ্ধ খিলানের বহির ফ্রেমের নকশার অনুরূপ। তবে এখানে ফিতার পরিবর্তে পরস্পর সংযুক্ত লতা নকশা ব্যাহৃত হয়েছে। খিলানটি দ্বিকেন্দ্রীক এর সামনে একটি খাঁজ খিলান নকশা সংযুক্ত করা হয়েছে। খিলান স্প্যানড্রিলে লতা নকশার মধ্যে একসময় চক্রাকার পদ্ম নকশা ছিল বলে মনে হয় যার চিহ্ন এখনও বর্তমান। লতা হতে একসারি কলি নকশা প্যানেলের উর্দ্ধমুখে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। স্প্যানড্রিলে দুই প্রান্তীয় এলাকায় স্টাইলাইজড লতা নকশা দেখা যায়। খিলান ফ্রেম ছাড়া সমগ্র

উত্তর দেয়াল আড়াআড়ি ব্যান্ডে বিভক্ত। ব্যান্ডগুলো তিনপত্রযুক্ত সূঁচালো নকশা সজ্জিত। দুটি ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অংশে চারপত্র বিশিষ্ট ফুলের জালি নকশা, জাল নকশা, ঝুলন্ত মালা নকশা, পরস্পর সংযুক্ত লতা নকশার পাড় রয়েছে।

সাধারণ আলোচনা

বৈদ্যপুর দেউলে ব্যবহৃত পোড়ামাটির অলংকরণে প্রায় সম্পূর্ণই মুসলিম স্থাপত্য অলংকরণের প্রভাবে সৃষ্ট। এখানে শুধুমাত্র পূর্ব-দেয়ালে একসারি টেরকোটা ফলকে লঙ্কা যুদ্ধের দৃশ্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রাণীবাচক ভাস্কার্য উৎকীর্ণ হয়েছে। এই ধরণের একসারি অলংকরণ ১৪৬২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত বর্ধমানের বরাকর মন্দিরেও দেখা যায়। বৈদ্যপুর দেউল একশত বছরের বেশী পুরাতন এই ধারাটি অনুসৃত হয়েছে। পার্থক্য শুধু নির্মাণ মাধ্যমে। বরাকরের মন্দিরগুলো পাথরের তৈরী।

মথুরাপুর দেউল

ফরিদপুর জেলা বালিয়াকান্দি উপজেলায় মধুখালি ইউনিয়নে মথুরাপুর গ্রামে দেউলটি অবস্থিত। (উড়িষায় রেখা রীতির মন্দিরগুলো দেউল নামে পরিচিত) মন্দিরটিতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে বৈদ্যপুরের দেউলে সাথে তুলনা করে এটিকে সতের শতকের প্রথম পর্যায়ে নির্মিত মন্দির বলে ধারনা করা হয়।[১] এটি একটি রেখা রীতির দ্বাদশপার্শ্ব বিশিষ্ট মন্দির। এর বহির দেয়ালের অন্তর্নিবিষ্ট উল্লম্ব অংশগুলো মন্দিরটিকে তারকা আকৃতি দান করেছে। বাংলায় এই ধরনের পরিকল্পনা বিশিষ্ট মন্দিরের এটি একমাত্র উদাহরণ। এর প্রতিটি বাহু ৩.২৫ মিটার ও উচ্চতা প্রায় ২১.০৩ মিটার। মন্দিরটির দক্ষিণ দেয়ালে একটি মাত্র প্রবেশপথ রয়েছে। বাকী তিন দিকে বদ্ধ খিলান নকশা দেখা যায়। প্রতিটি খিলান আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে স্থাপিত। মন্দিরের মাঝামাঝি উচ্চতায় একটি আড়াআড়ি চওড়া ব্যান্ড নকশা দ্বারা মন্দিরটির চুঁড়া অংশকে পৃথক করা হয়েছে। কোদলা মঠের ন্যায় এখানেও মন্দিরের নিচ হতে শীর্ষ পর্যন্ত আড়াআড়ি ব্যান্ড নকশায় দেয়াল আবৃত। যা মন্দির দেয়ালে আলো ছায়ার এক অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে।

অলংকরণ

দেউলটির অলংকরণ শুরু হয়েছে এর ভিত্তিভূমি থেকে। মন্দিরের অনুচ্চ ভিত্তিভূমিতে চতুর্দিকে আড়াআড়িভাবে একসারি বর্গাকার খোপ সৃষ্টি করে প্রতিটিতে একটি চক্রকার পদ্ম স্থাপন করা হয়েছে। এর উপরে রয়েছে একটি সরু বর্ডার যাতে নির্দিষ্ট দূরত্বে ক্ষুদ্রাকার পদ্ম নকশা রয়েছে। এর কিছুটা উপরে নির্দিষ্ট দূরত্বে এক সারি ক্ষুদ্রাকার

১. George Michell, *op.cit.*, p. 203

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

(চ)

চিত্র: ৫.১৩

মারলন নকশা ও এর নিচে একসারি পোড়ামাটির পাড় নকশা দিয়ে মন্দিরের মূল অলংকরণের সূচনা হয়েছে। সমগ্র মন্দিরগাত্রকে আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত চারদিকে বেষ্টনকৃত ব্যান্ড নকশা দিয়ে পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। দুটি ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে অলংকৃত পোড়ামাটির পাড় নকশা। পাড় নকশার মধ্যে জালি নকশা, প্যাঁচানো লতা নকশা, পুষ্পযুক্ত প্যাঁচানো লতা নকশা, অলংকৃত জালের প্রতিটি খোপে ক্ষুদ্র পুষ্প নকশা, চার পল্লবযুক্ত ফুলের জালি নকশা, পরস্পর সংযুক্ত ফিতা নকশা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। পাড় নকশাগুলো কর্ণিশ পর্যন্ত বিস্তৃত অংশে স্থাপিত হয়েছে। কর্ণিশের উপরে ব্যান্ডগুলোর মধ্যবর্তী অংশে অলংকরণ বিহীন।

মন্দিরের চারদিকে চারটি খিলান রয়েছে যাদের একটি ছাড়া বাকি তিনটিই বদ্ধ খিলান। খিলানগুলো দুটি ফ্রেম দ্বারা আবদ্ধ। ভেতর দিকে ফ্রেমে চক্রবদ্ধ পদ্ম ও ধনুকের ধারাবাহিক নকশা ছিল যার কিছু নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। বাইরের ফ্রেমগুলো বর্তমানে শূন্য তবে বিভিন্ন খোপে বিভক্ত, যা দ্বারা মনে হয় তা এখানে চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা শোভা পেতো। প্রবেশ খিলানের ভিত্তি অংশে দুই পার্শ্বে নৃত্যরতা নারী-পুরুষের চিত্রফলক সম্বলিত দুটি আয়তাকার প্যানেল রয়েছে। খিলানগুলো দ্বিকেন্দ্রীক ও আয়তাকার প্যানেলে স্থাপিত। দ্বিকেন্দ্রীক খিলানের সামনে আর একটি বহুখাঁজ খিলান রয়েছে। খিলান স্প্যানড্রিলে ছোট-বড় পদ্ম নকশা দেখা যায়। স্প্যানড্রিলের প্রান্তীয় অঞ্চলে বিমূর্ত লতা নকশা রয়েছে। যার বিভিন্ন অংশ হতে পদ্ম কলি উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।

মন্দিরের খিলান ফ্রেমের উপরে প্রতি দুটি ব্যান্ডের মধ্যে একটি করে মোট ছয়টি সারিতে উপস্থাপিত হয়েছে কৃষ্ণলীলা ও রামায়নের বিভিন্ন ঘটনার দৃশ্য। এছাড়া রাজকীয় শোভাযাত্রার চিত্রও এখানে দেখা যায়। এই ছয় সারির উপরের সারিগুলোতে মন্দিরের খাঁজ অংশে স্থাপন করা হয়েছে কীর্তিমুখ[১] ও কিছু পৌরাণিক চরিত্র। খাঁজের দুই পার্শ্বে দেয়ালে রয়েছে উল্লম্ফ মান ঘোড়া/সিংহ[২] ভাস্কার্য। মন্দিরের কার্নিশের নিচে একসারি পদ্মকলি ভাক্ষণরত সিংহ বা ব্যাল[৩] উৎকীর্ণ করা হয়েছে। মন্দিরের উপরের দিক হতে দ্বিতীয় সারিতে শশ্রুযুক্ত মুসলিম পোষাক ও পতাকা হাতে সৈন্য ও দুটি ঘোড়ার লাগাম ধরে বশে আনার জন্য চেষ্টারত এজন মুসলিম পোষাকধারীর চিত্র পাওয়া যায়।

প্রতিটি ব্যান্ড অপূর্ব সজ্জায় অলংকৃত। এর নির্দিষ্ট দুরত্ব পর পর রয়েছে চক্রবদ্ধ রোজেট। এই রোজেটসমূহের উপর দিয়ে সমগ্র ব্যান্ড ঘিরে রয়েছে একটি লজেন্স পাড়ের সারি যাতে ব্যান্ডগুলো হয়ে উঠেছে জাঁকালো।

সাধারণ আলোচনা

---

১. কীর্তিমুখ: এটি মূলত: রাহুর মুখ। রাহুর মাতা সিংহিকা, তাই রাজ সৈংহিকেয়। মুখটি সিংহ সদৃশ, চোয়ালের নিচের অংশ নেই।

২. লম্ফমান সিংহ: শক্তির প্রতীক।

৩. ব্যাল: শ্বাপদ হিংস্র জন্তু, শক্তির প্রতীক

বাংলার মন্দির স্থাপত্যে পরিকল্পনা ও অলংকরণ উভয় দিক দিয়েই মথুরাপুর দেউল একটি অনন্য উদাহরণ। এই মন্দিরের অলংকরণের মধ্য দিয়ে বাংলার মন্দির স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দৃশ্যমান হয়। পনের ও ষোল শতকে নির্মিত মন্দিরসমূহে খুব সামান্য পরিসরে মনুষ্য ও জীবজন্তুর উপস্থাপন চোখে পড়ে। মন্দিরগাত্রের অন্যান্য অলংকরণ ছিল উদ্ভিজ্জ, জ্যামিতিক ও বিমূর্ত অলংকরণে সমৃদ্ধ। মথুরাপুর দেউলে মানুষ ও প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ ও উপস্থাপন বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায় বৈদ্যপুরের অনুরূপ কিন্তু প্রবেশেরদ্বারের উপরে এখানে ছয় সারিতে রামায়ন ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে যা বাংলার মন্দির গাত্রালংকারের ভবিষ্যৎ চরিত্র নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তী মন্দির গাত্রের ভিত্তিভূমিতে সামাজিক চিত্র ও দেয়ালগাত্রে রামায়ন কৃষ্ণলীলার সারিবদ্ধ দৃশ্য চিত্রায়ণের সূচনা-পর্বের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা।

শ্যাম-রায় মন্দির

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে শ্যাম-রায় মন্দিরটি অবস্থিত। এটি বিষ্ণুপুর তথা সমগ্র পশ্চিবঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক অলংকৃত মন্দির। পাঁচ-শিখর বিশিষ্ট এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটির পূর্ব দেয়ালে প্রথিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এটি মল্লরাজ বীর হাম্বীরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক ৯৪৯ মল্ল সকে, সেই অনুসারে ১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়।[১]

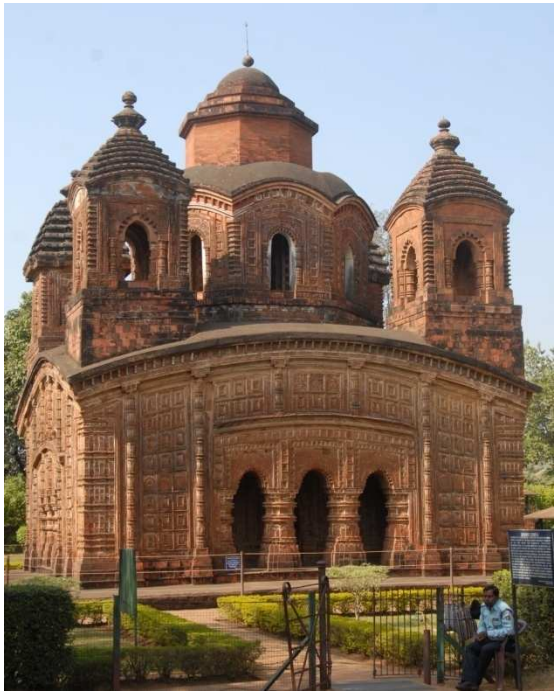

চিত্র: ৫.১৪

১. অমিয় কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি* , কলকাতা, পুর্ত বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭১, পৃ. ৮৯

দক্ষিণমুখী বর্গাকার ভিত্তির মন্দিরটির প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য ১১.২ মিটার। দ্বিতল এই মন্দিরের প্রথমতলার কেন্দ্রে রয়েছে একটি বর্গাকার গর্ভগৃহ এবং এর চতুর্দিকে বেষ্টন করে রয়েছে দুটি প্রদক্ষিণপথ। বাইরের দিক থেকে প্রথম প্রদক্ষিণপথের চারদিকের দেয়ালে ত্রিখিলান প্রবেশপথ রয়েছে। ভেতরের প্রদক্ষিণপথের প্রতিটি দেয়ালে খিলান পথের সংখ্যা একটি। খিলানগুলো বহুখাঁজ বিশিষ্ট। মন্দিরের কার্নিশ সুঢৌল বাঁকযুক্ত। এর দ্বিতীয়তলের চার কোণে নির্মিত হয়েছে চারটি ক্ষুদ্রাকৃতির শিখর। শিখরসমূহ চৌচালা ছত্রী আকারে নির্মিত। এদের মাঝখানে পঞ্চম শিখরটি অষ্টকোণাকৃতির ও প্রতি পার্শ্বে খিলানকৃত প্রবেশপথ সম্বলিত। এর কেন্দ্রে নিচের তলার বর্গাকার গর্ভগৃহের আয়তনে নির্মিত হয়েছে একটি বর্গাকার কক্ষ। অষ্টকোণাকার শিখরটি অপর একটি ক্ষুদ্র অষ্টকোণাকার শিখর শোভিত। মন্দিরের ঢালু ছাদ ও এর রত্নসমূহের শীর্ষদেশ ব্যাতীত এর ভেতর,বাহির,অভ্যন্তরীণ ছাদসহ সকল স্থান পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। এর কিছু কিছু অংশ বর্তমানে সংস্কারের ফলে অলংকরণ শূণ্য রয়েছে।

অলংকরণ

মন্দিরের বহির্দেয়ালের প্রতি পার্শ্বে, কেন্দ্রে রয়েছে ত্রিখিলান প্রবেশপথ। প্রবেশপথ তিনটি একসারি খোপ নকশার ফ্রেম দ্বারা তিনদিকে আবদ্ধ। খিলানের উপরের প্যানেলসমূহ একই ধরণের খোপ নকশার উল্লম্ব বিন্যাসের দ্বারা একটি অপরটি থেকে পৃথক। খোপ নকশাসমূহ রাধা-কৃষ্ণের ভাস্কর্য সম্বলিত ফলকে অলংকৃত। খিলান প্যানেল অলংকরণে কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণের বিভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। এছাড়া নৃত্য ও বাদনসহ কৃষ্ণলীলার দৃশ্যসমূহ দেয়ালের কোণগুলোতে ও অন্যান্য খোপ নকশায় উপস্থাপিত হয়েছে। শ্যম-রায় মন্দিরের মূল আকর্ষণ কৃষ্ণলীলা। বিভিন্ন আঙ্গিকে এর উপস্থাপন মন্দিরের ভেতর ও বাইরে পরিলক্ষিত হয়। সবচাইতে বেশী চোখে পরে চক্রাকারে উপস্থাপিত রাসলীলার দৃশ্য । এই দৃশ্যের মধ্যমণি রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও এর চারিদিকে চক্রাকারে ঘিরে গোপীদের নৃত্য বৃত্তাকারে উপস্থাপিত হয়। কখনো নৃত্যরতা গোপীরা দুটি বৃত্তে উপস্থাপিত হয়েছে। শ্যাম-রায় মন্দিরে এরূপ ছোট বড় প্রায় চল্লিশটি রাসলীলার দৃশ্য পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে।[১] বেশ কিছু স্থানে রামায়ণের যুদ্ধদৃশ্য দেয়াল অলংকরণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই মন্দিরের একটি ফলকে পারসিক মহাকাব্য ‘শাহনামা’[২] র একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ‘সিমূর্গ’ এর উপস্থাপন বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

---

১. চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, *ভারতের শিল্পসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুর মন্দিরের টেরাকোটা*,বিষ্ণুপুর, শ্রীমতি সুষমা দাশগুপ্ত, ১৪০৭, পৃ. ৪৩২

২. ‘শাহনামা’ গজনীর সুলতান মাহমুদের (৯৯৯- ১০৩০ খ্রি.) পৃষ্ঠপোষকতায় কবি ফেরদৌসী রচিত পারসিক রাজাদের অমর গাঁথা সম্বলিত কাব্যগ্রন্থ। পৌরানিক কাহিনী ভিত্তিক এই কাব্যগ্রন্থে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের সামরিক অভিযান এবং বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এটি ইরানের জাতীয় ইতিহাসের একটি অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন চিত্র পারস্য ও মুঘল চিত্রশালায় চিত্রিত হয়েছে ।

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

(চ)

(ছ)

চিত্র: ৫.১৫

শ্যাম-রায় মন্দিরে ছোট-বড় নানা আকারের চিত্রফলক এর অঙ্গ সজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছে। ফলকগুলো অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে উৎকীর্ণ। এই সুক্ষ্মতা ক্ষুদ্র ফলকগুলোতে অধিক পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ফলকে উৎকীর্ণ রথগুলো পিতল বা কাঠের রথের অনুরূপভাবে উপস্থাপিত। এখানে উপস্থাপিত লতা নকশার পাড় ও রথ নকশায় যে সুক্ষ্মতা পরিলক্ষিত হয় তার কোন তুলনা বাংলার স্থাপত্যে নেই।

সাধারণ আলোচনা

মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুর এর অপূর্ব অলংকৃত মন্দিরসমূহের জন্য বিখ্যাত। বিষ্ণুপুরের 'রাজপঞ্জি' অনুসারে মল্ল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আদিমল্ল যিনি ৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১] আদি মল্লের প্রকৃত নাম ছিল রঘুনাথ। ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর ৫৫ জন উত্তরাধিকারী প্রায় একহাজার বছর এই রাজ্য শাসন করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্য অনুসারে ষোল শতকের শেষ দিকে শ্রীনিবাস আচার্য্য শাস্ত্র অধ্যায়ন শেষে একগাড়ি শাস্ত্র গ্রন্থ নিয়ে বাংলায় ফেরার পথে বন-বিষ্ণুপুরে ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হন। তার সমস্ত গ্রন্থ ভর্তি গাড়ি ধন-দৌলত মনে করে ডাকাতদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। লুণ্ঠিত গ্রন্থ উদ্ধারের আশায় শ্রীনিবাস মল্লভূমের রাজ বীর হাম্বীরের রাজ সভায় উপস্থিত হন। শাক্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসের সাধুবৎ চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে সপরিবারে তাঁর কাছে বৈষ্ণব মতবাদের দীক্ষা নেন। বীর হাম্বির এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্র রঘুনাথ সিংহ ও বীর সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় সারা সতের শতক জুড়ে বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব "প্রেমভক্তি মার্গ' এর কেন্দ্রে পরিণত হয় । এসময় বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত সাহিত্য ও সংগীত, মন্দির স্থাপত্য ও চিত্রকলা এর অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে।[২] বিষ্ণুপুরে কমপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ৩২টি মন্দির রয়েছে। এদের বেশীরভাগই (২২টি) 'ল্যাটেরাইট' বা 'ঝামা' পাথরের তৈরী। তবে মন্দিরসমূহের মধ্যে পোড়ামাটির চিত্র ফলক সম্বলিত মন্দিরগুলিই সবচাইতে অলংকৃত ও আকর্ষণীয়।

কেষ্ট-রায় জোড়া বাংলা মন্দির

এটিকে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলোর মধ্যে সুন্দরতম বলা চলে। উৎসর্গ লিপি হতে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মল্লরাজা বীর হম্বীরের পুত্র রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক নির্মিত।[৩] এটি একটি জোড়বাংলা রীতির মন্দির। দুটো দোচালা ঘরকে জোড়া দিয়ে জোড়াবাংলা নির্মিত হয়। কেষ্ট-রায় মন্দিরের দোচালা দুটির সংযোগস্থল ত্রিকোণাকার অংশে দেয়াল দ্বারা সংযুক্ত করে তার উপর শিখর আকারে নির্মাণ করা হয়েছে একটি ক্ষুদ্র চারচালা। মন্দিরটি প্রায় ১২ মিটার বর্গাকার ভিত্তির উপর নির্মিত। এর উচ্চতাও প্রায় ১১ মিটার। এটি একটি দক্ষিণমুখী মন্দির। এর প্রথম

১. Asok K. Bhattacharya, " Bishnupur Land of Wrestlers", in *Bengal Sites and Sights*, Protapaditya Pal and Enamul Haque (ed.), Mumbai, Marg Publication, 2003, p. 102
২. Asok K. Bhattacharya, *Ibid*, p.103
৩. অমিয় কুমার বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

দোচালার দক্ষিণ দেয়ালে তিন-খিলান প্রবেশপথ রয়েছে। দ্বিতীয় দোচালাটি গর্ভগৃহ। প্রথম দোচালার অভ্যন্তরে উপরের চারচালা শিখরে উঠার জন্য একটি সিঁড়ি রয়েছে। দ্বিতীয় দোচালা যা গর্ভগৃহ হিসাবে তৈরী এর পূর্ব দেয়ালে একটি প্রবেশপথ আছে। সম্মুখের দোচালা হতে গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য এর দক্ষিণ দেয়ালে রয়েছে আরও একটি প্রবেশপথ। প্রথম দোচালার প্রবেশ-খিলানগুলি দুটি স্তম্ভ দ্বারা সমর্থিত। খিলানগুলো দ্বিকেন্দ্রীক। মন্দিরের উত্তরের দেয়ালে দক্ষিণ দেয়ালের অনুরূপ তিনটি খিলান দেখা যায় কিন্তু খিলানগুলো বদ্ধ আকারে নির্মিত। জোড়বাংলার উপরে নির্মিত চারচালা শিখরটি চারদিকে চারটি খিলান দ্বারা উন্মুক্ত।

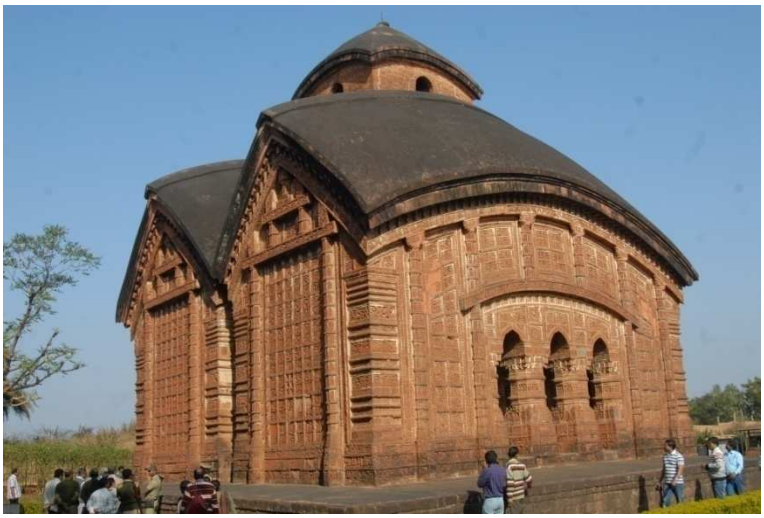

চিত্র: ৫.১৬

অলংকরণ

দক্ষিণমুখী মন্দিরটির দক্ষিণ দেয়ালের তিন খিলান প্রবেশ-দ্বারটি দুটি সংলগ্ন স্তম্ভ দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি প্যানেলে স্থাপিত হয়েছে। স্তম্ভ দুটির উপরে স্থাপিত একটি বক্র আড়াআড়ি প্যানেল খিলান প্যানেলটিকে ঘিরে রেখেছে। সংলগ্ন স্তম্ভটি অর্ধ অষ্টভূজাকৃতির ও নির্দিষ্ট দুরত্ব পর পর উদ্গাত ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত। দুটি ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অংশে প্রতি দিকে একটি করে উল্লম্ব প্যানেলে পোড়ামাটির মনুষ্য চিত্রের ফলক নকশা রয়েছে। খিলানের উপরের আড়াআড়ি বক্র প্যানেলে রথে দন্ডায়মান ধনুক হাতে আক্রমনকারী একটি পুরুষের চিত্র বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে প্যানেলটি পূর্ণ করা হয়েছে। খিলান তিনটি দুটি বর্গাকার ভিত্তির উপর বহুপার্শ্ব যুক্ত খিলানের উপর প্রতিষ্ঠিত। খিলানগুলো দ্বিকেন্দ্রীক। এর প্রান্তরেখা ধরে একসারি প্যাঁচানো লতা নকশা রয়েছে। এই প্যাঁচানো লতা নকশাটি প্রতিটি খিলান প্যানেলের ফ্রেমে ও স্তম্ভশীর্ষে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিটি খিলানের শীর্ষে একটি করে পতাকা শোভিত কলস নকশা রয়েছে। কলসের দুই পার্শ্বে কেন্দ্রীয় খিলানে মুখোমুখি সংঘর্ষরত রথারোহী পুরুষের চিত্র সম্বলিত পোড়ামাটি ফলক স্থাপন করা হয়েছে। এর নীচে আরও দুটি ফলকে যুদ্ধ দৃশ্য দেখা যায়। পার্শ্ববর্তী খিলানগুলো

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

(চ)

(ছ)

চিত্র: ৫.১৭

প্যানেলেও যুদ্ধ দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। দুই খিলানের প্যানেলের মধ্যবর্তী স্তম্ভের উপরে, দুটি উপর-নীচে স্থাপিত রথরোহী যোদ্ধার চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। খিলান প্যানেলগুলোর উপরে বক্রাকার ব্যান্ড নিচে একসারি ক্ষুদ্র প্যানেলে যোদ্ধার একই চিত্র উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। প্রতিটি প্যানেল গোলাকার ও বরফি আকৃতির ধারাবাহিক পাড় নকশার বিভাজক দ্বারা পৃথক। স্তম্ভগুলো ক্ষদ্র ক্ষুদ্র পোড়ামাটির অলংকৃত ফলকে আবৃত। অধিকাংশ ফলকে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। তিন খিলান প্যানেলের উপরের বক্র প্যানেলের উপরে প্রায় কার্নিশ পর্যন্ত বিস্তৃত নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত চারটি ক্ষুদ্র সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভগুলো সরু অর্ধ-অষ্ট কোণাকৃতির ব্যান্ড যুক্ত ও পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ। স্তম্ভশীর্ষে একটি প্যানেলে দুইজন বাদক এর চিত্র সম্বলিত ফলক ও এর দুই পাশে দুইজন ক্রীড়াবীদ (এ্যাক্রোব্যাট) এর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দুটি স্তম্ভের মধ্যবর্তী অংশকে চারটি প্যানেল বিভক্ত করে প্রতিটি প্যানেলে রথারোহী যোদ্ধার দৃশ্য উপস্থাপন হয়েছে। পাশাপাশি দুটি ফলকে যোদ্ধারা মুখোমুখি ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তিন-খিলান প্যানেলের দুইপার্শ্বে দুটি করে উল্লম্ব খোপ সারিতে রথরোহী যোদ্ধার নকশাটির পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। খোপ সারিগুলোর পরে একটি করে অর্ধ-অষ্টকোণের সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। সংলগ্ন স্তম্ভগুলো দুই পার্শ্বে গোলাকার ফুল ও বরফির বর্ডার ও তার মাঝে লতা জালি নকশা দেখা যায়। মন্দিরের কোণগুলো ভিত্তির উপর থেকে কার্নিশ পর্যন্ত সামান্য অন্তর্নিবিষ্ট আকারে নির্মিত। কয়েকটি আড়াআড়ি ব্যান্ড দ্বারা কোণের দেয়াল অংশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। দুই ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অংশে নিচের দিকে কৃষ্ণলীলার দৃশ্য রয়েছে। উপরের দিকের প্যানেলে মহাকাব্যিক যুদ্ধের দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

সমগ্র মন্দিরের ভিত্তি অংশ তিনটি আনুভূমিক সারিতে সামাজিক ও পৌরাণিক কাহিনী বা দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে উপরের সারি কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশর জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য, দ্বিতীয় সারিতে মহাকাব্য রামায়ণের দৃশ্য, তৃতীয় সারিতে যুদ্ধ ও শিকার দৃশ্য দেখা যায়।

মন্দিরের পূর্ব দেয়ালের ভিত্তিতেও আড়াআড়ি তিন সারিতে অলংকরণ দেখা যায়। এর উপরের প্রথম সারিতে জঙ্গলে বিচরণরত হাতী, বাঘ ইত্যাদি এছাড়া কৃষ্ণ উপাখ্যানের বিভিন্নখন্ড চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। পূর্ব দেয়ালের ভিত্তির দ্বিতীয় সারিটি বেশ আকর্ষণীয় এখানে বেশ কিছু অদ্ভুত ধরনের প্রাণীর উপস্থাপন চোখে পরে। যার মধ্যে একটি ফলকে বিশালাকৃতির একটি পাখি তার পায়ে নখে আকরে ধরে কিছু হাতিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অপর একটি ফলকে একটি পাখাযুক্ত সিংহের চিত্র রয়েছে এটিও তার নখ দ্বারা খামচে ধরে কয়েকটি হাতিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সারির অন্যান্য ফলকের মধ্যে একটি মানুষের মাথা যুক্ত সিংহ ও দুই হাতে দ্বারা দুটি ঘোড়া ও দুই পা দ্বারা দুটি হাতিকে পেঁচিয়ে ধরে থাকা একটি মনুষ্য বা দানব মূর্তি রয়েছে। এর মধ্যে হাতিসহ পাখিটিকে

শাহনামায় বর্ণিত 'সিমুর্গ'[১] আর শেষক্ত ভাস্কার্যটিকে কেউ কেউ 'কমলেকামিনী' বলে চিহ্নিত কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন।[২] এছাড়া এই সারিতে আরো কিছু চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে যাদের মধ্যে কিছু নারী চরিত্র রয়েছে যারা পায়ের কাছে কুঁচিযুক্ত সলোয়ার, লম্বা কামিজ, কোমরে সাস ও ওড়না পরিহিত। পুরষ চরিত্রগুলো লম্বা জোব্বা ও কোমর বন্ধনী পাগড়ী পরিহিত।(চিত্র:) যা স্থানীয় পোষাকের সাথে নয় বরং ষোল শতকের পারসিক পোষাকের সাথে বেশী সদৃশ্যপূর্ণ। একেবারে নিচের প্যানেলে রয়েছে শিকার দৃশ্য। ভিত্তির উপরে দেয়ালের কোণের অন্তর্নিবিষ্ট অংশটির পার্শ্ব ঘেঁষে দুই ধারে দুটি সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভ দুটির মাঝখানের অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপে বিভক্ত করে তাতে স্থাপন্ন করা হয়েছে একক চিত্রিত ফলক।

পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের উর্ধ্বাংশে দুপাশের দুটি চালা যুক্ত হওয়ার কারণে যে কোণের সৃষ্টি হয়েছে তার নিচের দিকে সংলগ্ন স্তম্ভ দুটির উপরে একটি আড়াআড়ি উদ্গাত প্যানেলে পোড়ামাটির ভাস্কার্য অলংকরণ রয়েছে। এই প্যানেলটির উপরে দুটি খাটো সংলগ্ন স্তম্ভ ও তার দুপাশে দুটি অলংকৃত উল্লম্ব প্যানেল রয়েছে। খাটো স্তম্ভদুটির উপর ভিত্তি করে আরেকটি আড়াআড়ি প্যানেলে ভাস্কার্য অলংকরণ রয়েছে। এই প্যানেলের উপরে একটি সংলগ্ন স্তম্ভ ও দুটি উল্লম্ব প্যানেল রয়েছে যা দোচালা ঘরের কোণকে স্পর্শ করেছে। দোচালা দুটির বক্র কার্নিশের নীচে চারদিক বেষ্টন করে ধারাবাহিকভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের দৃশ্য। এই প্যানেল ও কর্ণিশের প্রান্ত রেখায় মাঝখানে নির্দিষ্ট দূরত্বে বন্ধনী স্থাপন করে প্রতি দুটি বন্ধনীয় মাঝে স্থাপন করা হয়েছে একটি করে চিত্রফলক।

মন্দিরের উত্তরের দেয়াল দক্ষিণ দেয়ালের অনুরূপ শুধু এর খিলানগুলো বদ্ধ আকারে নির্মিত। বদ্ধ খিলান দেয়ালে ছাড়ানো ছিটানো পদ্ম নকশা রয়েছে। মন্দিরে দোচালায় ডবল কার্নিশ দেখা যায়। নিচের ছাইচটিতে একসময় কয়েক লাইন সারিবদ্ধ ত্রিকোণ নকশা ছিল, যার কিছু নিদর্শন এখনও বিদ্যমান।

সাধারণ আলোচনা

বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরটি বাংলার মন্দির স্থাপত্যের একটি অন্যতম প্রাচীন উদাহরণ। মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণের প্রাচুর্য্য থাকলেও পোড়ামাটির ফলক চিত্রায়ণে এই প্রাচীনত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। মন্দিরে উপস্থাপিত মনুষ্য মূর্তিগুলো এখানে স্থুল। সমানুপাতিক নয়। দৈর্ঘের তুলনায় এদের প্রস্থ কিছুটা বেশী বলে মনে হয়। ফলকে সুক্ষতা ও সাবলীলতার কিছুটা অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে এই মন্দিরের টেরাকোটা অলংকরণের বিষয়বস্তু নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য দিক হল পারসিক উপাখ্যানের চিত্রায়ন। মন্দিরের ভিত্তির দ্বিতীয় সারি পারসিক মহাকাব্য 'শাহনামার' এর কিছু দৃশ্য উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই মন্দির ছাড়া বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরে (১৬৩৪

১. শ্রীলা বসু ও অভ্রবসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫,পৃ. ১৫২
২. শম্ভু ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গের মন্দির*, কলকাতা, মনন প্রকাশন, ২০০৯, পৃ. ৬৩

খ্রি.) এই ধরনের পারসিক বিষয়বস্তু দেখা যায়। তবে পরবর্তীকালে এই ধরনের পারসিক বিষয়বস্তু মন্দির চিত্রফলকে খুব বেশী দেখা যায়নি।

কান্তজী মন্দির

অষ্টদশ শতকের মন্দিরগুলোর মধ্যে কান্তজীর মন্দিরটি সম্ভবত সবচাইতে সুন্দর। মন্দিরটি দিনাজপুর জেলার কান্তনগর গ্রামে ঢেপা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। মন্দিরের ভিত্তিতে প্রথিত একটি শিলালিপি হতে জানা যায় যে, রাজা প্রাণনাথ (১৬৮২-১৭২২ খ্রী.) মন্দিরটির নির্মাণ কাজ ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে শুরু করেছিলেন যা ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পুত্র রামনাথ কর্তৃক সমাপ্ত হয়।[১]

চিত্র: ৫.১৮

মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে ইটের তৈরী। তবে এর উচ্চ ভিত্তিভূমিটি পাথরের। এটি ১৫.৮৪ মিটার বর্গে একটি নবরত্ন মন্দির। তিনতলা বিশিষ্ট মন্দিরটির প্রতিটি তল উপরের দিকে ক্রমহ্রাসমান ভাবে নির্মিত। এর প্রথমতলা একটি গর্ভগৃহ ও দুটি প্রদক্ষিণ পথের সমন্বয়ে নির্মিত। গর্ভগৃহের উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বে দুটি প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রথম প্রদক্ষিণ পথের চারদিকে চারটি ও দ্বিতীয় প্রদক্ষিণ পথের প্রতিটি দেয়ালে তিনটি করে প্রবেশ খিলান রয়েছে। খিলান তিনটি দুটি বহুপার্শ্ব বিশিষ্ট স্তম্ভ সমর্থিত। দ্বিতীয় তলাটি একটি কেন্দ্রীয় কক্ষ ও এর প্রত্যেক দিকে পাঁচটি করে প্রবেশ খিলান রয়েছে। দ্বিতীয় তলার খিলানগুলো আয়তাকার স্তম্ভ সমর্থিত হলেও খাঁজকাটা স্তম্ভ দেয়াল সংলগ্ন করে অনেকটা আলংকারিক ভাবেই নির্মিত হয়েছে। প্রথম তালার তিন-খিলান প্রবেশপথগুলি ও দ্বিতীয় তলার মাঝখানের তিনটি খিলান একটি বৃহৎ প্যানেলে বর্ধিত দেয়ালের মধ্যে স্থাপিত। এই ধরণের বর্ধিত দেয়ালে

১. Hoque, M.M. & Seema Hoque, *Kantajee Temple An Outstanding Monument of Late Medieval Bengal*, Dhaka, UNESCO, 2005, p.58

তিন খিলান প্রবেশপথের নিদর্শন ইলিয়াস শাহী শাসনামলে বাবা আদমের মসজিদে প্রথম দেখা যায়। হোসেনশাহী শাসনামলে এটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মন্দিরের তৃতীয় তলাটির চারকোনা কেটে একে অষ্টকোনাকার রূপ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় তলায় কোন প্রদক্ষিণ পথ নেই। যেহেতু এই রীতির মন্দিরগুলোর প্রতিটি তলা এর নিচের তলা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার নির্মিত হয় সেহেতু এর প্রতিটি তলার ছাদের কিছু অংশ উন্মুক্ত থাকে। এই মন্দিরে প্রথম ও দ্বিতীয় তলার উন্মুক্ত অংশের চারকোণে নির্মিত হয়েছিল চারটি করে রত্ন, যা এখানে ক্ষুদ্র রেখা দেউলাকারের ছিল। এর তৃতীয় তলার ছাদে একটি কেন্দ্রীয় দেউল সাদৃশ রত্ন শোভিত ছিল।[১] মন্দিরের সকল রত্নই ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অলংকরণ

কান্তজীর মন্দিরটি বাংলার আঠারো শতকের সবচাইতে অলংকৃত ও সুন্দরতম মন্দির স্থাপত্য। সম্পূর্ণ মন্দিরটি ভেতর ও বাইরের দেয়াল পোড়ামাটির অলংকারে সজ্জিত। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। এর প্রথম তলার দক্ষিণের দেয়ালটি তিন খিলান প্রবেশপথ সম্বলিত। তিনটি খিলানকে একটি বৃহৎ প্যানেলে স্থাপন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্যানেলটি দুটি সরু সংলগ্ন-স্তম্ভ দ্বারা সীমাবদ্ধ। খিলান তিনটি দুটি বহুভূজ স্তম্ভের উপর স্থাপিত। দুটি খিলানের মাঝে, স্তম্ভের উপরের অংশে একটি করে সরু স্তম্ভ সংযুক্ত করে খিলানগুলোকে পৃথক করা হয়েছে। প্রতিটি খিলান উপরিস্থ প্যানেলে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত হয়েছে বিভিন্ন দৃশ্য। খিলানগুলো দ্বিকেন্দ্রীক। এদের সম্মুখে তিনটি স্তরে নির্মিত হয়েছে খাঁজ খিলান। খিলানগুলো প্রান্তরেখা বরাবর একসারি ঝুলন্ত ঘন্টা শোভিত দেউল মোটিভ সন্নিবিশিত হয়েছে। স্প্যানড্রিলে উভয় পার্শ্বে রয়েছে চক্রবদ্ধ পদ্ম নকশা। খিলানটি উঁচু ও সরু শীর্ষদন্ড শোভিত। দক্ষিণ দেয়ালে দেবতা ও অসুরদের মধ্যকার যুদ্ধ দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

মন্দিরের অন্য তিনদিকেও তিন খিলান প্রবেশপথ রয়েছে। এর উত্তরের খিলান প্যানেলে মহাকাব্য রামায়ণের লঙ্কা যুদ্ধের দৃশ্য,পূর্বদিকে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ দৃশ্য ও পশ্চিম দিকের খিলান প্যানেলে রয়েছে কৃষ্ণলীলার দৃশ্য। পাথরের বেদীর উপর মন্দিরের ভিত্তি অংশে একসারি চক্রবদ্ধ পদ্ম ও চারপল্লব ফুলের ধারাবাহিক নকশা রয়েছে। পূর্ব ও উত্তর দেয়ালের ভিত্তির নিম্নাংশ মণি-ঋষি, লক্ষমান পোড়ামাটির সিংহ ইত্যাদি। এর উপরে আড়াআড়ি দুটি সারি মন্দিরের চার দেয়াল জুড়ে বিস্তৃত। নিচের সারিতে সামাজিক দৃশ্যবলী ও উপরের সারি কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার দৃশ্য ও রামায়নের বিভিন্ন ঘটনাবলীর দৃশ্য উপস্থাপিত হতে দেখা যায়।

---

১. James Fergusson, James Ferguson, *History of Indian and Eastern Architecture,* Vol. I. New Delhi: Munshiram Monoharlal, (First published in 1876. Revised by James Burgess and R. Phene Spiers), 1972, p. 160

(ক)

(খ)

(গ)

চিত্র: ৫.১৯

চিত্র: ৫.২০

চিত্র: ৫.২১

সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্যে শিকার দৃশ্য প্রধানত উপস্থাপিত হয়েছে। হাতি, ঘোড়া, সৈন্য-সমস্ত, শিকারী কুকুর ও বাদকসহকারে রাজা বা জমিদারদের শিকারযাত্রার রাজকীয় দৃশ্য সম্ভবত মন্দিরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চিত্রগুলোর অন্যতম। ছুটন্ত ঘোড়ার দেহভঙ্গি, সৈন্যদের তীর নিক্ষেপ, শিকারের ক্ষিপ্রতা দৃশ্যগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছে। সৈন্য-সামন্তদের পোশাক, পাগড়ী, হাতে বাজ পাখি নিয়ে শিকারীর উপস্থাপন, উটের পিঠে ঢোল ও বাদক, হাতী, রথ বা পালকীতে উপবিষ্ট রাজকীয় পুরুষ উপস্থাপনে মুঘল ও রাজস্থানী চিত্রকলা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ভিত্তির তৃতীয় সারিতে মহাকাব্যিক দৃশ্য উপস্থাপনে পশ্চিম ও উত্তর দেয়ালে কৃষ্ণের জীবন কাহিনী পূর্ব, দেয়ালে রামায়ণের দৃশ্য ও দক্ষিণ দেয়ালে খিলানের বামদিকে রামায়ণ ও ডান দিকে কৃষ্ণের জীবনকাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে।

এর উপরে একসারি চক্রাকার পদ্ম নকশার পাড় দ্বারা ভিত্তি অংশের সমাপ্তি টানা হয়েছে। খিলান প্যানেলের দুই পার্শ্বের দেয়ালকে দুটি অষ্টকোণাকার পার্শ্ব বিশিষ্ট সংলগ্ন স্তম্ভ দ্বারা তিনটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের উল্লম্ব ও সারিবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপে উপস্থাপিত হয়েছে একক ফলকে বিভিন্ন দেব-দেবীর চিত্র।

মন্দিরের প্রতিটি স্তম্ভের প্রতিটি পার্শ্বসহ সমগ্র মন্দির ছোট বড় বিভিন্ন মনুষ্য, প্রাণী, পৌরাণিক চরিত্র ও উদ্ভিজ মোটিফযুক্ত ফলক দ্বারা সজ্জিত।

সাধারণ আলোচনা

পোড়ামাটির অলংকার সমৃদ্ধ মন্দিরগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে কান্তজীর মন্দিরটি সুপরিচিত ও নান্দনিক উপস্থাপনে শ্রেষ্ঠ। মন্দিরের প্রতিটি তলার খিলান প্যানেল, পার্শ্ব দেয়াল, ফ্রিজ, ভিত্তি (base), কর্ণার বা প্রান্তীয় দেয়াল, স্তম্ভের প্রতিটি দেয়াল সর্বত্র পোড়ামাটির অংলকরণে আচ্ছাদিত। ধর্মীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে পুরান, মহাভারত, রামায়ণ কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য, বিভিন্ন দেবীর ভাস্কার্য বিদ্যাধরী, দ্বার পাল নবনারী কুঞ্জর, মুণি-ঋষি, পৌরাণিক জীবজন্তু, ইত্যাদি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সামাজিক বিষয়বস্তুর মধ্যে শিকার দৃশ্যই প্রাধান্য পেয়েছে তবে এর সাথে রাজকীয় ব্যক্তিত্বদের প্রমোদ ভ্রমণ, সার্কাস বা শারীরিক ক্রীড়া প্রদর্শন, ইউরোপী সৈন্য, জাহাজ, ইত্যাদি।

এছাড়া লতা ও বিমূর্ত লতা, বিভিন্ন বর্ডার ও খিলান প্যানেলে প্রান্তীয় নকশা, সারিবদ্ধ পাড় ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দিরের কার্নিশে জোড়া বন্ধনী নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর স্থাপিত হয়েছে। কর্ণিশের উপরে পাঁচ-খাঁজ বিশিষ্ট কাঞ্জুরা মুসলিম আমলের খিলান ফ্রেমের শীর্ষ নকশার অনুরূপ।

পোড়ামাটির অলংকরণের সুক্ষতা, মসৃণতা ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনে কান্তজী মন্দিরের অলংকরণ এককথায় অতুলনীয়।

ছোট আহ্নিক মন্দির

রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার রাজবাড়ি প্রাঙ্গনে নির্মিত ছোট আহ্নিক মন্দিরটি বাংলার দোচালা স্থাপত্যের একটি অনন্য নিদর্শন। মন্দিরটি রাজশাহী শহর হতে ত্রিশ কিলোমিটার পূর্বে রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কের এক কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।[১] পুঠিয়া পাঁচআনি রাজবাড়ির পশ্চাতে অবস্থিত মন্দিরটি রাণীমহল সংলগ্ন করে নির্মিত। রাণী মহলটি বর্তমানে উপজেলা ভূমি অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মন্দিরটির প্রবেশ পথের উপর সংযুক্ত একটি শিলালিপি অনুসারে মন্দিরটি পুঠিয়া রাজ প্রেম নারায়ণ কর্তক ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত।[২]

চিত্র: ৫.২২

পূর্বমুখী মন্দিরটি ৭.২৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৮৭ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি আয়তাকার ইমারত। এর উচ্চতা ৫.২৩ মিটার। দোচালা বা বাংলা রীতিতে নির্মিত মন্দিরটির প্রবেশপথগুলো এর পূর্ব ও দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্ব দিকের প্রবেশপথটি তিন খিলান বিশিষ্ট। খিলান তিনটির মধ্যে কেন্দ্রীয় খিলানটি অপেক্ষাকৃত বড়। খিলানগুলো বহু খাঁজ বিশিষ্ট ও চতুর্দিকে ধাপ বিশিষ্ট রথ মন্দিরের ন্যায় স্তম্ভ সমর্থনে নির্মিত। মন্দিরের কুজাকৃতির দোচালা ছাদের উপর তিনটি লোহার শীর্ষদন্ড বিদ্যমান।

১. কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "পুঠিয়ার দোচালা মন্দির", *আই.বি. এস. জার্নাল*, ১০ম সংখ্যা, ১৪০৯, পৃ. ১৭

২. Ahmed, Babu & Nazly Chowdhury, *Documentation on Terracotta Temples of Bangladesh*, Najma Khan Majlis (ed.), Dhaka, Traditional Photo Gallery, 2013, p.57

অলংকরণ

মন্দিরের পূর্ব ও দক্ষিণ দেয়াল পোড়ামাটির অপূর্ব নকশায় অলংকৃত। এর উত্তর ও পশ্চিম দেয়ালের কিছু অংশে পাড় নকশার সামান্য কিছু অলংকরণ রয়েছে। সবচেয়ে বেশী নকশা দেখা যায় এর পূর্ব দেয়ালে। পূর্ব দেয়ালের প্রতিটি খিলান আয়তাকার প্যানেলে স্থাপিত । প্রতিটি প্যানেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্গাকার খোপে বিভক্ত। প্রতিটি খোপে রয়েছে একটি করে ফলকে উৎকীর্ণ কৃষ্ণের বংশী বাদন বা রাধার নৃত্য দৃশ্য। ফলকসমূহ সর্বক্ষেত্রে সমান নয় এখানে কোন কোন ফলক মাত্র দুই ইঞ্চি বর্গের। ফলক বিভাজক হিসাবে চার ও আট পল্লব বিশিষ্ট একসারি ফুলের ধারাবাহিক নকশার পাড় সংযুক্ত করা হয়েছে। খিলান প্যানেল তিনটি বেষ্টন করে আর একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অলংকৃত ফলক সম্বলিত খোপ নকশার সারি স্থাপন করা হয়েছে। স্তম্ভসহ তিনটি খিলান আরও তিনটি সুক্ষভাবে উৎকীর্ণ লতা নকশার পাড় দ্বারা আবদ্ধ। তিন খিলান প্রবেশপথের এই সমগ্র আয়োজনটির দুই পার্শ্ব ও উপরাংশ ঘিরে রয়েছে মোট তেইশটি খোপ বিশিষ্ট একটি প্যানেল সারি। প্রতিটি প্যানেল ফুলেল পাড়ের বিভাজক দ্বারা পৃথক ও দুই স্তরে জাল নকশার বর্ডার দ্বারা আবদ্ধ। এর মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন পৌরানিক মহাকাব্যিক দৃশ্য সম্বলিত ফলক। কার্নিশের নীচে স্থাপিত ফলকসমূহে বিষ্ণুর দশ অবতারের উপস্থাপন চোখে পরে। মন্দিরের চারকাণের স্তম্ভসমূহ কিছুটা অন্তর্নিবিষ্ট ভাবে নির্মিত । প্রতিটি স্তম্ভ কয়েকটি উদ্গাত আড়াআড়ি ব্যান্ড দ্বারা কয়েকটিভাগে ভাগ করে প্রতিটি অংশে সরু প্যানেলসমূহে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কৃষ্ণের ভাস্কর্যসহ অন্য আরও মহাকাব্যিক দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। কার্নিশের নিচে স্তম্ভের উপরের ত্রিকোণাংশে উপস্থাপিত হয়েছে সিংহরূপী ব্যাল। পূর্ব দেয়ালের সবচেয়ে নীচে উপস্থাপিত দুইসারি অলংকরণের মধ্যে উপরের সারিতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বিভিন্ন ঘটনা সম্বলিত দৃশ্য যেমন- গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন, রাক্ষস তৃণাবর্ত (কংস প্রেরিত ঝড় রূপী দৈত্য) এর সাথে লড়ায়ের দৃশ্য, শিশুসহ গোপীদের কলসি বহন, কৃষ্ণের হস্তী দানব 'মহাকুবল' বধ, চানূ ও মুষ্টিকের সঙ্গে কৃষ্ণ, কংস বধের দৃশ্য, গোপীদের বস্ত্র হরণ, ব্রহ্মা কর্তৃক গাভী ও রাখাল বালকদের প্রত্যর্পণ দৃশ্যসহ কৃষ্ণলীলার আরো বহুদৃশ্য উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সর্বনিম্নের প্যানেলে রয়েছে সামাজিক দৃশ্যের উপস্থাপন। মন্দিরের দক্ষিণ দেয়ালে দৃশ্য অলংকরণে রামায়ণের কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। দক্ষিণের প্রবেশ খিলানের খিলান প্যানেলে উপস্থাপিত হয়েছে লঙ্কা যুদ্ধের একটি দৃশ্য। রামায়নের অপরাপর দৃশ্যের মধ্যে সাগরে সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে বানর বাহিনীর পাথর বহনের দৃশ্য, পাথর হাতে বানর বাহিনী ও গদা হতে রাক্ষস বাহিনীর যুদ্ধাংদেহী দৃশ্য আলাদা আলাদা সারিতে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ দেয়ালের কর্নিশের নীচে ত্রিকোণাংশে মানুষের মাথা ও সিংহের দেহ সম্বলিত মিশ্রজীবের উপস্থাপনও চোখে পরে।

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

(চ)

(ছ)

চিত্র: ৫.২৩

পূর্ব দিক ব্যাতীত মন্দিরের বাকি তিন দিকের দেয়ালের নিম্নাংশে ঘিরে উৎকীর্ণ হয়েছে দুটি লতানো পাড় নকশার ব্যান্ড। দক্ষিণ দেয়ালের খিলান প্যানেল ঘিরে সৃষ্ট ফ্রেমের বর্ডারে সারিবদ্ধ খোপের প্রত্যেকটিতে চক্রবদ্ধ রোজেট নকশা রয়েছে।

সাধারণ আলোচনা

পুঠিয়ার ছোট আহ্নিক মন্দিরটি অলংকারের দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ইমারত। মন্দির অলংকরণে ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি আকারের পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হয়েছে। ফাসাদ অলংকরণে এত ক্ষুদ্র ও সুক্ষ্ম ফলকের ব্যবহার কেবল মাত্র বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরের (১৬৪৩ খ্রি.) সাথে তুলনীয়। মন্দিরের পূর্ব দিকের খিলান প্যানেলসমূহের উপরদিকে এক সারি স্তম্ভ শীর্ষের নকশা রয়েছে । খিলান প্যানেলে এই ধরণের নকশার ব্যবহার প্রথম পান্ডুয়ার বরী মসজিদে দেখা যায়। পূর্ব দেয়ালের একটি প্যানেলে উপস্থাপিত দুই হাত দ্বারা দুটি সিংহ ও দুই পা দ্বারা দুটি হাতী বেষ্টন করে, হাতী দুটি ভক্ষণে উদ্দ্যত এক দানব সদৃশ্য মূর্তি দেখা যায় । মূর্তিটি কোন কোন শিল্প ঐতিহাসিক 'কমলেকামিনী' (?) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন[১]। মোটিফটি একাদশ শতকে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়ায় অবস্থিত সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরের একটি কুলঙ্গীতে টেরাকোটা ফলকে উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়। এছাড়া সতের শতকে নির্মিত বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরসহ পরবর্তীকালের বহু মন্দিরেই মোটিফটি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়।

কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনায় বর্ধমান রাজপরিবারের সদস্য কর্তৃক বেশ কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মন্দিরসমূহ আকার ও অলংকরণে বাংলার স্থাপত্যে সুন্দরতম মন্দিরগুলোর অন্যতম। কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরটি অম্বিকা কালনায় প্রতিষ্ঠিত দুটি পঁচিশ রত্ন মন্দিরের একটি। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশপথের উপরের দেয়ালে প্রথিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমান রাজ তিলোকচন্দ্রের মাতা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।[২]

মন্দিরটি একটি উঁচু বেদীর উপরে নির্মিত। প্রায় ১৩ মিটার বর্গকার এই মন্দিরটি দক্ষিণমুখী । এর দক্ষিণে সংযুক্ত প্রবেশপথটি পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত চারচালা আকরে নির্মিত। মন্দিরের গর্ভগৃহের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে একটি করে বারান্দা রয়েছে। দক্ষিণের বারান্দাটি তিন খিলান বিশিষ্ট। এর সম্মুখের চারচালার দক্ষিণেও তিনখিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ রয়েছে । চারচালার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত খিলানপথ দ্বারা উন্মুক্ত। মন্দিরের দক্ষিণ দিক ব্যতীত অপর

---

১. শম্ভু ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গের মন্দির*, কলকাতা, মনন প্রকাশন.২০০৯, চিত্র- ৬৩; তারপদ সাঁতরা এটিকে একজন মল্লবীরের মূর্তি বলে বর্ননা করেছেন। তারাপদ সাঁতরা,*পশ্চিম বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪,পৃ. ৫৫

২. প্রণব রায়, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৪ (দ্বিতীয় প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯), পৃ. ১৬২

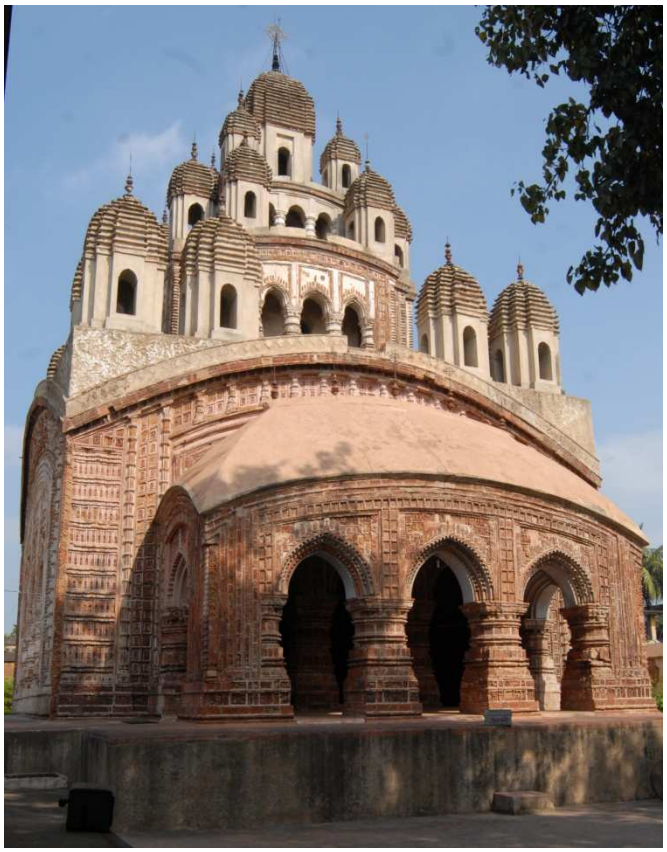

চিত্রঃ ৫.২৪

তিন দেয়াল বদ্ধ ত্রিখিলান নকশা বিশিষ্ট। শুধুমাত্র পশ্চিম দিকের বারান্দায় একটি ক্ষুদ্র প্রবেশপথ পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরটির দ্বিতীয়তলে গর্ভগৃহের ঠিক উপরে একটি ক্ষুদ্র অষ্টকোণাকার কক্ষ ও এর চারিদিকে বেষ্টিত একটি বারান্দা রয়েছে। এই তলের কোণগুলোতে তিনটি করে মোট বারটি রত্ন রয়েছে। তৃতীয়তলে একইভাবে পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিসরে বিন্যস্ত কক্ষ ও বারান্দাটি বর্গাকার। এর প্রতি কোণে দুটি করে মোট আটটি রত্ন রয়েছে। চতুর্থতলায় কেন্দ্রে একটি উচ্চ রত্ন রেখে, এর চারদিকে চারটি ক্ষুদ্র রত্ন বিন্যস্ত। মোট রত্নের সংখ্যা পঁচিশ।

অলংকরণ

মন্দিরটি পোড়ামাটির চিত্রফলক সম্বলিত অপূর্ব অলংকরণ সজ্জিত। অলংকরণসমূহ বেশীরভাগই দক্ষিণ দেয়ালকে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত। এর সম্মুখের চালা ঘরের খিলানসমূহ তিনস্তরে বহুখাঁজ খিলান সহযোগে নির্মিত। প্রতিটি খিলানের প্রান্ত রেখা ঘেঁষে পোড়ামাটির ফলকে একসারি ক্ষুদ্র পীড়া-শীর্ষযুক্ত মন্দির উৎকীর্ণ করা হয়েছে। প্রতিটি মন্দিরের অভ্যন্তরে এর উন্মুক্ত খিলান হতে একটি করে শিবলিঙ্গ দৃশ্যমান। খিলান প্যানেলগুলোতে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এর ত্রিখিলান প্রবেশপথটি খোপ নকশার একটি সারি দ্বারা আবদ্ধ । এই ধরনের খোপ নকশা খিলান প্যানেলের বিভাজক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। খোপ নকশাগুলো এ সময়ে নির্মিত অন্যান্য

মন্দিরের ন্যায় উপাস্য দেবতাদের ভাস্কর্য সম্বলিত নয় বরং বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ মোটিফ দ্বারা পূর্ণ। খোপ নকশার সারির পার্শ্ববর্তী দেয়ালে আরও পাঁচসারি উল্লম্বভাবে স্থাপিত লতা নকশা পাড় রয়েছে। পাড়সমূহ ফুল ও বরফি নকশার ধারাবাহিক উপস্থাপনে সৃষ্ট পাড় নকশার বিভাজক দ্বারা পৃথক। প্রতিটি পাড় নকশার শেষ প্রান্তে ক্ষুদ্র কুলঙ্গীতে একটি করে মনুষ্য ভাস্কর্য উপস্থাপিত হয়েছে। এর নীচে পাঁচটি চিত্র সম্বলিত ফলক কিছুটা উৎক্ষিপ্তভাবে স্থাপিত। চিত্র সম্বলিত এই ধরণের উৎক্ষিপ্ত ফলকের ব্যবহার অন্যান্য মন্দিরে খুব একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দিরের ভিত্তি অংশে আনুভূমিক তিনটি অলংকৃত সারি রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিচের সারিতে রয়েছে ঘূর্ণিচক্রের ন্যায় একসারি লতা নকশা। এর উপরের সারিতে কৃষ্ণ উপাখ্যান ও তৎকালীন সমাজ জীবনের কিছু দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সমাজিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্যদের শিকার দৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শিশু কৃষ্ণের বাল্য জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এই প্যানেলগুলোতে উৎকীর্ণ হয়েছে। নিচ থেকে তৃতীয় সারিতেও কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশর জীবনের ঘটনাবলী যেমন- ব্রহ্মা কর্তৃক কৃষ্ণকে গাভী ও রাখালবালকদের প্রত্যর্পণ দৃশ্য, কৃষ্ণ কর্তৃক কংস প্রেরিত ধেনুকাসুর অরিস্তা, অশ্বাসুর কেশী, বকাসুর ও সর্প দানব অঘাসুর বধ, পুতনা রাক্ষসী বধ, গো-চারণ, কংসের দাবী অনুসারে মথুরায় ননী প্রেরণ ইত্যাদি দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। দেয়ালের প্রান্তসমূহে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কয়েকটি আড়াআড়ি ভূমিতে সরু সরু প্যানেলে খিলান নকশার মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তির সরিবদ্ধ উপস্থাপন দেখা যায়।

চিত্র: ৫.২৫

চিত্র: ৫.২৬

চিত্র: ৫.২৭

মন্দিরের সবচাইতে আকর্ষনীয় ও অভিনব অলংকরণ হলো প্রতিটি কোণে প্রক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত উল্লম্ব একসারি মূর্তি নকশা। এখানে মূর্তিসমূহ জোড়ায় জোড়ায় একটির উপর আর একটি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ভাস্কর্য আক্রমনাত্মক ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত হয়েছে। যুদ্ধ ও মৃত্যুর দৃশ্য সম্বলিত এই ধরনের নিচ থেকে ছাদ পর্যন্ত প্রলম্বিত পরস্পর সংযুক্ত নকশা 'মৃত্যুলতা' নামে পরিচিত।[১] পাল আমলে বাংলার ভাস্কর্যে এই ধরণের মোটিফের প্রচলন ছিল। কাঠ বা পিতলের রথের কোণগুলোতে এই ধরনের নকশার ব্যবহার দেখা যায়। কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের নিকট রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে অবস্থিত লালজিউর মন্দিরেও (১৭৩৯ খ্রি.) 'মৃত্যুলতা'র উপস্থাপন পরিলক্ষিত হয়।

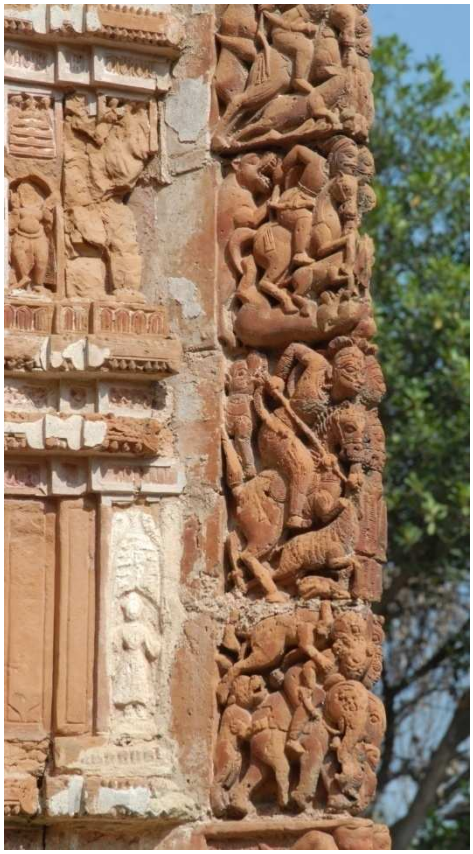
চিত্র: ৫.২৮

গর্ভগৃহের প্রবেশ-খিলানের দুই পার্শ্বে দুটি রাসমন্ডল উপস্থাপিত হয়েছে। মন্দিরটির অন্যান্য পার্শ্বের দেয়াল ও খিলান প্যানেলসমূহ খোপ নকশা ও ছোট-বড় পদ্ম মোটিফের হালকা নকশায় সজ্জিত।

সাধারণ আলোচনা

অম্বিকা কালনায় অবস্থিত বর্ধমান রাজপরিবারের সদস্যদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি বাংলার মন্দির স্থাপত্যে একটি অনন্য সংযোজন। এখানে অবস্থিত মন্দিরসমূহের মধ্যে লালজিউর মন্দির (১৭৩৯ খ্রি.)ও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির (১৭৫১ খ্রি.) ও সম্ভবত আটচালা বৈদ্যনাথ শিব মন্দিরটি মুসলিম শাসনামলে নির্মিত। অম্বিকা কালনার মন্দিরগুলোর বিশেষত্ব হলো এদের বেশীর ভাগ মন্দিরের নির্মাতা ছিলেন রাজমহিষীরা।

১. শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় পোড়ামাটির অলংকরণের ধরন

মৃৎ শিল্প বিশ্বে প্রাচীনতম শিল্প। বাংলায় পোড়ামাটির শিল্পকলার ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে প্রাচীনকাল হতে পোড়ামাটির তৈরী বাসন-কোষণ, হাড়ি, কলসি ইত্যাদি ব্যবহার করে আসছে। এছাড়া প্রতিমা নির্মাণ বা শৈল্পিক অনুভূতি প্রকাশের প্রাচীনতম মাধ্যম হিসাবেও পোড়ামাটির শিল্প সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শিশুদের খেলনা রমণীর অলংকার বা গৃহ সজ্জার উপকরণ হিসাবে পোড়ামাটির ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এটি বাংলা অঞ্চলের এত জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যম যে উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে পোড়ামাটির ব্যবহার বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত আছে। পদ্মা (গঙ্গা), মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি বিধৌত বাংলার সহজলভ্য কাদামাটি এই অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছে।

বাংলা অঞ্চলে পোড়ামাটির শিল্পবস্তুর ব্যবহার কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে সর্ব প্রাচীন যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা মৌর্য যুগের । বাংলায় গুপ্ত যুগের পূর্বে প্রাপ্ত পোড়ামাটির শিল্পসমূহ স্বাধীন একক মূর্তি (round) ও চিত্রফলক (plaque) এই দুই বৈশিষ্ট্যে নির্মিত হত। মূর্তি ও চিত্রফলকগুলো ধর্মীয় কার্য ও গৃহ সজ্জায় ব্যবহৃত হত বলে ধারনা করা হয়। সুঙ্গ যুগ হতে ছাঁচের প্রচলন শুরু হওয়ায় পোড়ামাটির শিল্প বিস্তার তরান্বিত হয়। দেশীয় চাহিদা ছাপিয়ে এর আন্তর্জাতিক বাজারও সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানা যায়।[১]

স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকৃত ফলক ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায় গুপ্ত যুগ থেকে (৪০০-৬০০ শতক)। এর পর থেকে প্রায় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় নির্মিত বৌদ্ধ বিহার এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরসমূহে টেরাকোটা অলংকরণ ব্যবহারের নিদর্শন মেলে (চিত্র: ৬.১)। বাংলায় সপ্তম শতক হতে স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির চিত্রফলকের যে নিদর্শন মেলে তা বেশীভাগ ক্ষেত্রে আকারে ছিল বড় (১৯ সে.মি. থেকে ৪০ সে.মি. পর্যন্ত)। ফলকগুলো ইমারতের একটি তলে এক থেকে তিন সারিতে বিন্যস্ত করা হত। ফলকে একক মোটিভ বা কোন কাহিনীর দৃশ্য উৎকীর্ণ করা হত। বড় ফলকের মোটিফসমূহ ছিল বড়, স্থুল ও কোন কোন ক্ষেত্রে ফলকের সীমারেখা অতিক্রম করে উপস্থাপিত হয়েছে। চিত্রফলকগুলো উপস্থাপনে কোন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি।

---

১ . N.K. Bhattasali, *Iconography of Buddhist and Brahmonical Sculptures in the Dhaka Museum*, Dacca, 1929, p. XXII

চিত্র: ৬.১

বিভিন্ন গল্পের বা মহাকাব্যিক কাহিনীর একটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্য একটি মাত্র ফলকে উপস্থাপিত হয়েছে। একটির পর একটি চিত্রফলক বসিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ঘটনা উপস্থাপনের প্রচলন এই সকল ফলকে পাওয়া যায় না। ফলক চিত্রণে লৌকিক ও ধর্মীয় উভয় বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। মনুষ্য, প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ মোটিফগুলোই অলংকরণের বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। পোড়ামাটির শিল্প সৃষ্টিতে বা ধর্মীয় বিষয়বস্তু অঙ্কনে শিল্পীগণ কোন শিল্পশাস্ত্র বা প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্রের অনুসরণ করেননি[১] বরং শিল্পসৃষ্টিতে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। ফলকগুলো সমতল থেকে অতিমাত্রায় প্রক্ষিপ্তভাবে (high relief) উৎকীর্ণ। প্রতিটি ফলকের নিজস্ব সীমারেখা ছিল বলে আলাদাভাবে কোন বিভাজক এখানে পরিলক্ষিত হয় না। চিত্রফলক সম্বলিত সারিগুলি উপরে ও নীচে নকশাকৃত ইটের বর্ডার দ্বারা সীমাবদ্ধ। পোড়ামাটির চিত্রফলকের এই বৈশিষ্ট্যগুলো দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত অব্যহত থাকে। একাদশ শতকে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়ায় অবস্থিত রেখা-রীতির দেউলটিতে স্টাকো অলংকরণের পাশাপাশি পোড়ামাটির চিত্রফলকের ব্যবহার দেখা যায় (চিত্র: ৬.২ ও ৬.৩)। ফলকগুলি আকারে বড় ও বহির্দেয়ালের কুলঙ্গীতে স্থাপিত। একাদশ শতকের শেষভাগে সেন শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার এক প্রকার বিলুপ্ত হয়ে যায়। বহিরাগত সেন শাসকদের স্থাপত্য অলংকরণে পাথর খোদাই ও স্টাকোর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে পোড়ামাটির শিল্পসৃষ্টি একেবারে লোপ পেয়েছিল এ কথা বলা যাবে না কেননা নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য তৈজসপত্র ও গৃহসজ্জার উপকরণ সৃষ্টিতে পোড়ামাটি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলার আপাময় জনসাধারণের সর্বাধিক প্রিয় ও সহজলভ্য বস্তু হিসাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। তাই বলা যায় ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের বাংলায় আগমনের সময়কালে স্থাপত্যে ব্যবহারের জন্য পোড়ামাটির ফলক নির্মাণ

১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং,১৪১৪ (ষষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ৬৫২-৫৩

চিত্র: ৬.২

চিত্র: ৬.৩

আপাতদৃষ্টিতে বন্ধ থাকলেও এ অঞ্চলে মৃৎ শিল্পচর্চা বন্ধ হয়ে যায়নি। নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা পোড়ামাটির শিল্পসৃষ্টিতে অভ্যস্ত ও দক্ষ ছিলেন।

বিজয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলায় মুসলমানদের স্থাপত্যরীতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না কেননা মুসলিম বিজয়ের পরবর্তী প্রায় একশত বছরের কোন মুসলিম স্থাপত্য বর্তমানে টিকে নাই। ১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত জাফর খান গাজীর মসজিদটিই বাংলায় প্রাপ্ত মুসলিম স্থাপত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। আর ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত ছোট পান্ডুয়ার বরী মসজিদে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে পোড়ামাটির শিল্প ব্যবহারের সর্বপ্রাচীন উদাহরণ মেলে। এ সময়ে প্রবর্তিত পোড়ামাটির ফলকগুলি পূর্ব প্রচলিত চিত্রফলকসমূহ থেকে আকারে ও তক্ষণে অনেকটাই ভিন্ন চরিত্রের। মুসলিম শাসনামলে প্রচলিত ফলকগুলো আকারে ক্ষুদ্র (মাত্র কয়েক ইঞ্চি প্রশস্ত), স্বল্পোন্নত (low relief) ও জ্যামিতিক, উদ্ভিজ্জ ও বিমূর্ত নকশার সুক্ষ্ম খোদাই এ উৎকীর্ণ। একক ফলকের পাশাপাশি এসময় থেকে স্থাপত্য অলংকরণে গুচ্ছফলকের ব্যবহার দেখা যায় । সাধারণত খিলান-প্যানেল অলংকরণে গুচ্ছফলক ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী প্রায় ছয়শত বছর পোড়ামাটির শিল্প বাংলার স্থাপত্যে অলংকরণের প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এত দীর্ঘ সময় ব্যাপী স্থাপত্য ক্ষেত্রে এই শিল্পের অব্যহত চর্চা শুধুমাত্র বাংলাতেই দেখা যায় যা

নিঃসন্দেহে এই শিল্প উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলো আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম শাসনামলে বাংলার পোড়ামাটির শিল্প বিকাশকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। শিল্প বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে এই শিল্প অলংকরণের ধরনও সুগঠিত হয়। বাংলায় পোড়ামাটির অলংকরণের বিভিন্ন পর্যায়গুলো হল–

ক. সূচনাপর্ব (চৌদ্দ শতকের প্রারাম্ভ থেকে পনের শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত)

খ. বিকাশপর্ব (পনের শতকের মাঝামাঝি থেকে ষোল শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত)

গ. মন্দির স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের নবযুগ (ষোল শতকের মধ্যভাগ থেকে আঠার শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত)

ক. সূচনা পর্ব (চৌদ্দ শতকের প্রারাম্ভ থেকে পনের শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়)

বাংলায় মুসলিম স্থাপত্য অলংকরণের বিষয়বস্তু, স্থান, বৈশিষ্ট্য ও মাধ্যম মূলতঃ চৌদ্দ-পনের শতকেই নির্ধারিত হয়ে যায়। মুসলিম শাসনের এই পর্যায়ে একশত বছরের অধিক সময়ের মধ্যে নির্মিত খুব কম সংখ্যক ইমারত বর্তমানে টিকে আছে। এরা হল– ছোট পান্ডুয়ার বরী মসজিদ (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ), হযরত পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ (১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) ও একলাখী সমাধি (আনুমানিক ১৪২৫ খ্রিষ্টাব্দ) ও চিকা দালান (আনুমানিক ১৪৫০ খ্রি.)। প্রথম ইটের স্থাপত্য বরী মসজিদে পোড়ামাটির অলংকরণ ব্যবহারের সূচনা ঘটে। বরী মসজিদে বহির্দেয়ালের প্যানেলে আবদ্ধ খিলান নকশা আর কিবলা দেয়ালে মিহরাব খিলানের ফ্রেম ও এর অবতল অংশের অলংকরণ ছাড়া অন্য কোন অলংকৃত অংশ টিকে নাই। এখানে বহির্দেয়ালের খিলান নকশার ফ্রেমে উৎকীর্ণ চারপত্র বিশিষ্ট্য ফুলের জালি নকশা ও স্তম্ভযুক্ত খাঁজ-খিলান নকশাই একমাত্র টিকে থাকা অলংকরণ। অপরদিকে মসজিদ অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালে স্থাপিত একুশটি খিলানের মধ্যে প্রধান খিলান ও তখ্‌তের দ্বিতীয় খিলানে চওড়া অলংকৃত ফ্রেম রয়েছে যেখানে অলংকৃত ইট সাজিয়ে পরস্পর সংযুক্ত নকশা সৃষ্টি করা হয়েছে। অলংকৃত ইটের কৌশলী বিন্যাসের মাধ্যমে ইমারত অলংকরণ এ সময় মধ্য এশিয়া ও ইরানে বহুল প্রচলিত একটি রীতি ছিল । এই মসজিদে পোড়ামাটির ফলক মিহরাবের খিলানসমূহের স্প্যানড্রিলে চক্রাকার রোজেট, মূল মিহরাব অবতলে নির্মিত ক্ষুদ্র খিলান নকশার অভ্যন্তরে ফুল ও লতা উপস্থাপনে এবং অন্যান্য মিহরাবের অবতল অংশে ঝুলন্ত পেনডেন্ট নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অলংকৃত ইট ও পোড়ামাটির চিত্রিত ফলক উভয়ই এখানে অলংকরণ মাধ্যম হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। এর ঊনসত্তর বছর পর নির্মিত আদিনা মসজিদ বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে একটি মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। অঙ্গন কেন্দ্রীক পরিকল্পনায় নির্মিত বিশাল এই মসজিদটিতে পোড়ামাটির অলংকরণ

অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মসজিদটি 'ইট ও পাথর' রীতিতে নির্মিত। মসজিদের খিলান উত্থান রেখা পর্যন্ত ভেতর ও বাইরের অংশে পাথরের আচ্ছাদন রয়েছে। তবে মসজিদের নেভের পশ্চিম দেয়ালে এই আচ্ছাদন আরও উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণভাবে মসজিদের পাথর আচ্ছাদিত অংশে পাথরের অলংকরণ এবং ইট নির্মিত অংশে অলংকৃত ইট বা পোড়ামাটির চিত্রিত ফলক নকশা দেখা যায়। আদিনা মসজিদ পোড়ামাটির অলংকরণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ইমারত। এখানে একাধারে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম স্থাপত্যে বিকশিত জ্যামিতিক নকশা এবং দেশজ বা স্থানীয় ফুল ও লতা-গুল্ম নকশার উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে উভয়ের সমন্বয়ে শিল্প বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালের উপরের অংশে ছাদের ভার বহনকারী বৃহৎ খিলানসমূহের খিলানপটহ অলংকরণে জ্যামিতিক ও উদ্ভিজ্জ নকশার ব্যবহৃত হয়েছে। তবে জ্যামিতিক নকশার গাণিতিক উপস্থাপনে স্থানপূরণ যত সহজে সম্ভব হয়েছে[১] স্থানীয় লতা-গুল্মের নকশা সারিবদ্ধ উপস্থাপনে স্থানপূরণ ততটা সহজ ছিলনা বিধায় আদিনা মসজিদের অভ্যন্তরীণ খিলান-পটহ অলংকরণে বহু বিচিত্র লতা ও উদ্ভিজ্জ মোটিফ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মুসলিম-পূর্ব যুগের স্থাপত্য নকশায় প্রাণীবাচক মোটিফের ব্যবহারই ছিল প্রধান । উদ্ভিজ্জ মোটিফগুলো সাধারণত বর্ডার অলংকরণে ব্যবহৃত হত ফলে একটি লতা নকশার প্রান্ত বিহীন বিস্তৃত ব্যবহারের ধারা যা ইরান ও মধ্য এশিয়ার লতা নকশায়[২] দেখা যায় তেমনটি এই অঞ্চলে বিকশিত হয়নি (চিত্র: ৬.৪)।

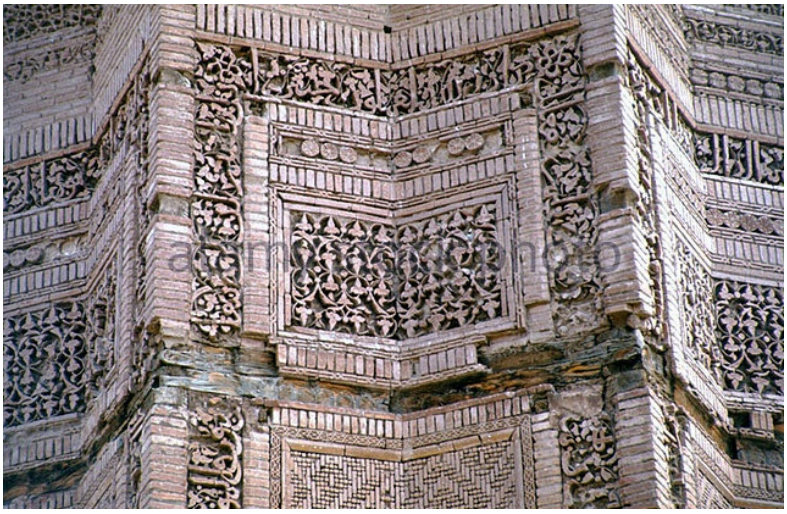

চিত্র: ৬.৪

১. Dalu Jones, "Surface, Pattern and Light", in *Architecture of Islamic World its History and Social Meaning*, edited by George Michell, London, Thames and Hudson, 1978, pp. 169-170
২. *Ibid*., p.171

আদিনা মসজিদে বহু পাড় নকশার দ্বারা স্থানপূরণের এটি একটি কারণ বলে মনে হয়। আদিনা মসজিদের বহির্দেয়ালের মাঝামাঝি উচ্চতায় আড়াআড়ি একটি উদ্গাত বিভাজক রেখা সৃষ্টি ও এর নিম্নাংশে একসারি অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক দ্বারা শোভাবর্ধনের রীতিটি মুসলিম স্থাপত্য অলংকরণের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন (চিত্র: ৬.৫)।

চিত্র: ৬.৫

স্থানটি অলংকরণে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুঁতি বা পত্রের ঝুলন্ত মালা ও টারসেলের (necklace and Tassel) ধারাবাহিক বিন্যাসে সৃষ্ট নকশা ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের নকশা সন্দেহাতীতভাবে স্থানীয় স্থাপত্য থেকে নেওয়া যার প্রচুর উদাহরণ মুসলিম-পূর্ব যুগের স্থাপত্যে ব্যবহৃত পাথরের স্তম্ভ , সর্দল ও কার্নিশ অলংকরণে পাওয়া যায় (চিত্র: ৬.৬ ও ৬.৭)।

চিত্র: ৬.৬

চিত্র: ৬.৭

আদিনা মসজিদের পশ্চিমাংশের বহির দেয়াল উন্নত ও অবনত (offset & recess) অংশে বিভক্ত। বহির্দেয়ালের আড়াআড়ি বিভাজকের উপরে প্রতিটি উন্নত দেয়ালাংশে একটি করে উদ্গত প্যানেলে ঝুলন্ত পেনডেন্ট নকশা সম্বলিত খিলান অলংকরণ দেখা যায়। ইমারতের বহির্দেয়াল অলংকরণে খিলানের ব্যবহার মুসলিম স্থাপত্যে নতুন কিছু নয়। ৯৬৯-৭৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত কায়রোর আল-আজহার মসজিদ বা ১১২৫ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত আল-আক্‌মার মসজিদে অনেকটা এই ধরনের খিলান নকশা ব্যবহৃত হয়েছে।[১] এছাড়া দিল্লীর আলাই দরওয়াজা ও জৌনপুরের লাল দরওয়াজা মসজিদ, অটলা মসজিদ ও জামি মসজিদের পাইলনে আয়তাকার ফ্রেমযুক্ত খিলান অলংকারের ব্যবহার দেখা যায়। তবে আদিনা মসজিদ বা ইতোপূর্বে নির্মিত বরী মসজিদে উপস্থাপিত আয়তাকার প্যানেলবদ্ধ বহির দেয়ালের খিলান নকশার বিশেষত্ব হল এর খিলানশীর্ষ হতে ঝুলন্ত প্রদীপের ব্যবহার। মসলিম-পূর্ব যুগের যে সমস্ত ধর্মীয় স্থাপত্য নিদর্শন বর্তমানে বাংলায় পাওয়া যায় বা যে সমস্ত নিদর্শন (যেমন- ভাস্কর্য, চিত্রকলা ইত্যাদি) থেকে সে সময়কার ধর্মীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, এ সময়ের স্থাপত্যেসমূহে বহির্দেয়ালে উদ্গত কুলঙ্গীতে উপাস্য দেবতার মূর্তি উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু প্রাণীবাচক বিষয়বস্তু উপস্থাপনে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মুসলমানগণ অন্তত তাদের ধর্মীয় স্থাপত্যে কোন ধরনের প্রাণীবাচক মোটিফ ব্যবহার করেনি (দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া)[২]। তবে সৃষ্টিকর্তাকে উপস্থাপন করে এমনি একটি প্রতীক প্রায়শই মসজিদের মিহরাবে ব্যবহৃত হয়েছে (চিত্র: ৬.৮-৬.১১গ)। খিলানের মধ্যে ঝুলন্ত প্রদীপের অলংকরণের উদাহরণ পারস্যের কিছু মসজিদে পাওয়া যায় যেগুলো বাংলার মসজিদগুলোর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে ভেরামিনের ঈমামজাদে মসজিদ (১২৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)[৩] (চিত্র: ৬.১২) ও বাগদাদ মিউজিয়ামে রক্ষিত মসূলের ত্রয়োদশ শতকের একটি মিহরাব কুলঙ্গিতেও একই ধরনের ঝুলন্ত নকশার নিদর্শন পাওয়া যায়।[৪] 'সুরা আল-নূর' এর আয়াত: ৩৫ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রায়শঃই মসজিদের মিহরাবে ঝুলন্ত প্রদীপ মোটিফটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৫] বাংলার স্থাপত্য অলংকরণে এই মোটিফের উপস্থাপন একটি সার্বজনীন রূপ লাভ করে। এখানে মসজিদ স্থাপত্যে নির্মিত প্রতিটি মিহরাবের পাশাপাশি সকল ধরনের স্থাপত্যে এই প্রতীকের ব্যবহার হতে দেখা যায়। সম্ভবত স্থানীয়

---

১. Richard Ettighausen & Oleg Grabar, *The Art and Architecture of Islam 650-1250,* Harmondsworth, Penguin Books, 1987, pp.174-75, 181

২. পারস্যের লাহিজান মসজিদ, দিনাজপুরের নয়াবাদ মসজিদ (আঠার শতক), মুর্শিদাবাদের মিঞা হালাল মসজিদসহ কিছু মসজিদে প্রাণীবাচক মোটিফের উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়

৩. A.U.Pope, *A Survey of Persian Art,* vol. IV, London, Oxford University Press, 1938, pl. 400,403

৪. Richard Ettighausen & Oleg Grabar ,*The Art and Architecture of Islam 650-1250,* Harmondsworth, Penguin Books, 1987, p. 301

৫. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, আয়াত-৩৫: "আল্লাহ্ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপএকটি কাঁচের পাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুতঃপবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপরে জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেনএবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।"

চিত্র: ৬.৮

চিত্র: ৬.৯

চিত্র: ৬.৯ ক

চিত্র: ৬.১০

চিত্র: ৬.১১ ক

চিত্র: ৬.১১ খ

চিত্র: ৬.১১ গ

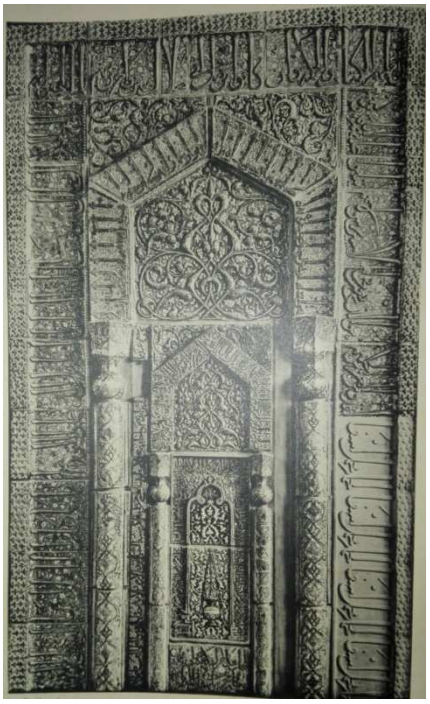

চিত্র: ৬.১২

বহু দেবতা ও মূর্তি উপাসক জনগোষ্ঠীর মনে নিরাকার সৃষ্টিকর্তার ধারণা, পবিত্রতা ও সর্বত্র বিরাজমান ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই প্রতীকী মোটিফের বারংবার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই মসজিদ নির্মাণে প্রচুর পরিমাণে মুসলিম-পূর্ব যুগের পাথরের স্থাপত্য অংশ ব্যবহৃত হয়েছে [১] যেখানে বিভিন্ন উপাস্য দেবতা ও স্বর্গীয় বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ছিল। মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের প্রয়োজনে এদের কোন কোন প্রাণীবাচক উপস্থাপনাকে পরিবর্তিত আকারে বা কোন অপ্রাণীবাচক অলংকরণে ঢেকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে আদিনা মসজিদের পোড়ামাটির অলংকরণগুলো সম্পূর্ণ এই ইমারতের জন্যই সৃষ্ট কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে ব্যবহৃত পোড়ামাটির অলংকরণে বেশ কিছু বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয় উঠে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ- মঙ্গলঘট, বুননীকৃত প্রান্তবিহীন ফিতা যা শ্বাশত বন্ধনের প্রতীক বলে মনে করা হয় (Eternal Knot), পদ্ম ইত্যাদি বৌদ্ধ মঙ্গল প্রতীকের কথা বলা যায় (চিত্র: ৬.১৩ক- ৬.১৩.ঙ)। তবে ইসলামী আদর্শের বিমূর্ত ধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় আদিনা মসজিদে এই সকল মোটিফের উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামী শিল্পকলার মধ্যে একটি মেল-বন্ধন সৃষ্টি প্রয়াশ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে কার্নিশ অলংকরণের প্রাচীনতম উদাহরণও আদিনা মসজিদেই পাওয়া যায়। এখানেই প্রথম কার্নিশের নীচে দুটি আড়াআড়ি উদ্গত ব্যান্ড সৃষ্টি করে প্রতিটি ব্যান্ডের নীচে এক সারি করে মোট তিন সারি

১. Naseem Ahmed Banerji, *The Architecture of the Adina Mosque in Pandua, India Medieval Tradition and Innovation*, Lewiston, The Edwin Mellen Press, 2002, pp. 105-130

চিত্র: ৬.১৩

চিত্র: ৬.১৩ ক

চিত্র: ৬.১৩ খ

চিত্র: ৬.১৩ গ

চিত্র: ৬.১৩ ঘ

চিত্র: ৬.১৩ ঙ

অলংকরণ পাড় দ্বারা কার্নিশ অলংকরণের ধারার সূচনা করা হয়। এর মধ্যে এখানে উপরের দুই সারিতে ক্ষুদ্র খিলান শ্রেণি ও সর্বনিম্নে একসারি জালি নকশা উপস্থাপিত হয়েছে। খিলান শ্রেণির প্রতিটি খিলান অভ্যন্তর উদ্ভিজ্জ মোটিফ সম্বলিত ক্ষুদ্র পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা অলংকৃত। কার্নিশ অলংকরণের এই ধারাটি পরবর্তীতে একলাখী সমাধি, চিকা দালান ও দরাস বাড়ি মসজিদে দেখা যায়। একলাখী সমাধিতে পোড়ামাটির অলংকরণের ক্ষেত্র আরও একটু প্রসারিত হয়। এটি আদিনা মসাজদের মত বৃহদাকার ইমারত নয় তবে এখানে প্রতিটি অবনত দেয়ালাংশের নিম্নভাগে চারটি ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত অংশে বিভিন্ন প্যাটার্ণের (pattern) পাড় নকশায় সজ্জিত। সমাধির পার্শ্ববুরুজগুলোও পোড়ামাটির অলংকারে ভারাক্রান্ত। সমাধি দেয়ালের খিলান উত্থানের উচ্চতায় যে আড়াআড়ি নকশা পাড় রয়েছে তাতে প্রতিটি উন্নত ও অবনত অংশে ভিন্ন ভিন্ন অলংকরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

তবে দেয়ালের উন্নত অংশসমূহ অবনত অংশ হতে প্রশস্ত হওয়ায় ও উন্নত দেয়ালের নিম্নভাগ অলংকার শূণ্য সাদামাটা হওয়ায় ভবনের অন্যান্য অংশের অলংকারের আধিক্য দৃষ্টিকে পীড়া দেয়না। সব মিলিয়ে একলাখী সমাধিতে এসে বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের একটি ধারা গড়ে উঠে যা পরবর্তীকালের প্রায় সকল মুসলিম স্থাপত্য অলংকরণে অনুসৃত হয়েছে।

খ. বিকাশ পর্ব (পনের শতকের মাঝামাঝি থেকে ষোল শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত)

এই পর্বের টিকে থাকা স্থাপত্যের মধ্যে দাখিল দরওয়াজায় (১৪৫৯-৭৪ খ্রি.) একলাখী সমাধির আদর্শ অনুসরণ করা হলেও তোরণের ভাবগাম্ভীর্যে সাথে সঙ্গতী রেখে এখানকার অলংকরণে অত্যন্ত সংযোম পালন করা হয়েছে। একলাখী পর্যন্ত পূর্ববর্তী সকল ইমারতে উৎকীর্ণ খিলান হতে ঝুলন্ত প্রদীপ নকশাটি এখানে তিন শীর্ষযুক্ত পেনডেন্টে পরিণত হয়েছে। খিলানপটহের রোজেটসমূহের চতুর্দিকে ত্রিকোণাকার নকশার ধারাবাহিক বিন্যাসের মাধ্যমে একে আরো বৃহদাকার নকশায় পরিবর্তিত করে নকশায় বৈচিত্র্য আনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। একলাখী সমাধি পর্যন্ত স্থাপত্য অলংকরণে ব্যবহৃত পোড়ামাটির নকশাগুলোর মধ্যে একটি দ্বিমাত্রিকভাব লক্ষণীয় । ক্ষুদ্র ফলকে উৎকীর্ণ নকশাসমূহ সুক্ষ্মভাবে তৈরী হলেও এই মাধ্যমে নকশার প্রাণবন্ত উপস্থাপন তাঁতীপাড়া মসজিদের আগে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। নকশাগুলো এখানে এত তীক্ষ্নভাবে খোদিত যে তা ফলক পৃষ্ঠ হতে যেন বেরিয়ে আসতে চায়। এতদিন পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় বিকশিত মুসলিম স্থাপত্য ধারার জ্যামিতিক নকশা ও স্থানীয় লতা-গুল্মে পাড় নকশার সমন্বয়ে স্থাপত্য অলংকরণের যে চর্চা চলে আসছিল এ সময় থেকে তার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অলংকরণ থেকে জ্যামিতিক নকশা এক প্রকার বাদ পরে এবং লতা ও প্রস্ফুটিত গোলাপ নকশার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। বহির্দেয়ালের আয়তাকার প্যানেলগুলোতে শিকলে ঝোলানো প্রদীপ নকশার ব্যবহার ইতিমধ্যে বাদ পরে গেছে । সেই স্থলে তাঁতীপাড়া মসজিদে লতায় ঝুলন্ত প্যাটার্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিটি প্যানেলকে ফুল ও লতা দ্বারা পূর্ণ করে দেওয়া একটি নতুন বৈশিষ্ট্য হিসাবে এখানে প্রকাশিত হয়। নকশাগুলো এখানে স্থাপত্য রেখাকে অনুসরণ করে বিন্যাস্ত। প্যানেল বদ্ধ খিলান নকশাটি বহির্দেয়ালের আড়াআড়ি ব্যান্ডে উপর ও নীচ উভয় স্থানেই উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। পোড়ামাটির অলংকরণ তাঁতীপাড়া মসজিদে এসে সর্বাধিক বিকশিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। পরবর্তীকালে গৌড়ের ধুনিচক মসজিদ (পনের শতকের শেষভাগ) ও কদম রসূল ইমারত (১৫৩১ খ্রি.) অলংকরণে ব্যবহৃত পোড়ামাটির নকশা সৃষ্টিতে তাঁতীপাড়া মসজিদের অলংকরণের সুক্ষ্মতা ও তীক্ষ্নভাবটি অনুসৃত হয়েছে। তবে গৌড় নগরীর বাইরে নির্মিত কোন স্থাপত্যে অলংকরণের এই সুক্ষ্মতা চোখে পড়ে না। নিঃসন্দেহে রাজধানী শহরের এই সকল ইমারত নির্মাণে সর্বাধিক দক্ষ কারিগরগণ নিয়োজিত ছিলেন।

প্রাপ্ত শিলালিপি বিচারে বাংলায় হোসেন শাহী আমলে সবচেয়ে বেশী স্থাপত্য নির্মিত হয়েছে।[১] পনের শতকের শেষ হতে ষোল শতকের মাঝামাঝি সময় (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) পর্যন্ত হোসেনশাহী শাসনামলে বাংলার স্থাপত্যচর্চায় পূর্ববর্তী ধারা অনুসত হয়। এসময় পোড়ামাটির অলংকরণ ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টিশীল কর্ম সম্পাদিত হতে দেখা যায় না।[২] এর পাশাপাশি অলংকরণে চকচকে টালির ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় পোড়ামাটির অলংকরণ কিছুটা অবহেলিত শিল্পে পরিণত হয়। হোসেন শাহী শাসনামলে 'ইট ও পাথর ' রীতির স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগের কারণে এসময় বেশ কিছু স্থাপত্যে পাথর খোদাই অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে অলংকরণের মোটিফগুলো ছিল প্রচলিত পোড়ামাটির অলংকরণের অনুকরণে সৃষ্ট। এই সময় পোড়ামাটির অলংকরণে নতুন কিছু সৃষ্টির পরিবর্তে একই ধরণের নকশার পুনরাবৃত্তি ও পুর্ববর্তী কোন নকশাকে আরও বেশী অলংকৃত করে উপস্থাপনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বাঘা মসজিদ (১৫২৩-২৪ খ্রি.) ও কদম রসুল (১৫৩১ খ্রি.) এ এই পুনারাবৃত্তি ও অলংকরণের বাহুল্য দৃষ্টিনন্দন হওয়ার চাইতে দৃষ্টিকে ক্লান্ত করে তোলে। এসময়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল অলংকরণে স্থানীয় লতা-গুল্ম ও ফল-ফুলের মোটিফের ব্যবহার। আলাউদ্দিন হোসেন শাহর সময় নির্মিত গৌড়ের লোট্টন মসজিদের স্তম্ভ ভিত্তিতে, ত্রিবেনীর জাফর খান গাজীর মসজিদের আভ্যন্তরীণ খিলান পর্দায় ও রাজশাহীর বাঘা মসজিদের মিহরাব ফ্রেমে ডালিম, আম, কামরাঙ্গা, বরই ইত্যাদি ফলবতী বৃক্ষ পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়। তবে পনের শতকের মধ্যভাগ বা তার কিছু পূর্বে নির্মিত বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদের প্রবেশপথ ও মিহরাবের অলংকরণেও স্থানীয় গুল্ম-লতার ব্যবহৃত হয়েছে। এই সমস্ত স্থানীয় মোটিফ উপস্থাপনে যথেষ্ট শৈল্পিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায় না। গুণগত মানের পাশাপাশি রুচিশীল বিন্যাসেও এসময়কার পোড়ামাটির অলংকরণে ক্রমাবনতি সুস্পষ্ট। এই সকল ফলক চিত্রণে স্থানীয় অদক্ষ শিল্পীদের নিয়োজিত করাই সম্ভবত পোড়ামাটির অলংকরণ শিল্পের গুণগত অবনতির কারণ। স্থাপত্য অলংকরণে চিত্রশিল্পীদের একটি বড় ভূমিকা থাকে কেননা মাটির ফলকে একটি নকশা উৎকীর্ণ করার আগে তা কাগজে অঙ্কিত করা হয় যে কাজটি সম্পাদিত হয় সাধারণত একজন চিত্রশিল্পী দ্বারা। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে মুসলিম শাসনের প্রারম্ভিক সময়ে মুসলিম-পূর্ব যুগে বিকশিত মূর্তি কলা ও চিত্র কলার চর্চা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। চিত্রকলার কিছু অংশ সম্ভবত গ্রামের সাধারণ মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় রক্ষিত হয়েছিল। যার কিছু উদাহরণ তৎকালীন স্থাপত্য কলায় পাওয়া যায়। মুসলিম শাসকবর্গ কর্তৃক নির্মিত স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির নকশা অলংকরণগুলো এই সকল স্থানীয় শিল্পীদের অবদান।[৩] নসরত শাহ ছাড়া বাংলার সুলতানদের মধ্যে আর কেউ

১. A. B. M. Hussain, Monuments of Husain Shahi's Reign, *Rajshahi University Studies*, III,1970, p. 61-76
২. A.H. Dani, *Muslim Architecture of Bengal*, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961, p. 117
৩. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪, পৃ. ৪১

চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন কিনা এর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই । তবে চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ান (১৪৩৩ খ্রি.) যখন বাংলায় আসেন সেই সময় তিনি নানা পেশাদার শিল্পীদের দেখেছিলেন।[১] এদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই চিত্রশিল্পী ছিলেন কেননা মাহুয়ানের বর্ণনায় এদেশে প্রস্তুত দ্রব্যদির মধ্যে মাটির চিত্রিত বাসন পত্রের উল্লেখ রয়েছে।[২] বাংলার সুলতানদের মধ্যে একমাত্র হোসেন শাহী বংশের সুলতান নাসির উদ্দীন নসরত শাহের সময় পারসিক চিত্রকলা চর্চার উদাহরণ পাওয়া যায় । এই সময় জনৈক হামিদ খান গৌড় সুলতান নসরত শাহের জন্য নিজামীর 'ইস্কান্দারনামা' এর চিত্রিত পাণ্ডুলিপি কপি করেছিলেন।[৩] তবে পাণ্ডুলিপি চিত্রণে পারসিক চিত্রকলা পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও পোড়ামাটির ফলক চিত্রণে তথা স্থাপত্য অলংকরণে এঁদের যে কোন ভূমিকা ছিলনা, হোসেনশাহী স্থাপত্যের অলংকরণের ক্রমাবনতি এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতীয় নির্মাণ শিল্পীগণ মাটি, কাঠ ,পাথর ও চিত্ররচনা এই চতুর্বিধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন[৪] তাই মুসলিম শাসনামলে নিয়োজিত স্থানীয় পোড়ামাটির চিত্রফলক নির্মাণ শিল্পীগণ সম্ভবত নিজেরাই ফলক চিত্রণ ও খোদাই এর কাজ করতেন। বাংলার রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা তথা বহির বিশ্বের সাথে সংস্কৃতিক আদান-প্রদানের অভাবের সঙ্গত কারণে এবং যথার্থভাবেই বাঙালীর শিল্পী মনন বাংলার আঞ্চলিক অস্তিত্বের মধ্যে আটকে গিয়েছিল।[৫]

ষোল শতকের শেষ দিকে মুঘল আগ্রাসনে সুলতানী শাসনের অবসান ও সতের শতকের প্রথম দশকের মধ্যে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা উত্তর-ভারত কেন্দ্রীক মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। নতুন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের আধিপত্যের সীলমোহর স্বরূপ স্থাপত্য ক্ষেত্রে উত্তর-ভারতীয় রীতির প্রবর্তন করেন। ফলশ্রুতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মিত কিছু স্থাপত্যে সুলতানী আমলে বিকশিত বাংলার স্থাপত্য সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য পোড়ামাটির অলংকরণ দৃশ্যমান হলেও অনতিবিলম্বে মুঘল স্থাপত্যে চর্চিত পলেস্তরা প্যানেলিং এর স্রোতে প্রথমে রাজধানী শহর ও পরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুসলিম স্থাপত্য হতে এর চিরবিদায় ঘটে। এসময় নির্মিত স্থাপত্যের মধ্যে অষ্টগ্রামের কুতুব মসজিদ ও টাঙ্গাইলের আটিয়া মসজিদে পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায়।

গ. মন্দির স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের নবযুগ (ষোল শতকের মধ্যভাগ থেকে আঠার শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত)

---

১. অসীম কুমার রায়, *বঙ্গ বৃত্তান্ত বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গলার কথা (পঞ্চম থেকে সপ্তদশ শতক)*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০৮, (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮), পৃ. ১১৩

২. ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ঢাকা, চিশতিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯০ (২য় সংস্করণ), পৃ.৩২

৩. M. R. Tarafdar, *Husain Shahi Bengal 1494-1538 A.D. A Socio-Political Study,* Dhaka, University of Dhaka, 1999 (2nd edition), p.309

৪. শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ*, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ২০১৫, পৃ. ৩৯

৫. *প্রাগুক্ত.*, পৃ. ১৩

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহর শাসনকাল (১৩৪২- ৫৭ খ্রি.) থেকে বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতির প্রতি মুসলিম শাসকদের সদয় মনোভাব লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন প্রশাসনিক উচ্চ রাজপদে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয় । রাজা গণেশ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইলিয়াসশাহী শাসনামল থেকে সাহিত্য ক্ষেত্রেও হিন্দু পন্ডিতগণ রাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন । বড়ু চন্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ও চন্ডিদাস ওঝার রামায়ন এ সময়ই রচিত হয়েছেল।[১] হিন্দু জনগোষ্ঠী ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি এই আনুকল্য হোসেন শাহী শাসনামলে আরও বৃদ্ধি পায়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহর সময়ই বাংলায় চৈতন্য আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। রাজধর্ম ইসলাম ও নানা প্রচলিত লোকধর্ম থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য এ সময় সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে উদার নৈতিক চৈতন্যবাদ সব থেকে সফলতা অর্জন করে। হিন্দু ধর্মের নব জাগরণে যা চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। মুসলিম বিজয়ের দুইশত বছরেরও অধিক কাল পর আবারও হিন্দু ধর্মীয় স্থাপত্য নির্মাণের জোয়ার পরিলক্ষিত হয়।[২] তবে পোড়ামাটির মন্দির নির্মাণের উদাহরণ পনের শতকের মাঝামাঝি থেকে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের কিরিটেশ্বরী (১৪৬৫-৬৬ খ্রি., অধুনালুপ্ত) ও ঘাটালের সিংহবাহিনী মন্দির (১৪৯০ খ্রি., পশ্চিম মেদিনীপুর) প্রাচীনতম । ষোল শতক হতে সতের শতকের প্রথম দিকে নির্মিত মন্দিরসমূহের মধ্যে আকৃতি গত পার্থক্য থাকলেও অলংকরণ ভাবনা এরা প্রায় একই সূত্রে গ্রথিত। এসময় মুসলিম স্থাপত্যের প্রাণীজ মোটিফ বিবর্জিত অলংকরণশৈলী কোন কোন মন্দির সজ্জায় গৃহীত হতে দেখা যায়। বর্ধমানের বরাকরের পাথরের মন্দিরের (১৪৬১ খ্রি.) ন্যায় এসময়ের বেশ কিছু রেখা রীতির মন্দিরে সমগ্র দেয়াল জুড়ে আড়াআড়ি উদ্গাত ব্যান্ড নকশা রয়েছে। এদের মধ্যে হান্ডিয়ালের জগন্নাথ মন্দির[৩] (শিলালিপি অনুসারে মন্দিরটি ১৫৯০খ্রি. সংস্কার করা হয়, পাবনা), বাগেরহাটের কোদলা মঠ (ষোল শতক), বৈদ্যপুরের কৃষ্ণমন্দির (১৫৯৮ খ্রি., বর্ধমান) এবং মথুরাপুরের দেউল (ষোল শতক, ফরিদপুর) এই রীতিতে নির্মিত। তবে মুসলিম স্থাপত্যের অনুসরণে প্রতিটি ব্যান্ডের নীচে এক সারি করে লতা-গুল্ম বা প্যাটার্ন নকশা উপস্থাপিত হয়েছে। কৃষ্ণনগরের রাধা-বল্লভ মন্দির ও বৈদ্যপুরের (জোড়া দেউল, ১৫৯৮খ্রি.)) ক্ষুদ্র দেউলের প্রবেশপথের খিলান-প্যানেলের সাথে ষোল শতকে নির্মিত বাঘা মসজিদ (১৫২৩-২৪ খ্রি.), কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮খ্রি.) ও অষ্টগ্রামের কুতুব মসজিদের মিহরাব ও প্রবেশপথের নিকট সাদৃশ্য বিদ্যমান। ষোল শতক থেকে সতের শতকের প্রথম দিকে নির্মিত মন্দিরসমূহের মনুষ্য ও প্রাণীজ মোটিফের উপস্থিতি ছিল। এর মধ্যে গোকর্ণ-র নরসিংহ মন্দিরে (১৫৮০ খ্রি., মুর্শিদাবাদ) দূর্গা, কালী

১. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ (পুনর্মুদ্রণ) (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭), পৃ. ৪২৬, ৪৩৫

২. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, "বাঙ্গালীর ধর্মীয় স্থাপত্য চর্চা (পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতক)", *ইতিহাস*, ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯, পৃ. ২৬৫

৩. জগন্নাথ মন্দিরের ভিত্তি সংলগ্ন প্যানেলদ্বয় ও খিলান প্যানেল সম্ভবত পরবর্তীককালের সংযোজন। এদের পোড়ামাটিরফলক বৈশিষ্ট্য পনের-ষোল শতকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং তা আঠার শতকের শিল্প বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। জর্জ মিশেল মন্দিরটি সতের শতকের মন্দিরের অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। George Michell (ed.), *Brick Temples of Bengal from the Archives of David McCutchion*, Princeton, Princeton Univercity Press, 1983, p. 96

ইত্যাদি দেবী মূর্তি সম্বলিত ফলক, বৈদ্যপুর মন্দিরের বড় দেউলের প্রবেশপথের উপরের প্যানেলে একটি সারিতে রামায়নের লঙ্কা যুদ্ধ এবং মথুরাপুর দেউলে প্রবেশপথের উপর ছয়টি সারিতে মহাভারত ও রামায়নের বিভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। এ সমস্ত প্যানেলে মনুষ্য ও প্রাণীজ চরিত্র চিত্রণে উন্নত শিল্প শৈলীর পরিচয় মেলে না। সেই তুলনায় লতা ও প্যাটার্নগুলো সুক্ষ্ম ও প্রাণবন্ত। রাধা-বল্লভ মন্দির ও গৌড়ের কদম রসূলের (১৫৩১ খ্রি.) একই শৈলীর ফাসাদ অলংকরণ এ সময় হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য অলংকরণের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্কের চিত্র তুলে ধরে।

সতের শতকে মল্লরাজাগণ প্রথম পোড়ামাটির মন্দির নির্মাণের বৃহৎ পদক্ষেপ নেন। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরগুলো এরই প্রত্যক্ষ ফসল। এ সময় পোড়ামাটির অলংকরণ ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অধ্যায় সূচিত হয়। এত দিনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে মুঘলগণ বাংলার শাসন ক্ষমতায় জাঁকিয়ে বসেছেন। মুসলিম স্থাপত্য থেকে পোড়ামাটির অলংকরণের গুরুত্বও নিঃশেষিত হয়েছে। এই রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ষোল শতকের শেষ দিকে মল্লরাজ বীর হাম্বীর কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা লাভ বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে বিশাল রূপান্তর ঘটায়। সমগ্র সতের শতক জুড়ে মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত সাহিত্য, সংগীত, মন্দির স্থাপত্য ও চিত্রকলার সৃজনশীল বিকাশ ঘটে।[১] বিষ্ণুপুরে চিত্রকলার বিকাশ সম্ভবত মন্দির স্থাপত্য অলংকরণে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এ সময় নির্মিত টেরাকোটা মন্দিরগুলো মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীবাচক ভাস্কর্য নকশায় পোড়ামাটির চিত্রিত ফলক দ্বারা মন্দিরের চার দেয়াল সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করে নির্মিত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে মুসলিম ধর্মীয়-স্থাপত্য অলংকরণের বিপরীত চরিত্র যা তৎকালীন হিন্দু জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান তথা হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতাকে বিধৃত করে।

বিষ্ণুপুর চিত্রশালায় পারসিক চিত্রকলার কোন ধরণের প্রভাব ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও মন্দিরের পোড়ামাটির অলংকরণে পারসিক বিষয়বস্তু নিশ্চিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যার উদাহরণ পাওয়া যায় কেষ্টরায় জোড়-বাংলা মন্দির ও পঞ্চরত্ন শ্যামরায় মন্দিরে উপস্থাপিত পারসিক মহাকাব্য 'শাহ্নামা"এ বর্ণিত পৌরাণিক পাখি 'সিমূর্গ' বা 'চুঙ্গল চিড়িয়া' সম্বলিত ফলকে [২] (চিত্র: ৬.১৪ ও ৬.১৪ ক)। এই ফলকটি ছাড়াও জোড়-বাংলা মন্দিরের অপর আর একটি ফলকে পারসিক পোষাক পরিহিত কিছু নর-নারীর চিত্র বিষ্ণুপুরের শিল্পচর্চায় পারসিক প্রভাবের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে (চিত্র: ৬.১৫)। তবে এখানে উৎকীর্ণ পুরুষ ভাস্কর্যসমূহের শিরস্তান দেখে অনুমিত হয় যে এরা পারসিক চিত্রকলা দ্বারা প্রভাবিত মুঘল চিত্রকলার অবদান। বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির

১. অশোক ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*., পৃ. ৪৬-৪৭
২. শ্রীলা বসু, অভ্র বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

ফলকগুলো বেশ নিপুণ ভাবে তৈরী বিশেষ করে শ্যাম-রায় মন্দিরের ফলকগুলোর যে সূক্ষ্মতা, তা আর কখনো অর্জন করা সম্ভব হয়নি (চিত্র: ৬.১৬)।

চিত্র: ৬.১৪

চিত্র: ৬.১৪ ক

চিত্র: ৬.১৫

চিত্র: ৬.১৬

তবে মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীবাচক অবয়ব চিত্রণে দ্বিমাত্রিক ও লোকায়ত ছাপকে বিষ্ণুপুরের শিল্পীগণ অতিক্রম করতে পারেন নাই। আঠার শতককে বাংলার মন্দির ও পোড়ামাটির শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই শতকে গুণে, মানে ও সংখ্যায় মন্দির স্থাপত্যে এক বিপ্লব ঘটে। হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, রাজশাহী,পাবনা, যশোর , খুলনা ও ফরিদপুর জেলায় বহু মন্দির নির্মিত হয়েছে। এদের মধ্যে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া রাজবাড়ির ছোট আহ্নিক মন্দির (১৭২২ খ্রি.), বর্ধমান জেলায় অবস্থিত কালনা রাজবাড়ির পঁচিশরত্ন লালজি মন্দির (১৭৩৯ খ্রি.)ও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির (১৭৫১ খ্রি.), ও দিনাজপুরের কান্তজি মন্দির (১৭৫২ খ্রি.)[১] সুন্দরতম মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শন। আঠার শতকের পোড়ামাটির ফলকের বৈশিষ্ট্য হল- এসময়ের পোড়ামাটির ফলকগুলো

১. Hoque, M.M. & Seema Hoque, *Kantajee Temple An Outstanding Monument of Late Medieval Bengal*, Dhaka,UNESCO, 2005, p.58

চিত্র: ৬.১৭

চিত্র: ৬.১৮

অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও বাস্তবসম্মত ভাবে নির্মিত। গভীরভাবে উৎকীর্ণ এই ফলকগুলো কখনো কখনো ত্রিমাত্রিক বলে মনে হয় (চিত্র: ৬.১৭)। কান্তজি মন্দিরের ভিত্তিতে উৎকীর্ণ শিকার দৃশ্য যে কোন দক্ষ হাতে অঙ্কিত চিত্রকলার সাথে তুলনীয়। ফলকগুলিতে মুঘল চিত্রকলার প্রভাব রয়েছে। মুঘল চিত্রকলা বিষয়বস্তু যেমন- শিকার দৃশ্য, শোভা যাত্রা ইত্যাদি সতের-আঠার শতকের মন্দিরে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকে লক্ষ্য করা যায়। মন্দির অলংকরণে আর একটি মুঘল প্রভাব লক্ষ্য করা যায় মন্দিরের অলংকরণ ফলকে চিত্রিত চরিত্রগুলোর পোষাক চিত্রণে। বিশেষ করে সামাজিক দৃশ্য চিত্রণে মুঘল দরবারি পোশাক যেমন পুরুষদের ক্ষেত্রে - চোগা, চাপকান, আচকান, পিরান বা আঙ্গরাখা (এগুলো পুরো হাতার জামা যাদের কোমর থেকে কুচি থাকে) এর সাথে পাজামা ও চুড়িদারের ব্যবহার দেখা যায়। পুরুষের মাথায় পাগড়ি উপস্থাপিত হয়েছে । নারীর পোষাকের ক্ষেত্রে চোলী, ঘাগরা, ওড়না ও মাথায় ঘোমটা বা ওড়নার ব্যবহার ছিল। মুসলিম-পূর্ব যুগে নারী-পুরুষ উভয়ের পোষাক ছিল ধুতি, পুরুষদের উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত থাকত, নারীদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে চাদরের ব্যবহার দেখা যায়। পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে লঙ্কারাজ রাবন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরবারী পোষাকে সজ্জিত অবস্থায় চিত্রিত হয়েছে। সতের শতক হতে মন্দির অলংকরণের আর একটি জনপ্রিয় বিষয় ছিল 'শিকার দৃশ্য'। মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির ফলকে 'শিকার দৃশ্য' উপস্থাপনেও মুঘল চিত্রকলার প্রভাব লক্ষণীয়। দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের ফলকে উৎকীর্ণ মনুষ্য চরিত্রগুলোর পোষাক, অস্ত্র, ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকারের পিছু ধাবিত হওয়া, বল্লমের সাহায্যে শিকারের দৃশ্যের যে অবতারনা করা হয়েছে তাতে মুঘল চিত্রকলার প্রভাব দৃশ্যমান (চিত্র: ৬.১৮)। বিষ্ণুপুরের কেষ্টরায় মন্দির ও দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলকে বাজপাখি হাতে রাজকীয় পুরুষ কখনো একক কখনো শিকার যাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে (চিত্র: ৬.১৯)। এখানে উল্লেখ্য যে, মুঘল চিত্রকলায় পাখি হাতে দন্ডায়মান প্রতিকৃতি খুব জনপ্রিয় বিষয় হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। পারস্য সুলতানদের অনুকরণে মুঘল সম্রাটগণ বাজপাখির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। মৃগয়া এমনকি দরবার দৃশ্যে সম্রাটদের হাতে বাজপাখি ধারণ করতে দেখা যায় (চিত্র: ৬.১৯ ক)। যুবরাজ

চিত্র: ৬.১৯

চিত্র: ৬.১৯ ক

সেলিমের প্রতিকৃতিতেও হাতে বাজপাখি দেখা যায়।[১] এছাড়া মুঘল চিত্রকলায় রাজকীয় শোভাযাত্রাও বিশেষ গুরুত্বের সাথে চিত্রিত হয়েছে। হাতি-ঘোড়া, পাইক-পেয়াদা, বাদকদলসহ রাজা বা জমিদারদের শোভাযাত্রার যে চিত্র দিনাজপুরের কান্তজীসহ আরো বহু মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে তুলে ধরা হয়েছে তাতে মুঘল চিত্রকলারই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সতের শতক হতেই মন্দির স্থাপত্যে ভিত্তি সংলগ্ন নকশায় শিকার ও শোভাযাত্রার দৃশ্য স্থান করে নেয়। আঠারো শতকে যুক্ত হয় বিভিন্ন ইউরোপীয় চরিত্র যেমন- সাহেব, মেম সাহেব, আধুনিক অস্ত্রসহ সৈনিক, যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি। আঠার শতকের মন্দিরের আর একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হল ভবনের কোণগুলোতে 'মৃত্যুলতা'র উপস্থাপন (চিত্র: ৬.২০)। এটি মন্দির কোণে উল্লম্বভাবে নির্মিত একটি উদ্গাত প্যানেল যাতে মানুষ ও জীবজন্তুর ভাস্কর্য জোড়ায় জোড়ায় একটির উপর একটি এমন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যেন একে অপরকে আক্রমণে উদ্যত, যুদ্ধ ও মৃত্যুর এক বিভীষিকাময় চিত্র। ভাস্কর্যগুলো প্রায় গোলায়িত। এ সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই অতি ক্ষুদ্রাকার (দেড় থেকে দুই ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের) ও সুক্ষ্মভাবে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির, পুটিয়ার আহ্নিক মন্দির ও দিনাজপুরের কান্তজির মন্দিরের ফলকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পরার মত।

১. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম চিত্রকলা*, ঢাকা, ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮, পৃ. ৩৯৬

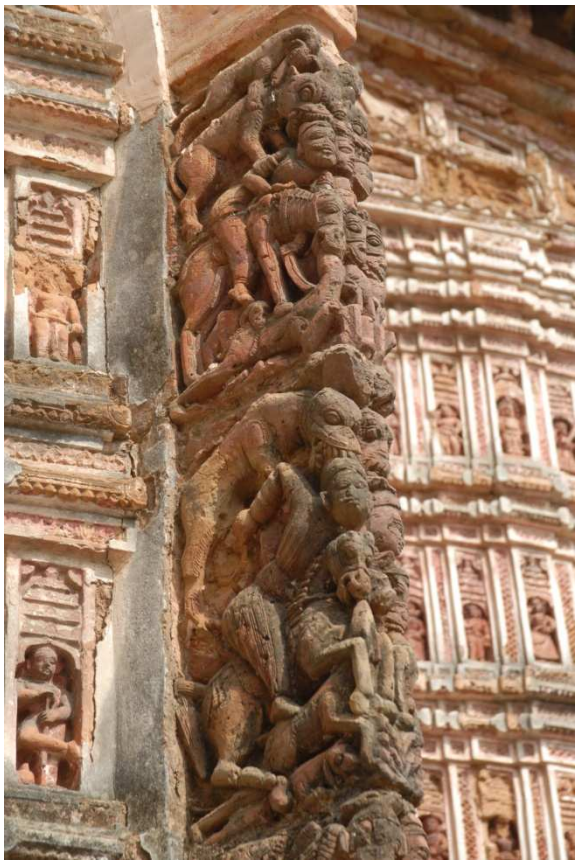

চিত্র: ৬.২০

শুধুমাত্র স্থাপত্য সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্তে মুসলিম স্থাপত্যে প্রবর্তিত পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলো কালের বিবর্তনের ধারায় হিন্দু মন্দির গুলোতে যেন প্রাণবন্ত ওঠে। সতের শতক হতে পোড়ামাটির ফলকসমূহ এত বিচিত্র মোটিফ ও দৃশ্যে মন্দিরগুলোতে উপস্থাপিত হয়েছে যে একে চিত্রশিল্পীর ক্যানভাসের সাথে তুলনা করা যায়। সমসাময়িক সমাজের আলেখ্য চিত্রিত ফলকগুলো বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবনে এক অমূল্য দলিল।

সপ্তম অধ্যায়

পোড়ামাটির শিল্প নির্মাণ কৌশল

পোড়ামাটির বিশ্বের প্রাচীনতম শিল্প মাধ্যম। প্রাচীনকাল থেকে গৃহস্থলী তৈজসপত্র, ভাস্কর্য, সীল, গৃহসজ্জায় উপাদান ইত্যাদি নির্মাণে পোড়ামাটির ব্যবহার চলে আসছে। পোড়ামাটির শিল্পের সবচেয়ে ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্যে। মুসলমানদের হাতে এই সময় পোড়ামাটির শিল্প ভিন্ন মাত্রা পায়। বাংলার মুসলিম স্থাপত্য সজ্জায় এর সূচনা হয় এবং কয়েক শতাব্দীর পর্যন্ত তা বাংলার স্থাপত্য অলংকরণের প্রধান মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পোড়ামাটির শিল্প নির্মাণে এ সময় এত দক্ষতা অর্জিত হয় যে, অলংকরণের সুক্ষতা, মসৃনতা ও পরিমাপের দিক দিয়ে তা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এই সমস্ত পোড়ামাটির শিল্প নির্মাণ পদ্ধতি সমন্ধে কোন সমসাময়িক লিখিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পোড়ামাটির শিল্প একটি কালাতীত শিল্প হিসাবে এখনও প্রচলিত। সম্ভবতঃ প্রাচীন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই এই শিল্পসৃষ্টি এখনও চলমান। পোড়ামাটির শিল্প কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ টেরাকোটা শব্দটি ইতালীয় 'টেরা' ও 'কোটা' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ যথাক্রমে মাটি ও পোড়ানো। তবে সব ধরণের পোড়ামাটির তৈরী জিনিস টেরাকোটা নামে পরিচিত নয়। যেমন, পোড়ামাটির তৈজসপত্রের (হাড়ি,বাসন, ফুলদানী ইত্যাদি) ক্ষেত্রে সাধারণত earthen ware বা pottery শব্দটি বেশী ব্যবহৃত হয়। আবার পোড়ামাটির নির্মাণ উপাদান ইট বা brick নামে পরিচিত। সাধারণত পোড়ামাটির ভাস্কর্য, সীল, খেলনা, স্থাপত্য সজ্জায় ব্যবহৃত অলংকৃত ফলক ও অলংকৃত ইট ইত্যাদি শিল্প উপাদান টেরাকোটা নামে পরিচিত।

টেরাকোটা নির্মাণের প্রধান উপাদান হল মাটি। মাটি সংগ্রহ থেকে শুরু করে বেশ কয়েক ধাপে পোড়ামাটির ফলকগুলো নির্মিত হয়। সব ধরনের মাটি দিয়ে মাটির শিল্প প্রস্তুত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় আঁঠালো মাটি বা এঁটেল মাটি। সব জায়গার জমিতেও এঁটেল মাটি পাওয়া যায় না। অনেক সময় মৃৎশিল্পীকে দূর-দূরান্ত থেকে মাটি সংগ্রহ করতে হয়। সাধরণত ৪/৫ হাত মাটি খুঁড়ে এঁটেল মাটির সন্ধান পাওয়া যায়। একটি মাটির কূপ ৮/৯ ফুট পর্যন্ত গভীর হতে পারে। মাটি সংগ্রহের পর তার সংরক্ষণের কাজ করা হয়। খোলা আকাশের নীচে রাখলে উষ্ণ ও আদ্রতা মাটির গুণাগুণ নষ্ট করতে পারে বিধায় তা সংরক্ষণের প্রয়োজন পরে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গর্ত খুঁড়ে তাতে মাটি সংরক্ষণ করা হয়। গর্তের উপর কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় যাতে রোদ বা বৃষ্টির কারণে মাটির গুণাগুণ নষ্ট না হয়। আবার কোন কোন জায়গায় ছাউনি তৈরী করে মাটি সংরক্ষণ করা হয়।[১] তবে

১. মোঃ রফিকুল আলম, *বিশ্বের মৃৎশিল্প*, ঢাকা, অনন্যা, ২০১৪, পৃ. ১৩২

শুধুমাত্র এঁটেল মাটি দিয়ে শিল্প সৃষ্টি হয়না কেননা শুধুমাত্র এঁটেল মাটির তৈরী দ্রব্য পোড়াবার সময় সংকুচিত হয়ে ফেঁটে যায়। মাটির নমনীয়তা বাড়াতে বালি উপযোগী উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাটির দ্রবাদি সাথে পরিমাণ মত বালি মিশ্রিত করা হয়। সিন্ধু উপত্যকায় মাটির লেই এর সাথে চুন, অভ্র (mica) ও বালি মিশ্রিত করা হত।[১] হিন্দু মূর্তি শাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্রে ভাস্কর্য নির্মাণের মাটি প্রস্তুতের বিভিন্ন কৌশলের উল্লেখ আছে। তবে মাটির ভাস্কর্য পোড়াবার সময় ফেটে যাওয়া রোধ করতে অভ্রের মিশ্রণই মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [২] বাংলা বদ্বীপের দোআঁশ মাটি প্রকৃতিগতভাবে বালি, চুন, অভ্র মিশ্রিত পোড়ামাটির শিল্পের উপযোগী মুসলিম শাসনামলে এই গাঙ্গেয় দোআঁশ মাটি পোড়ামাটির শিল্প সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছিল।[৩] বেশ কয়েক ধাপ অতিক্রম করে মৃৎশিল্পীগণ মৃৎশিল্প সৃষ্টি করে থাকেন। এগুলো হল -

ক. মাটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

খ. মাটিকে মৃৎপাত্রের উপযোগী করা

গ. চাক, হাত বা ছাঁচে শিল্প দ্রব্যের আকার দান

ঘ. রোদে শুকানো ও আগুনে পোড়ানো।

মাটি সংগ্রহের কাজটি সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে করা হয়। এর পর তা গর্ত বা ছাউনিতে সংরক্ষণ করা হয়।

এরপর মাটিকে নির্মাণ উপযোগী করে তোলার পালা। প্রথমে সংরক্ষিত মাটি থেকে পরিমাণমত মাটি কোদাল দিয়ে কেটে আনা হয়। এরপর পানি দিয়ে ভিজিয়ে মাটিকে নরম করা হয়। লোহার আঁচড়া দিয়ে পিটিয়ে মাটিকে পাতলা করা হয়। এরপর চাটাই বা খোলার উপর বালি ছিটিয়ে পা দিয়ে মাটি মাড়ানো হয় যাতে পানি মাটির মধ্যে সমান ভাবে ছড়িয়ে পরে। এসময় মাটির ভেতরে থাকা পাথর, কাঠ সহ সমস্ত আবর্জনা বের করে ফেলা হয়। এভাবে মাটি মাড়ানোর ফলে তা বাতাসের বুদবুদ ও আবর্জনা মুক্ত মসৃণ মাটিতে পরিণত হয়। মাটি মসৃণ করার পর সম্ভত এর মধ্যে অভ্র বা (mica) মেশানো হত। মৃৎশিল্পী মসৃণ মাটির তাল একটি তক্তার উপর নিয়ে দুহাতে ভাল ভাবে মথে নেন। তৈজসপত্রের তুলনায় ছাঁচে নির্মিত ফলক ও অন্যান্য পোড়ামাটির দ্রব্যদি তৈরীতে অধিক পরিমাণে বালি মেশানো হত।

মাটি প্রস্তুতের পর শিল্পের আকার প্রদানের জন্য বহু প্রাচীন দুটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

ক. হাতে তৈরী পদ্ধতি বা hand modelled

---

১. E.J.H. Mackay, *Further Excavations of Mohenjodaro*, New Delhi, Government of India Press, 1938, p. 176

২. Stella Krmrisch, "Indian Terracottas", *JISOA*, Vll, 1939, p. 10.

৩. রাজশেখর বসু, *ভারতের খনিজ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৮ বাং., পৃ. ১৯

খ. ছাঁচে তৈরী পদ্ধতি বা moulding

ক. হাতে তৈরী পদ্ধতি বা hand modelled: এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম পদ্ধতি। কোন প্রকার ছাঁচ ব্যবহার না করে শুধুমাত্র হাত ও ধাঁরালো চাকুর সাহায্যে শিল্প সৃষ্টি করা হত। মৃত্তিকা মন্ড আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে শিল্পী তার প্রয়োজন মত আকার দিবেন। বিশেষ করে একক ভাস্কর্য তৈরীতে হাতে তৈরী পদ্ধতি ব্যবহৃত হত। পাহাড়পুর ও ময়নামাতির জাদুঘরে প্রদর্শিত খেলনা মূর্তিগুলো এই পদ্ধতিতে তৈরী। হাতে তৈরী পদ্ধতি প্রায় তিন হাজার বছর পূর্ব হতে প্রচলিত আছে।

খ. ছাঁচে তৈরী পদ্ধতি বা moulding: এই পদ্ধতির প্রচলন ঘটে সুঙ্গ আমল হতে (খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) । এ পদ্ধতিতে প্রথমে ছাঁচে মডেল তৈরী করা হয়। ছাঁচে তৈরী মডেল হিসাবে মাটি, মোম, কাঠ বা পাথরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মডেল থেকে মাটি দিয়ে ছাঁচ তৈরী করে তা পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত। শক্ত ছাঁচে প্রস্তুতকৃত মৃত্তিকা মন্ড ঠেসে ছাঁচ হতে প্রতিফলক প্রস্তুত হত। ছাঁচে তৈরী ফলক রিফিল বা স্বল্প উন্নত ফলকের মত দেখায়। একক (round) ভাস্কর্য তৈরীর ক্ষেত্রে দুই ছাঁচের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ভাস্কর্যের সম্মুখের অংশের জন্য একটি ছাঁচ ও পেছনের জন্য আরেকটি ছাঁচ ব্যবহৃত হত। দুইভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ হত। ১.মাটির দলাকে দুই দিক থেকে দুটো ছাঁক দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে ২. আলাদা আলাদা ভাবে ছাঁচ দুটিতে ছাপ দিয়ে পরে দুটো অংশকে একসাথে জোড়া লাগিয়ে ভাস্কর্য তৈরী হত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভাস্কর্যের ভেতরের অংশ ফাঁপা থাকতো। বৃহৎ আকৃতির প্রতিমা তৈরীর ক্ষেত্রে সম্ভবত আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছাঁচে তৈরী করে শিল্পী তা হাতে জোড়া দিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা প্রস্তুত করতেন।

পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলো প্রায় সবই ব্যা-রিলিফে (Bas-relief) নির্মিত। ব্যা-রিলিফগুলো (যেন পটভূমির মধ্যে প্রায় প্রেথিত এমনভাবে গঠিত মূর্তি) আংশিক ছাঁচ ও আংশিক হাতে তৈরী। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ছাঁচে ফেলে বিভিন্ন আকারের মাটির ব্লক তৈরী করে তা হালকা শুকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর শিল্পী ধাঁরালো ছুরি দিয়ে নিজের প্রয়োজন মত বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলেন। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলো ব্যা-রিলিফে প্রস্তুত। মুসলিম শাসনামালে স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকগুলোও ব্যা-রিলিফে করা। মুসলিম স্থাপত্য অলংকরণে যে বিপুল পরিমাণ পোড়ামাটির চিত্রফলক ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে ধারণা করা হয় যে এ সময় ছাঁচে তৈরী পদ্ধতিও তারা অনুসরণ করে ছিলেন।[১] তবে তাঁতীপাড়া মসজিদের চিত্রফলকগুলো সুক্ষ ও ধাঁরালোভাব ও পটভূমি থেকে বেরিয়ে

১. Muhammad Hafizullah Khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture in Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1988, p.229

আসার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা কোন শিল্পীর ধাঁরালো সরঞ্জামের ছোঁয়া ছাড়া শুধু ছাঁচে ফুটিয়ে তোলা সম্ভবময় বলে মনে হয় না।

মুসলিম শাসানামলে স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হত।

সর্বপ্রথম স্থাপত্যের কোন জায়গাগুলো অলংকৃত করা হবে তার একটা সম্পূর্ণ নকশা এর প্রকৃত মাপে প্রস্তুত করা হত। এ ক্ষেত্রে নকশাগুলো কাটা, জোড়া লাগানো ও ফিটিং (fitting) এর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে নির্ভুল মাপসহ কাগজে আঁকা হত এবং শিল্পীকে সরবারহ করা হত। কাগজে আঁকা নকশাগুলো সুঁচ দ্বারা রেখা অনুযায়ী ছিদ্র করে ট্রেসিং তৈরী করা হত । এরপর কাগজটি প্রস্তুতকৃত মাটির সমতল পাটায় বসিয়ে এর উপর খড়িমাটি বা চুন ছিটিয়ে দেওয়া হত। এতে নকশাটি মাটির পাটায় স্থানান্তরিত হত।[১] শিল্পী এই নকশার ভিত্তিতে প্রতিটি ফলকের মডেল তৈরী করতেন এবং এই মডেল হতে তৈরী হত ছাঁচ বা (mould)। ছাঁচ আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হতো। এর পর মাটির ঐ ছাঁচে মন্ড চেপে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফলক প্রস্তুত হত। শিল্পী ফলকগুলো ঘষা-মাজা করে একে মসৃণ ও আরো দৃশ্যমান করে তুলতেন। এই কাজে হাড়, শিং বা বাঁশের তৈরী চোঁখা ছুরি ব্যবহৃত হত।[২] ফলকে কোন সংশোধন বা সংস্কার থাকলে তা এই পর্যায়ে করা হত। কেননা ফলকগুলো একবার সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে এতে কোন ধরণের সংশোধন সম্ভব হয় না। সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতের পর তৈরী ফলকগুলো রোদে শুকিয়ে শক্ত করা হত।

আগুনে পোড়ানোর আগে মাটির তৈরী এ সকল শিল্প নিদর্শনগুলোর উপরে এক প্রকার মাটির দ্রবণের পাতলা আবরণ প্রদান করা হত। দুটি পদ্ধতিতে এই দ্রবণ প্রদান করা যায়। ১. ব্রাশের সাহায্যে ২. দ্রবণে নিদর্শনটি ডুবিয়ে। দ্রবন তৈরীর জন্য প্রথমে মৃৎ শিল্পীগণ একটি বিশেষ ধরণের মাটি সংগ্রহ করেন। অঞ্চল বিশেষে লাল মাটির সাথে খয়ের ও সোডা মোশানো হয়। কোন কোন জায়গায় গাছের ছালও ব্যবহৃত হয়।[৩] পশ্চিমবঙ্গে 'গাদ' ও বনাক নামে হলুদ ও লালমাটি শিল্প নিদর্শন রঞ্জণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে মাটিগুলো প্রথমে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি দিয়ে একটি পাত্রে ভিজিয়ে পাতলা করা হয় এবং ১০-১৫ দিন ঐ অবস্থায় রাখা হয়। এরপর উপর থেকে পানি ফেলে দিয়ে তলানীটা রঙ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। (তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন প্রকার রঙে প্রয়োগ ছাড়াই নিদর্শনগুলো সরাসরি পোড়ানো হয় তাতে নিদর্শনগুলো লালচে খয়ের রঙ ধারণ করে। কালো রঙ করার ক্ষেত্রে

---

১. ইলখানী স্থাপত্য অলংকরণে চকচকে মোজাইক টালি নির্মাণে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হত। Habibollah Ayatollahi, *The Book of Iran: The History of Iranian Art*, Shermin Haghshenas (trans.), Tehran, Center for International Cultural Studies, 2002, p. 242; কাগজ থেকে অন্য মাধ্যমে নকশা স্থানান্তরের এই পদ্ধতিটি এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে।

২. Mukal Dey, *Birbhum Terracottas*, New Delhi, Lalit Kala Akademi, 1959, p. 13; Hafizullah Khan, *op.cit.*, p. 232

৩. মো. রফিকুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

বিশেষ পদ্ধতিতে নিদর্শনগুলো পোড়ানো হয়। এ ক্ষেত্রে নিদর্শনগুলো বন্ধ চুল্লীতে পোড়ানো হয়। এতে কার্বন পুঞ্জিভূত হয়ে কালো রঙ ধারণ করে।)

মাটির তৈরী নিদর্শনগুলোকে আগুনে পোড়ানোর বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকাল থেকেই দুটি পদ্ধতিতে মাটির শিল্প পোড়ানো হয় ১. খোলা আগুনে ২. বদ্ধ চুল্লীতে। সিন্ধু সভ্যতায় এই দুই ধরণের চুল্লীর ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।[১] বদ্ধ চুল্লী সম্ভবত মিশরীয় সভ্যতায় (খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর) প্রথম দেখা যায়। এরপর গ্রপদী গ্রীস এবং পরবর্তী রোমে চুল্লীর ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে মৃৎশিল্প পোড়াবার চুল্লী পন, পইন মৈহল্যা, পাইন চারী বা ভাটি নামে পরিচিত।

বদ্ধ চুল্লীগুলোতে কাঠ পোড়াবার জন্য একটি গর্ত থাকে। এর উপরে থাকে একটি ফোকর যুক্ত মাঁচা যা একটি গম্বুজের মত ছাদ দ্বারা আবৃত থাকে। বিশেষ ধরনের পাত্র নির্মাণে বদ্ধ চুল্লী বা (closed kiln) ব্যবহৃত হয়। মৃৎশিল্পীদের তৈরী শিল্প নিদর্শনগুলোকে চুলার ভেতরের চারদিকে সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো হয়। নিদর্শনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে খড়কুটা ও গাছের ছাল ইত্যাদি রাখা হয়। সাজানোর পর খড়কুটা দিয়ে আবৃত করে মাটির প্রলেপ দিয়ে ফলকগুলো ঢেকে দেওয়া হয়। মাটির প্রলেপের চারদিকে ছোট ছোট ছিদ্র করা হয় যাতে ধোয়া বেরিয়ে যেতে পারে। এর পর জ্বালানী কাঠ দিয়ে ধীরে ধীরে আগুন জ্বালানো হয়। মৃৎপাত্র বা মৃন্ময় নিদর্শন পোড়াতে প্রথম এক থেকে দুই দিন (বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নিয়মে) হালকা উত্তাপে এর পর ৮ থেকে ১৪ ঘন্টা উঁচ্চ তাপমাত্রায় পোড়ানো হয়। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা ৬০০° সে. থেকে ৯০০° সে. পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে। সমগ্র পইন বা চুল্লীতে আগুন ধরে গেলে নিচের দিক থেকে জ্বালানি বন্ধ করে দেয়া হয়। ভালো ভাবে পোড়ার জন্য এভাবে দুদিন রেখে দেয়া হয়। চুল্লী ঠান্ডা হতে সাত বা তার চেয়েও বেশী সময় নেয়।[২] মাটির প্রলেপের ভিতরের খড়কুটাগুলো সম্পূর্ণ পুড়ে চুল্লী ঠান্ডা হলে মাটির প্রলেপ ভেঙে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত স্তরে স্তরে সাজানো ফলকগুলো সাবধানে নামানো হয়।[৩] মৃৎশিল্প নির্মাণের মাটি সাধারণত এর ছাঁচ হতে $\frac{১}{৮}$ অংশ সংকুচিত হয়। এর মধ্যে পানি শুকানোর সময় এর অর্ধাংশ ও পোড়াবার সময় বাকী অর্ধাংশ সংকুচিত হয়। এ ক্ষেত্রে নকশার মাপ থেকে ছাঁচের মাপ নিশ্চিতভাবে সংকোচনের অনুপাতে আকারে বড় হয়। এই অনুপাত নির্ধারণ একমাত্র অভিজ্ঞ ও দক্ষকারীগরের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

১. E.J. Mackay, *op.cit.*, p. 177
২. Muhammad Hafizullah Khan, *op.cit.*, p. 238
৩. রফিকুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

টেরাকোটা ফলকগুলো প্রায় দুই ইঞ্চি পুরু করে তৈরী হয়। সমগ্র ফলকটি ছাঁচে তৈরীর সময় সবদিকে সমান হওয়া জরুরী না হলে সংকোচনের সময় তা অসম আকার ধারণ করবে।[১] পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শনের রঙ লাল ও কালো দুই বর্ণেরই হয়ে থাকে। এর রঙের তারতম্য ঘটে মাটির রাসায়নিক গুণাগুণ ও পোড়ানোর পদ্ধতি ও সময়ের উপর। যদি পোড়ানোর সময় চুল্লীতে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকে তাহলে মাটির লৌহ (iron) জারিত হলে হালকা লাল রঙ সৃষ্টি করে, চুল্লী সম্পূর্ণ বদ্ধ থাকলে অর্থাৎ এর মধ্যে কোন বাতাস চলাচলে সুযোগ না থাকলে পত্র বা শিল্প নিদর্শন ধুসর বা কালো বর্ণ ধারণ করে।[২]

মৃৎ শিল্প নির্মাণের কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় এর মধ্যে কাটার জন্য কোদাল, মাটির মধ্যে মিলে থাকা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ ও অবর্জনা বের করা জন্য বাঁশের চাটা, মাটি পিটিয়ে আকাঙ্ক্ষিত আকারে আনার জন্য বোল ও পিনটো, কুমোরের চাকা, বিভিন্ন ধরনের একক ও ডবল ছাঁচ (টেরাকোটা অথবা প্লাষ্টার অব প্যারিস নির্মিত) এবং নকশার জন্য চোঁখা বাঁশ, লৌহ দন্ড, সুঁচাগ্রযুক্ত কলম, ছুরি ইত্যাদি। এছাড়া শিল্প নিদর্শন রং করার জন্য, কাপড়, তুলা বা ব্রাশ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে রঙের কাজে স্প্রেও ব্যবহৃত হয়।

টেরাকোটা ফলকসমূহের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য গৃহীত একটি স্থানীয় পদ্ধতি হল লাক্ষা কীটের লালা থেকে প্রস্তুত 'অলক্ত' নামের এক ধরণের দ্রবণের ব্যবহার যা লাক্ষা কীটের লালা থেকে প্রাপ্ত অশোধিত লাক্ষিক মামড়ি গরম পানিতে সেদ্ধ করে প্রস্তুত করা হত।[৩] পোড়ামাটির ফলকসমূহের উপর এই দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করলে ফলকগুলির রং ও আকার বহু দিন অটুট থাকতো।

খুব সম্ভবত মুসলিম শাসনামলে স্থাপত্য অলংকরণে যে সকল পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো স্থাপত্য নির্মাণ স্থলেই প্রস্তুত করা হত।[৪] স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকগুলো সঠিক স্থানে বাসিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী নকশা ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে স্থাপত্য অলংকরণের কাজ সমাপ্ত হত। স্থাপত্যে ব্যবহৃত টেরাকোটা নির্মাণে যেমন গাণিতিক ও কারিগরি জ্ঞানে প্রয়োগ জরুরী তেমনি প্রতিটি চিত্রফলক একটির পাশে অন্যটি সঠিক স্থানে বসিয়ে নির্দিষ্ট চিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে দক্ষ কারিগরি জ্ঞান দরকার। শিল্পী হয়তো সম্পূর্ণ নকশাটি দেয়ালে বসাবার আগে মাটিতে সাজিয়ে নিতেন। এতে করে কোন ফলক ভুল স্থানে বসছে

---

১. Richard Giazier, *A Manual of Historic Ornament,* New York, Dover Publications, 1948, p. 89

২. Muhammad Hafiznllah Khan, *op.cit.,* p-235; মো. মোকাম্মেল হোসেন ভূইয়া, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ৪২

৩. তারাপদ সাঁতরা, *পশ্চিম বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ*, কলকাতা, পশ্চিম বাংলা একাদেমী, ২০১৪, পৃ. ৫০

৪. Muhammad Hafizullah Khan, *op.cit.,* p. 237

কিনা তা বোঝা যেত।[১] তবে গুচ্ছ অলংকরণে ক্ষেত্রে ত্রুটি এড়াবার জন্য চিত্রফলকের পেছনে তৈরীর সময় নম্বর বসিয়ে দেওয়া হত। ইমারত থেকে খসে পরা অনেক পোড়ামাটির চিত্রফলকের পেছনে সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে যা এই মতকে সমর্থন করে। দেওয়ালে ইটের উপর পুরু করে পলেস্তরা আস্তর দিয়ে তার উপরে ফলকগুলো বসানো হত। তবে ইমারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত ব্যান্ড নকশাগুলো ইটের উপর উৎকীর্ণ হত এবং সম্ভবত তা স্থাপত্য নির্মাণের সময়ই গেথে ফেলা হত। শুধু চিত্রফলকগুলো ভবন গেঁথে ফেলার পর নির্ধারিত স্থানে পলেস্তারার আস্তরে সহযোগে বসিয়ে দেওয়া হত।

মুসলিম শাসনামলে নির্মিত মসজিদ, মন্দির, প্রসাদসহ সকল ধরনের স্থাপনা যেখানে পোড়ামাটির অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে দুই ধরনের ফলকের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়।

১. একক ফলক বিন্যাস

২. গুচ্ছ ফলক বিন্যাস

১. একক ফলক (single plaque) : একক ফলকগুলো একটি নকশাযুক্ত হয় এদের স্থাপত্যের বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পনা অনুযায়ী বসানো হয়। প্রায় ক্ষেত্রে একক ফলক পাশাপাশি বসিয়ে একই নকশার পুনরবৃত্তির মাধ্যমে পাড় নকশা সৃষ্টি করা হয় অথবা দুটি একক ফলক একটি পর একটি ধারাবাহিকভাবে স্থাপন করে সৃষ্টি নকশার উদাহরণ এসময়ের স্থাপত্যে অনেক।

২. গুচ্ছ ফলক (group plaque): গুচ্ছ ফলক বলতে একটি সম্পূর্ণ নকশাচিত্র প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত বেশ কিছু সংখ্যক ফলকের সমন্বয়কে বোঝানো হয়েছে। মুসলিম শাসনামলে পোড়ামাটির ফলকগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির হওয়ায় এবং দৃশ্য অলংকরণের প্রবণতা থাকায় একটি দৃশ্য নির্মাণে বেশ কিছু ফলকের সমন্বয়ের প্রয়োজন পরে। মূলত আদিষ্ট দৃশ্যকে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ করতে যেয়ে শিল্পীকে সমগ্র দৃশ্যটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে আলাদা আলাদা ফলকে উৎকীর্ণ করতে হত। দৃশ্যের বিন্যাস ঠিক রাখতে ফলকগুলোর পিছনে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হত। ফলক নির্মাণের পর সংখ্যা অনুযায়ী সাজিয়ে পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যটি ফুটিয়ে তোলা হত। মসজিদের মিহরাব অলংকরণে লতা ও ফুলযুক্ত খিলান প্যানেল অথবা মন্দিরের উৎকীর্ণ বিভিন্ন মহাকাব্যিক দৃশ্য উপস্থাপনে এই ধরনের গুচ্ছ ফলকের ব্যবহার দেখা যায়।

---

১. Muhammad Hafizullah Khan, *Ibid.*

বাংলায় প্রাচীনকাল হতেই মৃৎশিল্পের চর্চা ছিল। স্থাপত্যে চিত্রিত পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহারও হত যার উদাহরণ ষষ্ঠ শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে ফলকগুলো ছিল আকারে বড় ও সীমিত নকশার মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্থাপত্যে পাড় নকশার অলংকৃত ইটের ব্যবহার ছিল যার উদাহরণ পাহাড়পুর (অষ্টম শতক), ময়নামতির বিভিন্ন মন্দির বিহার (সপ্তম শতক) ও বাসুবিহার (একাদশ শতক), দ্বাদশ শতকের বিভিন্ন দেউল অলংকরণে দেখা যায়। মুসলিম-পূর্ব যুগের স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকগুলো ছিল আকারে বড় ও ফলক সমতল হতে অতি প্রক্ষিপ্ত আকারে (high relief) উৎকীর্ণ।

মুসলমানগণ যখন বাংলায় আসেন সেই সময় এ অঞ্চলে স্থাপত্য অলংকরণের তিনটি মাধ্যম প্রচলিত ছিল, পাথর খোদাই, পোড়ামাটির অলংকরণ ও স্টাকো অলংকরণ। এর মধ্যে বাংলায় পাথরের অপ্রতুলতা ছিল। মুসলমানগণ পোড়ামাটি, পাথর ও ষ্টাকো তিনটি মাধ্যমকেই স্থাপত্য অলংকরণে ব্যবহার করেছেন। তবে এদের মধ্যে পোড়ামাটির অলংকরণ এখানে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। প্রথমদিকে পোড়ামাটির ফলক তৈরীতে সম্ভবত: দেশীয় কারিগর ও শিল্পীদের নিযুক্ত করা হয়েছিল কেননা অলংকরণের নকশাসমূহ বিমূর্ত বা প্রাণীবাচক মোটিফ বিহীন হলেও ফলকগুলি অতি প্রক্ষিপ্ত আকারে (high-relief) এ প্রস্তুত এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেশীয় তথা স্থানীয় পাথরের অলংকরণের অনুরূপ। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় ও ধর্মীয় (বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মীয়) প্রতীকও ফলকে উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়।

তবে মুসলমানগণ যে অঞ্চল থেকে এসেছিলেন অর্থাৎ পারস্য ও মধ্য এশিয়া, সেখানে একাদশ দ্বাদশ শতকের মধ্যেই পোড়ামাটির অলংকরণে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের পর এখানে ঐ সমস্ত অঞ্চল হতে ভাগ্যন্বেসী মৃৎশিল্পীদের স্বাভাবিকভাবেই আগমন ঘটেছিল বা তারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পোড়ামাটির শিল্প নির্মাণে যাদের উচ্চতর জ্ঞান বাংলায় পোড়ামাটির শিল্পের পুনরুত্থানের ভিত্তি রচনা করে ছিল। মুসলমানগণ বাংলায় স্বল্পোন্নত (low relief) ফলক নির্মাণসহ উন্নত নির্মাণ কৌশলের সূচনা করেন। যার ফলে মুসলিম যুগের সূচনা পর থেকে পোড়ামাটির ফলকগুলোর চেহারা পাল্টে যায়। এরা এখন আরও সুক্ষ্ম, নিপুণ, নিবিড় অলংকরণ সমৃদ্ধ একই সাথে শান্তিময় মনোরম ও দীর্ঘস্থায়ী[১] তবে অলংকরণের বিষয়বস্তু নির্ধারণে স্থানীয় প্রভাবই অধিক প্রাধান্য বিস্তার করে। তাই বলা যায়, মুসলিম

১. জুলেখা হক "মধ্যযুগে পোড়ামাটির শিল্প" *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮ চারু ও কারুশিল্প*, লালা রুখ সেলিম (সম্পা), ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ. ৯৯

শাসনামলে বাংলায় পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলো দেশীয় কলা-কৌশলে সাথে পারসিক রীতি-কৌশলের মিশ্রণে স্থাপত্য অলংকরণের আদর্শ মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল।

মুসলিম শাসনামলে নির্মিত স্থাপত্যসমূহে শিল্পীগণ তাদের নাম ও পরিচয় সম্বন্ধে কোন তথ্য উৎকীর্ণ করেন নাই । তবে ঊনবিংশ শতক থেকে স্থাপত্যের গায়ে শিল্পীদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের নাম পরিচয় থেকে এবং কিছু মাঠ পর্যয়ের জরিপ থেকে বাংলার মন্দির নির্মাণ ও অলংকরণ শিল্পীদের সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় ।

- নির্মাণ ও অলংকরণের সার্বিক কর্মকান্ডটি একজন বিশেষজ্ঞ শিল্পীর অধীনে একদল শিল্পী ও কারিগর দ্বারা সম্পন্ন হতো।[১]
- একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রায় সকল ব্যক্তি এই কাজে নিয়োজিত থাকতেন।
- টেরাকোটা শিল্পের কারিগরগণ অধিকাংশ ছিলেন সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা কাষ্ঠ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ও চিত্রকলা এই চার মাধ্যমেই পারদর্শী ছিলেন।[২]
- মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে শিল্পীদের নামের যে পদবী পাওয়া যায় তা হল: দাস, পাল, দে, দত্ত, সেন, সাঁই,চন্দ্র, শীল, কুন্ডু, সূত্রধর, রাজ, দলাই , লস্কর ইত্যাদি। এখনও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এইসব পদবী প্রচলিত আছে। হিন্দু স্থপতি ছাড়াও মুসলমান স্থপতিগণও মন্দির নির্মাণে নিয়োজিত হয়েছিলেন। শিলালিপি সূত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ।[৩]

টেরাকোটা শিল্পীগণ বংশ পরম্পরায় এই কাজ নিয়োজিত ছিলেন বিধায় ধারণা করা যায় যে, পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিম শাসনামলেও একই ভাবে স্থাপত্য নির্মাণ ও অলংকরণ ছিল উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর সামগ্রীক প্রচেষ্টার ফল।

ভবন নির্মাণের প্রথম পর্যায় থেকে শিল্পী ও কারিগরগণ প্রকল্পের কাছাকাছি স্থানে অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করে সেখানে অবস্থানপূর্বক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতেন। ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধায়নে নির্মাণকার্য পরিচালিত হতো বলে অঞ্চলভেদে স্থাপত্য অলংকরণে গুণগত ও অনেক সময় বিষয়গত প্রভেদও লক্ষ্য যায়।

---

১. নীহার ঘোষ, *বাংলার মন্দির শিল্পশৈলী (অন্ত মধ্যযুগ)*, কলকাতা, অমর ভারতী, ২০১২, পৃ. ২১৪

২. তারাপদ সাঁতরা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৫

৩. *প্রাগুক্ত.*

যে কোন স্থাপত্য নির্মাণ একটি ব্যয় সাধ্য ব্যাপার । আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের উদ্দ্যেগেই কেবলমাত্র এই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। নির্মাতার আথিক সঙ্গতি ও রুচির উপর স্থাপত্যের আকার ও অলংকরণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। মুসলিম শাসনামলের প্রথমপর্যায়ে সুলতানদের সময় রাজধানী গৌড় ও পান্ডুয়ায় শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও কারিগরদের দ্বারা নির্মিত স্থাপত্যগুলো তৎকালীন ইমারতগুলোর মধ্যে তাই সুন্দরতম সৃষ্টি। ষোল থেকে আঠারো শতকে নির্মিত মন্দিরসমূহের মধ্যে বিভিন্ন রাজা, মহারাজাদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত মন্দিরসমূহ যেমন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাগণ, দিনাজপুরের মহারাজা বা বর্ধমান রাজের নির্মিত মন্দিরসমূহই তৎকালীন মন্দিরগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল।

অষ্টম অধ্যায়
উপসংহার

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বাংলার ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপত্যে পোড়ামাটির শিল্পের উত্থান-পতন, পুনরভ্যুদয়, উন্নয়ন ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম শাসনামলে স্থাপত্যে এই শিল্প মাধ্যমের প্রয়োগ ও বিকাশের ধারা নির্ণয় করা। কাজটি মাঠপর্যায়ে স্থাপত্য জরিপ ও বিভিন্ন লিখিত প্রাসঙ্গিক দলিলের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

আলোচনায় দেখা যায় যে, বাংলায় পোড়ামাটির শিল্পের এক প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল। তবে গুপ্ত শাসনের পূর্ব পর্যন্ত তা স্থাপত্য অলংকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়নি (এর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না)। একাদশ শতক পর্যন্ত পোড়া মাটির অলংকৃত চিত্রফলক স্থাপত্য সজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ সময় ব্যবহৃত ফলকগুলোর বৈশিষ্ট্য হল এরা আকারে বড় ও স্থাপত্যের দেয়ালে সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে তা উপস্থাপিত হতো। বিষয়বস্তু হিসাবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বা জনপ্রিয় বিষয়বস্তু বা লোককাহিনী, জনজীবনের আলেখ্য, বিভিন্ন প্রাণীবাচক বা উদ্ভিজ্জ মোটিফ বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি উপস্থাপনে কোন শিল্পশাস্ত্র অনুসৃত হয়নি। একটি লোকায়ত শিল্প হিসাবে সাধারণত ধর্মীয় স্থাপত্যে এর প্রয়োগ দেখা যায়। একাদশ শতকের পরবর্তীকাল থেকে মসুলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণের কোন নিদর্শন খুজে পাওয়া যায় না। অপরদিকে দাক্ষিণাত্য থেকে আগত সেন শাসকদের প্রস্তর-শিল্প প্রীতি থেকে ধারণা করা হয় যে, এসময় প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই শিল্পচর্চা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের বাংলায় আগমন এখানকার স্থাপত্য ও শিল্প চিন্তায় নতুন ধ্যান-ধারণা ও রীতির সূচনা করে। মুসলিম স্থাপত্যের ধরন ও এর অলংকরণ দর্শন ছিল এদেশীয় শিল্পীদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। মধ্য এশিয়ার থেকে আগত এই নতুন জাতি গোষ্ঠী একটি ভিন্ন ও উন্নততর স্থাপত্যধারা ও শিল্পরীতি এদেশে নিয়ে আসেন। এসময় পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় স্থাপত্য অলংকরণে স্টাকো, টেরাকোটা, অলংকৃত ইট, রঙ্গিন টালি, পাথর খোদাই ইত্যাদি মাধ্যম প্রচলিত ছিল। এদেশে রঞ্জিত টালি অলংকরণ প্রচলিত না থাকায় এই শিল্পের কারিগর শ্রেণিও গড়ে উঠেনি। তবে পাথর, স্টাকো ও পোড়ামাটির ফলক শিল্পের প্রচলন ছিল। নদীবিধৌত বাংলার সমভূমিতে প্রস্তর সহজলভ্য ছিল না। তাই পাথর-শিল্প স্বাভাবিকভাবে ছিল ব্যয়বহুল। মুসলিম শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম-পূর্ব যুগে স্থাপত্যে ব্যবহৃত পাথর মুসলিম স্থাপত্যে

পুনর্ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা অঞ্চলে রাজ্য বিস্তারের এ পর্যায়ে মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকা তথা সামাজিক স্থিতিশীলতার অভাব, প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট আর্থিক সংগতি না থাকা সর্বপরি এ অঞ্চলের আবহাওয়া ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে মুসলমানগণ বাংলায় স্থাপত্য নির্মাণ ও অলংকরণের মাধ্যম নির্বাচন করেছিলেন। এদিক দিয়ে নির্মাণ উপাদান, শিল্পী ও কারিগরের যথেষ্ট যোগান, তুলনামূলকভাবে উৎপাদন ব্যয়ের স্বল্পতা, শিল্পের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা বিবেচনায় নির্মাণ উপাদান হিসাবে ইট ও অলংকরণ মাধ্যম হিসাবে পোড়ামাটির নকশা ফলক মুসলমানদের নিকট সম্ভবতঃ অধিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়। তবে পূর্ব ভারত ও মধ্য এশিয়ার পোড়ামাটির শিল্প ধারার মধ্যে বেশ কিছুটা পার্থক্য ছিল। মুসলমানদের বাংলায় আগমনের সময় বাংলার মৃৎ শিল্পের প্রাচুর্য্য থাকলেও স্থাপত্য অলংকরণে টেরাকোটার ব্যবহার খুব বেশী প্রচলিত ছিল না। অপর দিকে পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় স্থাপত্য অলংকরণের প্রধান মাধ্যম না হলেও নির্মাণ কৌশল ও নকশা সৃষ্টিতে পোড়ামাটির শিল্পের উৎকর্ষতা ছিল খুবই উচ্চ পর্যায়ের। এসময় ইরান ও মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত পোড়ামাটির ফলকসমূহ ক্ষুদ্রাকারে ও সুক্ষ্ম নকশায় উৎকীর্ণ করা হতো। গুণগত মানের দিক দিয়েও এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হতো। কিন্তু এই ধারার শিল্প সৃষ্টির জন্য যে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লোকবল দরকার তা না থাকায় স্থাপত্য নির্মাণ ও অলংকরণে তাদের স্থানীয় শিল্পীগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতে হয়েছে। স্থানীয় শিল্পীগণ মধ্য এশিয়া ও পারস্যে প্রচলিত ক্ষুদ্র ও সুক্ষ্ম চিত্রফলক সৃষ্টিতে পারদর্শী ছিলেন না যার কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম স্থাপত্যে (বরী মসজিদ) ব্যবহৃত পোড়ামাটির অলংকৃত ফলকগুলো ছিল অত্যন্ত সাদামাটা। স্থাপত্য সজ্জায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বিকশিত মুসলিম স্থাপত্য ধারার নকশাকৃত ইট ও এদের কৌশলী বিন্যাসে সৃষ্ট নকশার প্রয়োগ দেখা যায়। মুসলিম শাসনের প্রথম পর্যায়ে নির্মিত বরী মসজিদ (১৩০০ খ্রি.) ও আদিনা মসজিদের (১৩৬৯ খ্রি.) একটি উল্লেযোগ্য অলংকরণ বৈশিষ্ট্য হল মুসলিম-পূর্ব যুগে বাংলার স্থাপত্যে ব্যবহৃত পাথরের খোদাই অলংকরণের অনুকরণে পোড়ামাটির নকশা সৃষ্টি। বরী মসজিদে মিহরাব খিলানের স্তম্ভ এবং আদিনা মসজিদের (জ্যামিতিক নকশা বাদে) প্রায় সকল লতানো নকশা ও প্যাটার্নসমূহ পাথরের খোদাই নকশা থেকে নেয়া। এই সমস্ত পোড়ামাটির ফলকের নিপুণ খোদাই বৈশিষ্ট্য দেখে ধারণা করা যায় এগুলো তৎকালীন তক্ষণ শিল্পীদের দ্বারাই সৃষ্ট। আদিনা মসজিদে উদ্ভিজ্জ নকশার পাশাপাশি মুসলিম শিল্প ঐতিহ্যের জ্যামিতিক নকশার বেশ কিছু উপস্থাপন খিলান-পটহ ও বর্ডার অলংকরণে লক্ষ্য করা যায়। আদিনা মসজিদের পরে একলাখী সমাধি (পনের শতকের প্রথম দিকে নির্মিত) অলংকরণে প্রায় আদিনা মসজিদের অনুরূপ নকশার ব্যবহার দেখা যায় তবে জ্যামিতিক নকশা প্রায় অনুপস্থিত। ফলক অলংকরণে অতি প্রক্ষিপ্ত ও স্বল্পোন্নত এই দুই ধরনের নকশা সৃষ্টির মাধ্যমে অলংকরণের বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। স্বল্পোন্নত ভাবে উৎকীর্ণ ফলকগুলো বেশ সুক্ষ্ম। ধারণা করা যায় এই ভবনটির ফলক তক্ষণে স্থানীয় ও বহিরাগত উভয় শ্রেণির

শিল্পীগণ নিয়োজিত হয়ে ছিলেন। এই ধরনের সুক্ষ্ম অলংকরণ দরাসবাড়ি মসজিদের (১৪৭৯ খ্রি.) মিহরাব অলংকরণেও পরিলক্ষিত হয়। দরাস বাড়ি মসজিদের মিহরাব অলংকরণে প্রথম খিলান স্প্যানড্রিলে গুচ্ছ ফলকে সজ্জিত ফুল ও ফল সম্বলিত বৃক্ষ নকশা উপস্থাপিত হয়েছে। খিলান ফ্রেমের সুক্ষ্ম লতা নকশা নিঃসন্দেহে দক্ষ হাতের কাজ। ১৪৮০ খ্রি. নির্মিত তাঁতী পাড়া মসজিদে পোড়ামাটির ফলক অলংকরণে একটি সামঞ্জস্য ও একতা পরিলক্ষিত হয়। সবগুলো নকশা এখানে তীক্ষ্ণ ,সুক্ষ্ম, ফলক সমতল হতে কিছুটা উৎক্ষিপ্ত যেন ত্রিমাত্রিক আবহতে সৃষ্ট। নকশাগুলো দেখলে সহজে অনুমান করা যায় যে এগুলো একই ঘরানার শিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল। সম্ভবত এখানেই পোড়ামাটির অলংকরণের সার্থক উপস্থাপন খুজে পাওয়া যায়। এই ঘরানার শিল্পীগণ বেশ কিছু সময় রাজধানী গৌড়ের স্থাপত্য অলংকরণে নিয়াজিত ছিলেন। তবে রাজধানীর বাইরে দূরবর্তী শহরে পোড়ামাটির চিত্রফলকের এতো সার্থক উপস্থাপন আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না । পরবর্তীতে হোসেন শাহী শাসনামলে (১৪৯৩-১৫৩৮খ্রি.) তাঁতীপাড়া মসজিদে অর্জিত শিল্প নৈপূণ্যকে অতিক্রমকরা সম্ভব হয়নি। উপরুন্ত হোসেনশাহী সুলতানগণ টেরাকোটার বদলে পাথর ও রঙ্গিন মিনা করা টালির অলংকরণের দিকে ঝুঁকে পড়লে মুসলিম স্থাপত্যে পোড়ামাটির চিত্রফলক কিছুটা অবহেলিত শিল্পে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত মুঘল আগ্রাসনের কবলে মুসলিম স্থাপত্য থেকে তা বিলুপ্ত হয়।

অপরদিকে পনের শতকের মাঝামাঝি ১৪৬১ সাল হতে (বরাকর রেখা দেউল, বর্ধমান) পুনরায় মন্দির স্থাপত্য নির্মাণের উদাহরণ পাওয়া যায়। তবে ষোল শতকের পূর্বে নির্মিত কোন মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকের আদি নিদর্শন টিকে নাই। ষোল শতকের মন্দিরগুলো মুসলিম ধারার অলংকরণ বৈশিষ্ট্যে (প্রাণীবাচক মোটিফ বিহীন উদ্ভিজ্জ ও বিমূর্ত ধারার নকশা উপস্থাপন) বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। এ সময় নির্মিত মন্দিরসমূহ যেমন-গোকর্ণ এর নরসিংহ মন্দির (১৫৮০ খ্রি.), বাগেরহাটের কোদলা মঠ , বৈদ্যপুরের কৃষ্ণমন্দির (১৫৯৮ খ্রি.) ইত্যাদি মন্দিরে খুবই স্বল্প মাত্রায় প্রাণীবাচক উপস্থাপন দেখা যায়। অধিকাংশ নকশাই তৎকালীন মুসলিম স্থাপত্য থেকে গৃহীত। সতের শতকের প্রথম দিকেও এই ধরণের নকশার প্রচলন ছিল। গুপ্তিপাড়ার চৈতন্যদেব জোড়বাংলা মন্দির (১৬০৬-১২ খ্রি.) কোন রকম প্রাণীবাচক মোটিফের উপস্থাপন ব্যাতিরেকে শুধুমাত্র উদ্ভিজ্জ ও বিমূর্ত নকশা প্রয়োগে অলংকৃত হতে দেখা যায়। মন্দির অলংকরণ চরিত্রের পরিবর্তনের সূচনা হয় এই শতক থেকেই । তিন-খিলান প্রবেশপথ বা স্থাপত্যের সম্মুখভাগ জুড়ে অলংকরণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার পনের-ষোল শতক হতেই মুসলিম স্থাপত্যে পরিলক্ষিত হয়। ষোল-সতের শতকে মন্দির ও মসজিদ স্থাপত্যে একই ধরনের ফাসাদ অলংকরণের প্রচলন ছিল। অলংকরণ পার্থক্য প্রকট হয় মন্দির স্থাপত্যে প্রাণীবাচক রিলিফ ভাস্কর্যের অতিরিক্ত ব্যবহার প্রবণতায়। এক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের মন্দিরসমূহ দিক নির্দিশকের ভূমিকা পালন করেছিল। সতের শতকে

বিষ্ণুপুর চিত্রকলার উন্মেষ সম্ভবত পোড়ামাটির চিত্রফলক নির্মাণ শিল্পীদের উৎসাহিত করেছিল। চৈতন্যে আন্দোলনের প্রভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বৈষ্ণববাদের জনপ্রিয়তা বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে জোয়ার আনে চিত্রকলার প্রসার ছিল এর অন্যতম কারণ। পনের শতক থেকে বিষ্ণুপুরে পাটা চিত্র অঙ্কণের নিদর্শন পাওয়া যায়। ষোল শতকের শেষভাগ হতে সতের শতকে সূচনা লগ্নের মধ্যে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে এ অঞ্চলের সাথে উত্তর ভারতের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, যার ফলশ্রুতিতে বিষ্ণুপুর চিত্রকলার সাথে সাথে স্থাপত্যে ব্যবহৃত চিত্র ফলকগুলোতেও রাজপুত ও মুঘল চিত্রকলার প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে। এর উদাহরণ বিষ্ণুপুরের শ্যাম-রায় মন্দির (পঞ্চরত্ন, ১৬৪৩ খ্রি.) ও কেষ্ট-রায় মন্দির (জোড়বাংলা, ১৬৫৫খ্রি.) এর পারসিক মহাকাব্য 'শাহনামার' চরিত্র উপস্থাপনে পাওয়া যায়। এছাড়া মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য যেমন-শিকার দৃশ্য, রাজকীয় শোভাযাত্রা ইত্যাদিও মন্দিরের ভিত্তি অলংকরণের জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়। তবে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ অলংকরণে লোকচিত্র (পাটা চিত্র ও পট চিত্র) কলার প্রভাব সুস্পষ্ট। মন্দিরের মহাকাব্যিক দৃশ্যগুলো ভূমি সমতলে বিন্যাস্ত যা পাটা চিত্রে দেখা যায়। বিষ্ণুপুর জোড়বাংলা মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে অলংকরণের উল্লম্ব ও একটির পর একটি দৃশ্যের বিন্যাস পট চিত্রের দৃশ্য বিন্যাস কৌশলের অনুরূপ। পরবর্তীকালে আঠারো শতকের মন্দিরসমূহের মধ্যে কান্তজি মন্দিরে (১৭৫২ খ্রি.) পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলো সর্বোৎকৃষ্ট। এখানে উপস্থাপিত দৃশ্যগুলোতে চরিত্রসমূহের অভিব্যক্তি ও গতিশীলতা প্রায় বাস্তবধর্মী যেন পোড়ামাটিতে উৎকীর্ণ মুঘল চিত্রকলার অন্য সংস্করণ।

মুসলিম শাসনামলে স্থাপত্যে ব্যবহৃত পোড়ামাটির অলংকৃত ফলকসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলিম শাসনামলের প্রথম দিকে স্থানীয় ঐতিহ্য (বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ মোটিফযুক্ত পাড় নকশা) এবং পূর্ববর্তী মুসলিম স্থাপত্যে চর্চিত (জ্যামিতিক ও এ্যারাবেস্ক ধরণের বিস্তৃত লতা) নকশার সমন্বয়ে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যসমূহ সজ্জিত করা হয়েছে। স্থানীয় পাড় নকশাসমূহ বিভিন্ন ব্যান্ড ও প্যানেলের বর্ডার , কর্ণিশ ইত্যাদি স্থানে ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী ছিল । অপরদিকে জ্যামিতিক ও এ্যারাবেস্ক ধরণের লতা নকশা কোন বিস্তৃত উন্মুক্ত অংশ পূরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম ছিল । কিন্তু বাংলার পোড়ামাটির অলংকরণে পনের শতকের শেষের দিক থেকে জ্যামিতিক বা এ্যারাবেস্ক কোনটির অস্তিত্ব টিকে থাকেনি। পাড় নকশার দ্বারা দেয়াল জুড়ে অলংকরণ সৃষ্টি করতে গিয়ে স্থানীয় শিল্পীগণ যে কৌশলটি গ্রহণ করেছিলেন তা হল- সমগ্র দেয়ালকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোপে বিভক্ত করে, প্রতিটি খোপের অভ্যন্তরভাগ চওড়া পাড়ের বর্ডার দ্বারা আবদ্ধ করেছিলেন। এতে দেয়ালের ফাঁকা অংশ অনেকটা পূরণ হয়ে আসলে খোপের কেন্দ্রে একটি একক মোটিফ স্থাপন করে অলংকরণে পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছিল। শুধু

পাড় নকশা ব্যবহার করে দেয়াল জুড়ে অলংকরণ সৃষ্টির এই ধারা মুসলিম শাসনামলের পরেও বহুদিন পর্যন্ত মন্দির স্থাপত্য অলংকরণে চর্চিত হয়েছে।

এভাবে মুসলিম শাসনামলে স্থানীয় শিল্পীদের সৃষ্টিশীল মনোভাব বাংলার স্থাপত্য অলংকরণকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করে তোলে। লোকজ শিল্পের ছত্রছায়ায় মুসলিম শাসনামলে বিকশিত পোড়ামাটির অলংকরণসমূহ তাই পাথর, রঙ্গিন টালি বা মোজাইকের ন্যায় অভিজাত না হয়েও প্রধান শিল্প মাধ্যম হিসাবে বাংলার স্থাপত্যকে বিশিষ্টরূপে বিশ্ব স্থাপত্য ইতিহাসে জায়গা করে দিয়েছে।

পরিশিষ্ট-১: গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র

বৌদ্ধ প্রতীক নকশা সম্বলিত পোড়ামাটির চিত্র ফলক, আদিনা মসজিদ

জ্যামিতিক নকশা সম্বলিত পোড়ামাটির চিত্র ফলক, আদিনা মসজিদ

পাড় নকশা দ্বারা পূর্ণ খিলান পটহ, আদিনা মসজিদ

একই সারিতে উৎকীর্ণ উন্নত ও অবনত দেয়াল অংশে নকশার ভিন্নতা, একলাখী সমাধি

অলংকৃত খিলান প্যানেল, তাঁতীপাড়া মসজিদ

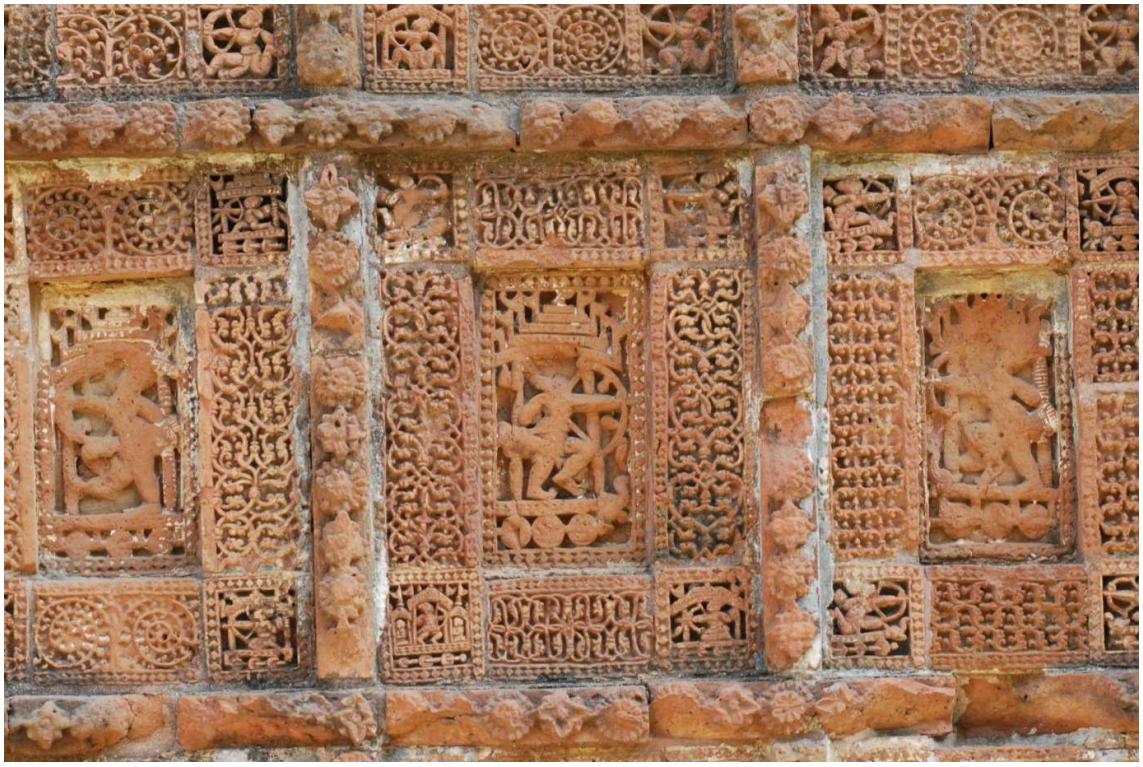

বহির্দেয়ালের প্যানেল নকশা, শ্যামরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর

বিভিন্ন মহাকাব্যের দৃশ্য অংকিত ফলক, মথুরাপুর দেউল

লঙ্কা যুদ্ধের দৃশ্য, রামায়ণ, বৈদ্যপুর কৃষ্ণমন্দির, বর্ধমান

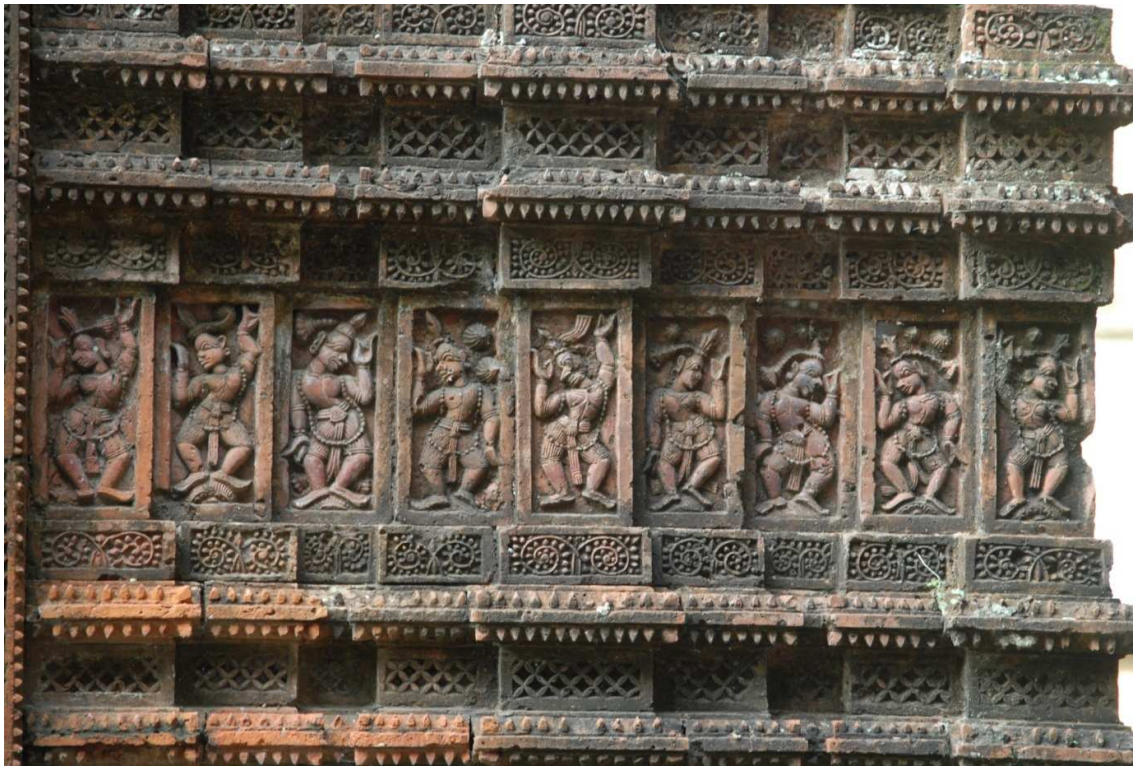

পার্শ্ব দেয়ালের প্যানেল নকশা, ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া

পরিশিষ্ট-২: শিলালিপি

শিলালিপি, বাঘা মসজিদ

শিলালিপি, বাবা আদম মসজিদ

শিলালিপি, কদম রসূল

শিলালিপি কেষ্টরায় মন্দির, বিষ্ণুপুর

শিলালিপি ছোট আহ্নিক মন্দির

পরিশিষ্ট -৩

স্থাপত্য পরিভাষা

অফসেট (off-set)	উন্নত দেয়ালাংশ
আইল (aisle)	দুই সারি স্তম্ভ দ্বারা পৃথককৃত স্থান পথ
আর্চ (arch)	খিলান
আকুয়েট (arcuate)	খিলান ভিত্তিক নির্মাণ
আমলক (*amlaka*)	মন্দির শীর্ষে ব্যবহৃত আমলকী ফলের ন্যায় চারদিকে খাঁজকাটা পাথরের বলয়
অ্যাবস্ট্রাক্ট (abstract)	বিমূর্ত
ইওয়ান (*iwan*)	পারস্যে প্রচলিত তিনদিক বন্ধ ও একদিক উন্মুক্ত নলাকৃতির খিলান ছাদ বিশিষ্ট কক্ষ
এ্যারাবেস্ক (arabesque)	আরব্য নকশা, আঙ্গুর লতার ফল-ফুলযুক্ত জটিল চলমান নকশা, কোন কোন সময় এর সাথে জ্যামিতিক নকশাও যুক্ত থাকে
এনগেজড কলাম (engaged column)	সংলগ্ন স্তম্ভ
এ্যাপেক্স (apex)	শীর্ষ বা চূঁড়া
‘কমলে কামিনী’ (*kamale kamini*)	চন্ডী উপাখ্যানের সাথে সম্পর্কিত দৃশ্য , এখানে দেবী চন্ডী পদ্মে উপবিষ্ট ও এক হাতে একটি ক্ষুদ্রাকার হস্তী ধরা অবস্থায় দৃশ্যমান, নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন রত
করবেল পদ্ধতি (corbel system)	ক্রমপূরণ পদ্ধতি
করবেলিং (corbelling)	ক্রমপূরণ
কলাম (column)	স্তম্ভ

কনভেক্স (convex)	উত্তল
কর্নিশ (cornice)	কার্নিশ
কার্ভিং(carving)	খোদাই কাজ
কিবলা (*qibla*)	যে মুখী হয়ে নামাজ আদায় করা হয় বা সিজদা দেওয়া হয় অর্থাৎ 'কাবা' মুখী
কলকা (kolka)	পারস্যে ও ভারতে প্রচলিত এক ধরনের পান পাতার ন্যায় প্যাঁচানো নকশা
ক্যাপিটাল (capital)	স্তম্ভ শীর্ষ
কলস (*kalasha*))	পানি রাখার মাটির পাত্র, এই আকৃতির পাত্র অনেক ক্ষেত্রেই মন্দির শীর্ষে ব্যবহার করা হয়
কিয়স্ক (kiosk)	ছত্রী, ভারতীয় স্থাপত্যে ব্যবহৃত চারটি স্তম্ভ সমর্থিত ক্ষুদ্র গম্বুজ
গর্ভগৃহ (*garbha-griha*))	মন্দিরের যে কক্ষে উপাস্য দেবতার মূর্তি স্থাপন করা হয়
গুলদাস্তা *(guldasta*)	এক ধরনের পারসিক নকশা, সরু স্তম্ভের শীর্ষে ফুলের গুচ্ছ সদৃশ্য নকশা, সাধারণত ক্ষুদ্র মিনার আকারে স্থাপত্যের চালে ব্যবহার করা হয়
গ্লেজডটাইলস (glazed tiles)	মিনা করা রঙ্গিন টালি
চৌচালা (*chau-chala*)	কুঁড়ে ঘরের চারদিকে ঢালু চালের ছাদ, বর্গাকার কক্ষের উপর নির্মিত এই ধরনের ছাদ প্রত্যেক দিক থেকে ত্রিভূজাকার দেখায়। সাধারণত বাঁশের কাঠামোর উপরে খড় বা টিনের তৈরী আচ্ছাদন

ছাজ্জা (*chajja*)	বাইরের দিকে প্রলম্বিত কার্নিশ,সাধারণত বৃষ্টির ছাট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ধরনের নির্মাণ করা হয়
জালি নকশা (*jali*)	ছিদ্রযুক্ত পাথর নির্মিত পর্দার ন্যায় নকশা
টেরাকোটা (terracotta)	পোড়ামাটির ফলক
টাওয়ার (tower)	বুরুজ
টানেল ভল্ট (tunnel-vault)	নলাকৃতির খিলানছাদ
টিমপেনাম (tympanam)	খিলান-পটহ
ট্রাবিয়েট (trabeate)	সর্দল, স্তম্ভ, কড়িকাঠ ইত্যাদি প্রয়োগে নির্মাণ
ড্যাডো (dado)	ইমারতের দেয়ালের নিম্নাংশ
ডোম (dome)	গম্বুজ, অর্ধবৃত্তাকার ছাদের খিলান ভিত্তি নির্মাণ
থ্রী-ডাইমেনশনালা (three dimensional)	ত্রিমাত্রীক
নবনারী কুঞ্জর (*nava-nari Kunjara*)	একটি বৈষ্ণব ভাস্কর্য, নয় জন গোপীর পরস্পর পরস্পরকে এমনভাবে ধারণ যাতে একটি হাতীর আকার পায়
প্যানেল (panel)	কোন সমতল ক্ষেত্রকে আয়তাকার বা বর্গাকার ক্ষেত্রে বিভাজন বিশেষ
প্রফাইল (profile)	পার্শ্বচিত্র
পেনডিনটিভ (pendentive)	বর্গাকার কাঠামোর উপর গম্বুজ ধরে রাখার জন্য নির্মিত ক্ষুদ্র ত্রিকোণাকার স্থাপত্যিক কাঠামো
পাইলন (pylon)	এক ধরনের প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য; উঁচু ও উর্ধ্বমুখে ক্রমসরুভাবে

	নির্মিত কাঠামো যা প্রবেশ-দ্বারের সামনে নির্মিত হত
প্যারাপেট(parapet)	ছাদ প্রাচীর
পিশতাক (*pishtaq*)	উঁচু আনুষ্ঠানিক তোরণ যা স্থাপত্যের সম্মুখে নির্মিত হয়ে এর বাকী অংশকে আড়াল করে দেয়
প্যাটার্ণ (pattern)	কারুকার্যের নকশা
ফ্লুটেড (fluted)	পলকাটা, গোলায়িত খাঁজ
ফাসাদ (facade)	ইমারতের সম্মুখভাগ
ফ্রিজ (frieze)	স্তম্ভ শীর্ষের উপরাংশ থেকে কার্নিশের মধ্যবর্তী দেয়ালাংশ
বাদশাহ-কা-তখ্ত (*Badshah-ka-takht*)	মসজিদেও অভ্যন্তরে শাসক বা অভিজাতদের নিরাপত্তার জন্য নির্মিত উঁচু মঞ্চ
বে (bay)	খিলান পথ
ব্যা-রিলিফ (bas- relief)	নতোন্নত শিল্প, পটভূমির মধ্যে প্রায় প্রথিত এমনভাবে গঠিত মূর্তি
মডেলিং (modelling)	গঠন করা
মোল্ডিং (moulding)	ছাঁচে নির্মভণ
মিহরাব (*mihrab*)	মসজিদের কিবলা প্রাচীরে কিবলা নির্দেশক স্থাপত্য প্রতীক
মিম্বর (*mimber*)	মসজিদে ব্যবহৃত বক্তৃতা মঞ্চ
মোটিফ (motif)	নকশার বিষয়বস্তু
মিনার (*minar*)	মসজিদের সংলগ্ন সরু উঁচু বুরূজ

মারলন (marlon)	স্থাপত্য নকশায় ব্যবহৃত পদ্ম পাপড়ির নকশা
রোজেট (rosette)	ফুলের চক্রাকার নকশা
রিওয়াক(*riwaq*)	কিবলার দিক ছাড়া মসজিদের অপর তিন দিক বেষ্টিত খিলান শ্রেনি যুক্ত বারান্দা
রিসেস (recess)	দেয়ালের অবনত অংশ
রীব (rib)	ছাদ বা খিলান ভিত্তিক নির্মাণে ব্যবহৃত উদ্গাত ব্যান্ড (অনেক ক্ষেত্রে অলংকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়)
লিনটেল (lintel)	সর্দল
শ্যাফট(shaft)	স্তম্ভ গাত্র
সফিট (soffit)	খিলান গর্ভ
সিমূর্গ (simurg)	পারসিক মহাকাব্য শাহনামায় বর্ণিত একটি পৌরাণিক পাখি
স্কুইঞ্চ (squinch)	গম্বুজ নিমার্ণের জন্য বর্গাকার কক্ষের চার কোণে নির্মিত ক্ষুদ্র খিলান ভিত্তিক স্থাপত্য কাঠামো
স্কুইঞ্চ নেট (squinch net)	খিলান জাল
স্টাকো (stucco)	পঙ্কের কাজ
স্প্যানড্রিল (spandrel)	খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি

পরিশিষ্ট-৪

বিভিন্ন প্রতীকসমূহ

চক্র (*cakr*)	ভারতীয় শিল্পে সূর্য্যের প্রতীক যা বিষ্ণুর অস্ত্রের প্রতিভূ
কলস (*kalasa* motif)	পূর্ন কলস নকশা, যা থেকে উদ্ভিজ উত্থিত। এটি জীবন ও প্রাচুর্যের প্রতীক,অমৃতকলস
কীর্তি মুখ (*kirtimukh*)	ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি বিষয় যা সিংহের মুখোশ সম্বলিত, এটি মূলত: রাহুর মুখ। রাহুর মাতা সিংহিকা, তাই রাজ সৈংহিকেয়। মুখটি সিংহ সদৃশ, চোয়ালের নিচের অংশ নেই।
লোটাস (lotus)	পদ্ম, বৌদ্ধ ধর্মে আলোকিত হৃদয়ের প্রতীক; হিন্দু ধর্মে পরমতত্ত্বের প্রতীক
ব্যাল (vyala)	বিড়াল, শ্বাপদ হিংস্র জন্তু, শক্তির প্রতীক
দ্যা এন্ডলেস নট (the endless knot)	বৌদ্ধ ধর্মীয় অষ্ট মঙ্গল প্রতীকের একটি, এটি বুদ্ধের অন্তহীন প্রজ্ঞার প্রতীক আবার পৃথিবীর সকল কর্ম একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এরও প্রতীকী প্রকাশ এই প্রান্ত বিহীন ফিতার বুনোট নকশা
আমলক (*amlaka*)	আমলকীর ন্যায় শিরা যুক্ত পাথরে বলয় যা মন্দির শীর্ষে স্থাপন করা হয়, এটি প্রতীকীভাবে গর্ভগৃহের বিগ্রহ প্রতীকের মহিমা ও বিভা চারিদিকের ছড়িয়ে দেয়
উলম্ফমান সিংহ:	শক্তির প্রতীক।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

Shaikh Abul Fazl, *Akbarnama*, H. Beveridge. (trans.), 3 vols., Delhi, M.S. Kumar, 1973(reprint)

Shaikh Abul Fazl, *Ain-i-Akbari*, Blockmann H. (trans.), Vol. I, Calcutta: Asiatic Society, 1873

Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybi*, M.I. Borah, (trans.), 2 vols. Gauhati, Assam: Government of Assam, 1936

Ferishtah, *Tarikh-i- Firishtah*, John Briggs (trans.), vol. 1-4, Calcutta:1908-10

Imam-al-Din, S.M. (ed.), *Tarikh-i-Khan jahani wa Makhzani-i-Afghani*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan,1960

Abu Umar Minhaj Uddin Uthman bin Siraj uddin al-Juzjani, *Tabaqat-i-Nasiri*, H. G. Raverty (trans), 2 vols. , New Delhi: Oriental Book. 1970 (reprint)

Ghulam Husain Salim, *Riyazu-s-Salatin*, Abdus Salam (trans), Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delhi, 1975(reprint)

Salim Allah, *Tarikh-i-Bangala*, S. M. Imamuddin (ed.), Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1979

সাহিত্যঃ কাব্য ও ধর্মীয় গ্রন্থ সূত্র

Brindavandas, *Sricaitanya Bhagavat*, Mrinal Kanti Ghosh (ed.), Calcutta: 440 Gauranga era

Candidas, *Srikrisna Kirtan*, Basanta Ranjan Roy (ed.), Calcutta: Vangiya Sahitya Parisat, 1943

Jaya Deva, *Gita-Govinda*, William Joens. (trans.), London:1807

Krttivasa Ojha, *Ramayana*, H. Mukharji (ed.), Calcutta: 1957

Vijaya Gupta, *Manasa-mangala*, Basanta Kumar Bhattacharya (ed.), Barisal: Vani Niketan.

ইংরেজী গ্রন্থ

Ahmed, Abu Sayeed M., *Choto Sona Mosque at Gour: an example of the early Islamic Architecture of Bengal*, Germany: Karlsruhe, 1997

---------- *Mosque Architecture in Bangladesh*, Dhaka: UNESCO, 2006

Ahmed, Babu & Nazly Chowdhury, *Documentation on Terracotta Temples of Bangladesh*, Najma Khan Majlis (ed.), Dhaka Traditional Photo Gallery, 2013

Ahmed, Nazimuddin, *Epic Stories in Terracotta Depicted on Kantanagar Temple Bangladesh*, Dhaka: University Press Limited, 1990

---------- *Mahasthan*, Dhaka: Departmant of Archaeology and Museums, 1975

Ahmed, Sharifuddin (ed.), *Sylhet: History and Heritage*, Dhaka: Bangladesh Itihas Samiti, 1999

---------- *Dhaka: Past, Present, Future*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1991

Akhtaruzzaman, Md., *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2009

Alam, A. K. M. Shamsul, *Sculptural Art of Bangladesh: Pre-Muslim Period*, Dhaka: Department of Archaeology and Museums, 1985

Arnold, T. W., *Painting in Islam*, New York: Dover Publications, 1965

Arnold, T. W. and Guillaume, A, *The Legacy of Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1931

Asher, C. B., *Architecture of Mughal India*, London: Cambridge University Press, 1992

Ashfaque, S. M., *Lalbagh Fort : Monuments and Museum*, Karachi:Ministry of Education,1970

Aslanapa, Oktay, *Turkish Art and Architecture*, London : Faber and Faber Limited, 1971

Aulad Hasan, S., *Notes on Antiquities of Dacca*, Calcutta: M. M. Bysak. 1904

Ayatollahi,Habibollah, *The Book of Iran: The History of Iranian Art*, Shermin Haghshenas (trans.), Tehran: Center for International Cultural Studies, 2002

Banerji, Naseem Ahmed, *The Architecture of the Adina Mosque in Pandua, India Medieval Tradition and Innovation*, Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2002

Bari, Muhammad. Abdul Mughal Mosque Type in Bangladesh Origins and Development, Unpublished thesis, Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, 1989

Bhattacharya, A. K., *A Corpus of Dedicatory Inscription from Temples of West Bengal (c. 1500 AD to c 1800 AD)*, Calcutta: 1982

Bhattacharya, Gouriswar, *Essay on Buddhist, Hindu, Jain Iconography*, Dhaka: International Centre for Study of Bengal Art, 2000

Bhattasali, N. K., *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum.* Dacca: Dacca Museum Committee, 1929

Dhaka University Institutional Repository

Biswas, Sachin S., *Terracotta Art of Bengal,* Delhi: Agam Kala Prakashan, 1981

Blochmann, H., *Contributions to History and Geography of Bengal,* Calcutta: Asiatic Society, (The book is the compilation of the author's articles in *JASB),*1968.

Briggs, Martin S, *Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine,* Oxford: The Clarendon Press, 1924

Brown, Percy, *Indian Architecture (Buddhist and Hindu Period),* Bombay, D.B. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd, 1959.

---------- *Indian Architecture (Islamic Period),* D. B.Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd. 1968

Burckhardt, Titus, *Art in Islam*: *Language and Meaning,* Translated by J. Peter Holson, England: World of Islam Festival Trust, 1976

Burgess, J, *Muhammadan Architecture in Gujarat,* London: Griggs, *(ASI* vol. VI), 1896

---------- *Muhammadan Architecture of Ahmedabad,* London: Kegan Paul, (*Archaeological Survey of Western India,* vols. VII & VIII), 1904-05

Chandra, Rai Govind, *Studies of Indus Valley Terracottas,* Varanasi: Bharatiya Publishing House, 1973

C.French, J., *The Art of the Pala Empire in Bengal,* London: H. Milfoid, 1925

Central Asia, Gems of 9th Century Architecture, Moscow: Planeta Publisher, 1987

Coomaraswamy, Ananda K., *History of Indian and Indonesian Art,* New York: Dover Publications, Inc., 1965

---------- *Introduction to Indian Art,* Delhi: Munshiram Monoharlal, 1969

Creighton, H., *Ruins of Gaur,* London, Black: Parbury and Allan, 1817

Creswell, K. A. C., *Early Muslim Architecture.* Vol. I, Oxford: The Clarendon Press, 1932-40. (Second edition into two parts-Part I and Part II. Oxford: The Clarendon Press), 1969

---------- *Early Muslim Architecture,* Vol. II, Oxford: The Clarendon Press,1940

---------- *The Muslim Architecture of Egypt,* Vol. I, Oxford: The Clarendon Press, 1952.

---------- *A Short Account of Early Muslim Architecture,* Harmondsworth: Penguin Books, 1958

---------- *A Bibliography of the Architecture, Arts and Crafts of Islam,* Cairo: The American University at Cairo Press, 1961

Critchlow, Keith, *Islamic Patterns,* London: Thames and Hudson.,1976.

Dhaka University Institutional Repository

Dani. A. H., *Muslim Architecture in Bengal,* Dacca: The Asiatic Society of Pakistan, 1961

---------- *Dacca: A Record of Its Changing Fortunes,* 2nd edition, Dacca: Mrs. Safiya S. Dani, 1962

Dasgupta, Charu Chandra, *Origin and Evolution of Indian Clay Sculptur,* Calcutta: University of Calcutta, 1961

Dasgupta, J. N., *Bengal in the 16th Century*, Calcutta: University of Calcutta, 1914.

Datta, Bimal Kumar, *Bengal Temple*,New Delhi: Munshiram Monoharlal,1975

Dey, Mukul, *Birbhum Terracotta*,New Delhi: Lalit Kala Akademi,1959

Dhamija, Jasleen., *Living Traditions of Iran's Craft*, New Delhi: Vikas Publications, 1979

Dhamija, Ram., *Image India : Heritage of Indian Arti and Crafts*, Delhi: Vikas Publications,1971

Dimand, M., *A Handbook of Muhammadan Art,* New York: The Metropolitan Museum of Art, 1958

Ettighausen, Richard & Oleg Grabar, *The Art and Architecture of Islam 650-1250,* Harmondsworth: Penguin Books, 1987

Ettinghausen, R., *Arab Painting*. Cleveland, Ohio: The World Publishing Company, 1962.

Eaton, Richard M., *The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760,* Delhi: Oxford University Press, 1994

Fergusson, James, *History of Indian and Eastern Architecture,*vol. I, New Delhi: Munshiram Monoharlal, (First published in 1876, Revised, by James Burgess and R. Phene Spiers), 1972.

Fletcher, Sir Banister., *A History of Architecture on the Comparative Methods,* 17th ed. London: University of London, I961

Fyre, R. N, (ed.), *The Cambridge History of Iran,* Vol. IV. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.

Giazier,Richard, *A Manual of Historic Ornament*, New York: Dover Publications, 1948

Godard, Andre, *The Art of Iran,* Translated by Michael Haron, London: George Alien and Unwin Ltd., 1965

Goodwin, Godfray, *A History of Ottoman Architecture,* London: Thames and Hudson, 1971

Goswami, A., (ed.), *Indian Terracotta Art,*Text by O. C. Ganguly, Calcutta: Rupa and Co. ,1959

Grabar, Oleg, *The Formation of Islamic Art.* New Haven and London : Yale University Press,1973

Grunebaum, Gustave E.Von. (ed.), *Unity and Variety in Muslim Civilization,* Chicago and London: University of Chicago Press, 1955

---------- *Medieval Islam : A Study in Cultural Orientation,* 2nd edition

Chicago: University of Chicago Press, 1954

Haque, Enamul, *Chandraketugarh: ATreasure House of Bengal Terracottas*, Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art (ICSBA), 2001

---------- *The Art Heritage of Bangladesh*, Dhaka: ICSBA, 2007

Haque, Saif Ul and others (ed.), *Pundranagar to Sherebanglanagar: Architecture in Bangladesh*, Dhaka: Chatana Sthapatya Unnoyon Society, 1997

Haque, Zulekha, *Terracotta Decoration of Late Mediaeval Bengal: Portrayal of a Society*, Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1980

---------- *Terracottas of Bengal: An Analitical Study*, Dhaka: International Centre for Study of Bengal Art, 2014

Hasan, Perween, *Sultans and Mosques: The Early Muslim Architecture of Bangladesh*, New York: I.B. Tauris, 2008

Hasan, Syed Mahmudul, *Mosque Architecture In Pre-Mughal Bengal*, 2nd rev. edition, Dacca: University Press Limited, 1972

Hasan, S.M., *Muslim Monuments of Bangladesh*, 2nd edition, Dacca: Islamic Foundation of Bangladesh, 1980

Havel. E. B, *The Art Heritage of India*, Bombay: D. B. Taraporevala Sons & Co., Pvt. Ltd., 1973

---------- *Indian Architecture: Its Psychology, Structure and History from the First Muhammadan invasion to the Present Day*, Reprint, New Delhi: S. Chand, 1973

Hedges, William, *The Dairy of William Hedges*, edited by R. Barlow and H. Yule, London: Hakluyt Society, 1887

Hetterington, P. B., *Mosaics*, London, Paul Hamlyn Ltd., 1967

Hill, Derek and Grabar, Oleg, *Islamic Architecture and Its Decoration*, London: Faber and Faber Ltd., 1967

Hill. Derek and Colvin, L., *Islamic Architecture in North Africa.* London: Faber and Faber Ltd., 1976

Hitti, P. K. *History of the Arabs*,10th rev. ed. London: Macmillan and Co, 1970

Husain, A. B. M., *Fathpur Sikri and Its Architecture*, Dacca: Bureau of National Reconstruction, 1970

Hoque, M.M. & Seema Hoque, *Kantajee Temple An Outstanding Monument of Late Medieval Bengal*, Dhaka,UNESCO, 2005, p.58

Husain, Shahanara, *Everyday-Life in the Pala Empire,* Dacca: Asiatic Society of Pakistan,1968

Islam, Sirajul (ed.), *History of Bangladesh 1704-1971*, 3 vols. 2nd edition, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997

Imam Abu, *Excavations at Mainamoti an Exploratory Study*, Dhaka: ICSBA, 2000

Imamuddin, Abu H. (ed.), *Architectural Conservation Bangladesh*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1993

Jairazbhoy, R. A., *An outline of Islamic Architecture,* New York: Asia Publishing House, 1972

Kabir, Humayun, *The Indian Heritage,* Bombay: Asia Publishing House, 1955

Karim, Abdul, *Social History of the Muslims in Bengal*, 2nd. Rev. edition, Chittagong: Baitush Sharaf Islamic Research Institute, 1985

---------- *Corpus of the Muslim Coins of Bengal,* Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961

---------- *Murshid Quli Khan and His Times,* Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1963

---------- *Dacca: The Mughal Capital,* Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1964

---------- *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh 1992.

---------- *History of Bengal : Mughal Period*, Vol-1 & 2, Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies1992 & 1995

Khan, Abid Ali, *Memoirs of Gaur and Pandua.* Edited and revised by H. E Stapleton. Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot., 1930

Khan, F. A., *Architecture and Art Treasures of Pakistan,* Karachi: Elite Publishers Ltd., 1963

---------- *Mainamati,* K arachi: Department of Archaeology, 1969

Khan, Hafizullah, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1988

Khatibi, A. Kebir and Sijelmassi, M., *The Splendour of Islamic Calligraphy*, Translated by James Hughes, London : Thames and Hudson, 1976

Kramrisch, Stella, *Indian Sculpture,* London: Y. M. C. A. Publishing House, 1933

---------- *The Art of India,* 3rd. ed, London: Phaidon Press Ltd., 1965

---------- *The Hindu Temple,* vols.I & II, Reprint, Motilal1Banarsidass (First published in 1946 by the University of Calcutta.), 1980

Kuhnel, E., *Islamic Art and Architecture,* Katherine Watson, *(*trans.), London: G. Bell and Sons, 1966

Lalgutpa, Parameswari, *Gangetic Valley Terracotta Art*, Varanasi: Pri-thivi Prakashan, 1972

Lanepoole, S., *Art of the Saracens in Egypt*, London: Chapman and Hall, 1888

Lerner, Robert E. and others, *Western Civilizations*, vol.-1, New York: W.W. Norton & Company, 1993

Mackay, E. J. H., *Further Excavations at Mohenjo-daro,* New Delhi: Government of India Press, 1938

---------- *Early Indus Civilization,* New Delhi: Indological Book Corporation, 1976

Majumdar, N.G., *Inscriptions of Bengal,* vol. III, Rajshahi: The Varendra Research Society, 1929

Majumdar, R.C. (ed.), *History of Bengal, Hindu Period*, vol. I, Dacca: University of Dacca, 1948

Majumdar, R. C, *History of Ancient Bengal*, Calcutta: G. Bharadwaj,1974

Majumdar, S. C., *Rivers of the Bengal* Delta, Calcutta: University Press, 1942

Mayer, L. A., *Islamic Wood Carvers and Their Works*, Geneva: Albeit Kundig, 1958

Mayer, Ralph, *Dictionary of Art Terms and Techniques,* London: Adam Charles Black, 1969

McCutchion, David J., *Late Mediaeval Temples of Bengal*, Calcutta: The Asiatic Society, 1972

Michell, George(ed.), *Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning*, London: Thames and Hudson, 1978

---------- *Brick Temples of Bengal,* Princeton: Princeton University Press, 1984

---------- *The Islamic Heritage of Bengal*, Paris: UNESCO, 1983

Mitchiner, Michael. *The World of Islam*, London: Howkins Publications, 1977

Moortgat, Anton, *Art of Ancient Mesopotamia*, London: Phaidon Press,1969

Morrison, Barrie M., *Lalmai: A Cultural Center of Early Bengal,* Seattle and London: University of Washington Press, 1974

Nath, R., *Colour Decoration in Mughal Architecture,* Bombay: D. B. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd., 1970

---------- *History of Decorative Art in Mughal Architecture,* Delhi:, Motilal Banarsidass, 1976

---------- *History of Sultanate Architecture,* New Delhi: Abhianv Publication, 1978

Pal, Protapaditya and Enamul Haque (ed.), *Bengal Sites and Sights,* Mumbai:Marg Publication, 2003

Papadopoulo, Alexandre, *Islam and Muslim Art,* Robert Erich Wolf (trans.), London: Thames and

Dhaka University Institutional Repository

Hudson, 1980

Pichard, Pierre, *Inventory of the Monuments at Pagan*, in seven vols., Paris: UNESCO,1999

Pope, A. U., *An Introduction to Persian Art Since the Seventh 'Century A.D.,* London: Peter Daviei, 1930

---------- *Persian Architecture: The Triumph of Form and Color,* New York: George Braziller, 1965

Pope, A. U. (ed.), *A Survey of Persian Art from Pre-historic Times to the Present,* vol. II. London: Oxford University Press, 1939.

Rahim, Muhammad Abdur, *Social and Cultural History of Bengal,* vol. I, Karachi: Pakistan Historical Society, 1963

Rajput, A. B., *Architecture of Pakistan,* Karachi: Pakistan Publications, 1963

Rapson, E.J. (ed.), *Cambridge History of India,* vol. I, (reprint.), Delhi: S. Chand & Co., 1962

Rashid, H., *Geography of Bangladesh,* Dacca: University Press Ltd., 1977

Raychoudhury, Tapan, *Bengal Under Akbar and Jahangir,* Calcutta: A. Mukherjee and Co Ltd., 1953

Ray, Nihar Ranjan, *Maurya and Post-Maurya Art,* Delhi: Indian Council of Historical Research,1975

Ravenshow, John Henry, *Gaur Its Ruins and Inscriptions*, London: 1878

Rice, D. T., *Islamic Art,* London: Thames and Hudson. 1965

Saraswati, S. K., *A Survey of Indian Sculpture,* Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1957

---------- *Early Sculptures of Bengal,* Calcutta: Sambodbi Publications Pvt. Limited., 1962

---------- *Architecture of Bengal,* Calcutta: G. Bharadwaj & Co., 1976

Sarkar, Sir J. N. (ed.), *History of Bengal,* Vol. II, Dacca: University of Dacca, 1948

Sen, D. C, *History of Bengali Language and Literature,* Calcutta: Calcutta University, 1911

Smith, Edward Lucie, *The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms*, London: Thames and Hudson, 1984

Taifoor, Syed Muhammad, *Glimpses of Old Dacca,* 2nd edition, Dacca: S.M. Perwez., 1956

Tarafdar, M. R., *Husain Shahi Bengal,* Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1965.

Vogel, J. Ph., *Tile Mosaics of the Lahore Fort.* Calcutta, Government Printing, *(ASI* New Imperial Series Vol. XLI).

Wheeler, R. E. M., *Five Thousand Years of Pakistan*, London: Royal India and Pakistan Society, 1950

Wilber, D. N., *The Architecture of Islamic Iran: The Il-Khanid*, Princeton: University Press, 1955

Wilson, Ralph P., *Islamic Art*, London: Earnest Benn, 1957

Zimmer, H., *The Art of Indian Asia: Its Mythology and Transformations*, vols. I & II. New York: Pantheon Books. 1955

বাংলা গ্রন্থ

আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ঢাকা: চিশতিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯০ (২য় সংস্করণ)

আহমেদ, নাজিমুদ্দীন, *পূর্ব পাকিস্তানী স্থাপত্য*, ঢাকা: পাকিস্তান সরকার, ১৯৬৫,

---------- *মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুর*, ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

আলম,মোঃ রফিকুল, *বিশ্বের মৃৎশিল্প*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪

ইসলাম, সিরাজুর (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খন্ড- ৭, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০০

করিম, আব্দুল, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭

করিম, আব্দুল. , *বাংলার ইতিহাস (মুঘল আমল)*, রাজশাহী: ইস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ ,১৯৯২

ঘোষ, নীহার, *বাংলার মন্দির শিল্পশৈলী (আন্ত মধ্যযুগ)*, কলকাতা, অমর ভারতী, ২০১২

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত, *গৌড়ের ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খন্ড, মালদা: এম. আবিদ আলী খান , ১৯০৯

সাঁতরা,তারাপদ, *পশ্চিম বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ*, কলকাতা: পশ্চিম বাংলা একাদেমী, ২০১৪

বেগম, আয়শা, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২

বন্দোপাধ্যায়, অমিয় কুমার, *বাঁকুড়ার মন্দির*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৭১ বাং সন

বন্দোপাধ্যায়, রাখাল দাস, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, খন্ড ১ ও ২, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং (দে'জ সংস্করণ), ১৯৮৭

বসু, সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পা.), *চৈতন্যভগবত*, কলিকাতা: ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

বসু, হিরেন্দ্রনাথ, *পর্সেলিন*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬১ বাং সন.

বসু, রাজ শেখর, *ভারতের খনিজ*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৮ বাং সন

বসু, শ্রীলা ও অভ্রবসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড,২০১৫

ভূঁইয়া, মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প*, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০০৩

ভট্টাচার্য, অশোক, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৪

ভট্টাচার্য,শম্ভু, *পশ্চিমবঙ্গের মন্দির*, কলকাতা: মনন প্রকাশন, ২০০৯

মজুমদার, আর. সি., *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড , ৬ষ্ঠ সংস্করন, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার এন্ড পাবলিশারস, ১৯৭৪

---------- ১৩৮১ বাং সন .২য় খন্ড , (২য় সংস্করণ), কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার এন্ড পাবলিশারস, ১৩৮০বাং সন

---------- ১৯৭৫. ৩য় খন্ড , ২য় সংস্করন, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার এন্ড পাবলিশারস, , ৪র্থ খন্ড , ১ম সংস্করন, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার এন্ড পাবলিশারস।

মন্ডল, সুশীলা, *বাংলাদেশের ইতিহাস : মধ্য যুগ: প্রথম পর্ব*, কলকাতা: প্রকাশ মন্দিরর প্রা.লি., ১৯৬৩

মিত্র, এস. সি., যশোর- খুলনার ইতিহাস, কলকাতা: দাসগুপ্ত এন্ড কোঃ লিঃ, ১৯৬৩

মুখোপাধ্যায়, অসীম, *চব্বিশ পরগনার মন্দির*, কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন ।

মুখোপাধ্যায়, সুখোময়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর*, কলকাতা: ভারতীয় বুক স্টল, (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ১৯৯৮

সলীম, গোলাম হোসেন, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পা.), ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৭

সেন, এস. কে., *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, কলকাতা: ১৯৬৫

হোসেন, এ.বি. এম., *আরব স্থাপত্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী , ১৯৭৯

হোসেন, এ.বি.এম. (সম্পা.), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২ স্থাপত্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

রহমান, কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর, *রাজশাহীর জমিদারদের প্রাসাদ-স্থাপত্য*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯

---------- পুঠিয়ার রাজবংশ: ইতিহাস ও স্থাপত্যকর্ম, অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী: ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ,১৯৯৬

রহিম, মুহম্মদ আবদুর, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩- ১৫৭৬)*, ১ম ও ২য় খন্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনুদিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

রায়, অসীম কুমার, *বঙ্গ বৃত্তান্ত*, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৮

রায়, নীহারঞ্জণ, *বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, কলকাতা: বুক ইম্পোরিয়াম, ১৩৫৬ বাং সন

রায়, প্রণব, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, কলকাতা: পুস্তক বিপণি,২০০৪ (দ্বিতীয় প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯), পৃ.১৬২

যাকারিয়া, আ.কা.ম., *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪

প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন / গেজেটিয়ারস/ এনসাইক্লোপিডিয়া

.

Annual Report, Pakistan Archaeology. Vols. I (1964) – V, Karachi: Department of Archaeology, (1968).

Archaeological Survey of India Reports. Vols. I - XXIII (1864-1884), Calcutta and Simla: Superintendent of Government Printing.

Miah, Md. Abul Hashem, *Archaeological Survey Report of Greater Faridpur District*, Dhaka: Department of Archaeology, GOB, 2000.

Musa, Md. Abu, *Archaeological Survey Report- Munshiganj District*, Dhaka: Department of Archaeology, GOB, 2000

Dhaka University Institutional Repository

Ali, Mohmmad and Swapan Bikash Bhattacharjee, *Archaeological Survey Report of Bogra District*, Dhaka: Directorate of Archaeology and Museum, 1986

Bangladesh Archaeology, No. 1, (ed.) Nazimuddin Ahmed, Dacca: The Department of Archaeology and Museum, 1979

Cunningham, Alexander, (reprint, first published in 1882). *Archaeological Survey of India Report of Bihar and Bengal in 1879-80 from Patna to Sunargaon*, Vol. XV, Delhi: Rahul Publishing House, 1994

List of Ancient Monuments in Bengal, Revised and corrected upto 31st August, 1895, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1896

Goswami, K, G., *Excavations at Bangarh,* Calcutta: University of Calcutta, 1948

Hossain, Md. Mosharraf and others, *Archaeological Survey Report of Greater Dinajpur District*, Dhaka, Department of Archaeology, GOB, 1995

Khalekuzzaman, Md., *Brihattara Pabna Jelar Pratnatattik Jarip Pratibedan* [Archaeological Survey Report of Greater Pabna District], Dhaka: Directorate of Archaeology, GOB, 1997.

Khan, F. A., *Recent Archaeological Discoveries in Pakistan : Mainamatl.* Karachi, Pakistan Publications, n.d.

---------- *Further Excavations in East Pakistan : Mainamati,* Karachi, Pakistan Publications, n.d.

---------- *Second Phase of Archaeological Excavations in East Pakistan : Mainamati,* Dacca: Public Relations Department, Government of East Pakistan, n. d

Memoirs of Archaeological Survey of India:

No. 15: *Drawings of Geometric Patterns in Saracenic Art*

No. 22: *Historical Memoir on the Qutb, Delhi*

No. 41: *Survival of Pre-histone Civilization of the Indus Valley*

No. 51: *Animal Remains from Harappa*

No. 55: *Excavations at Paharpur, Bengal*

Monographs of the Varendra Research Society:

No. II : *Mahasthan and Its Environs*

No. Ill : *The Antiquities of Khari and other Papers* (Appendix to Annual Report for 1928-29)

No. V : *The Antiquities of Sundarbans and other Papers*

No. VII: *The Ancient Monuments of Varendra* (North Bengla).

Alien, B.C., *Eastern Bengal District Gazetteers,* Dacca: Allahabad,1912

Beveridge, H., *The District of Bakarganj : Its History and Statistics.* London: 1876 (Reprint. Barisal). 1970.

Buchanan, Francis H.,*Geographical, Statistical and Historical Description of the District or Zila of Dinajpur,* Calcutta: 1833

Hunter, W, W., *Statistical Account of Bengal,* Vol. I (District of 24-Parganas and Sundarban), London,1875

---------- Vol. II (*Districts of Nudiya and Jessore*), London, 1877

---------- Vol. V(*Districts of Dacca, Bakarganj, Faridpur, and Maimansinh*), London, 1875

---------- Vol. VII *(Districts of Maldah, Rangpur and Dinajpur*), London, 1876

---------- Vol. IX (*Districts of Mur-shidabad and Pabna),* London,1876

Hunter, W. W. (ed.). *The Imperial Gazetteer of India.* Vol. I-XIII.

Islam, Sirajul (ed.), *Banglapedia, Natioal Encyclopedia of Bangladesh,* Vol. 1-10, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997

Jack, J. C., *Bengal District Gazetteers : Bakarganj,* Calcutta, 1918

Lambourn, G. E, *Bengal District Gazetteers – Maldah,* Calcutta, 1918

O'Malley: L. S. S., Bengal District Gazetteers: Khulna, Calcutta,1908

---------- *Bengal District Gazetteers : Midnapore*. Calcutta, 1911

---------- *Bengal District Gazetteers : Hooghly*. Calcutta, 1912

---------- *Bengal District Gazetteers : Jessore.* Calcutta, 1912

---------- *Bengal District Gazetteers : 24-Parganas*, Calcutta, 1914

---------- *Bengal District Gazetteers : Murshidabad,* Calcutta, 1914

---------- *Bengal District Gazetteers : Pabna,* Calcutta, 1923

---------- *Bengal District Gazetteers: Faridpur,* Calcutta, 1925

Paterson, J. C. K, *Bengal District Gazetteers Burdwan,* Calcutta, 1910

Sachsy, E. A., *Bengal District Gazetteers : Mymensingh*, Calcutta, 1917

Strong, F.W., *Eastern Bengal District Gazetteers: Dinajpur,* Allahabad, 1912.

Vas,J. A., *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers: Rangpur,* Allahabad, 1911

Westland, J., *A Report on the District of Jessore* : *Its Antiquities, Its History and Its Commerce,* Calcutta, 1874

Ahmed, Shamsuddin, *Inscriptions of Bengal,* Vol. IV, Rajshahi: Varendra Research Museum, 1960

Annual Report on Indian Epigraphy, Delhi: Director-General of the Archaeological Survey of India.

Epigraphia Indica, Vol-. I (1892) to XXXVI (1965-66), Calcutta, Archaeological Survey of India.

Ravenshaw, J. H., *Gaur : Its Ruins and Inscriptions,* London, C, Kagan Paul & Co., 1878

Sanyal, Nirodbandhu., *List of Inscriptions in the Museum of the Varendra Research Society, Rajshahi,* Rajshahi, Varendra Research Society, 1928

সাময়িকী:

Frederick M.Asher, "Vikramsila Mahavihara." *Bangladesh Lalitkala* I, No. 2 (1975).

H. Beveridge, "Old Places in Murshidabad", *Calcutta Review* (1892).

---------- "The Antiquities of Bagura", *JASB (1970).*

H.Blochmann, "Notes on Places of Historical Interest in the District of Hughli", *PASB* (1970).

---------- "Contributions to the Geography and History of Bengal, *JASB,* 42, Pt. I (1873 and 1874),

B. G Bysack,. "The Antiquities of Bagerhat". *JASB,* 36. Pt. I (1867).

M. M. Chakravarti, 'Notes on the Geography of Old Bengal". *JASB* (N.S.), 4 (19O8).

---------- "Bengal Temples and Their General Characteristics". *JPASB(N.S.*\ 5(1909).

---------- "Notes on Gaur and other Old Places in Bengal", *JASB,* 5(1909).

---------- "Pre-Mughal Mosques of Bengal". *JASB* (N.S.), 6 (1910)

A. H. Dani, "A Mughal Mosque at Egarasindur". *JVRM,* 8 (1950).

---------- "The House of Raja Ganesh of Bengal". *JASB,* 18, No. 2(1952).

P. C. Dasgupta, "The Early Terracottas From Tamralipta". *Indian Folklore* (1958).

David McCutchion, "Purba Pakistaner Mandir" [Temples of East Pakistan] (in Bengali), *Itihas,* vol.2 no. 3, Dhaka, 1375 BS (1968), pp. 239-266

Dey, B. and Irwin, J. "The Folk Art of Bengal". *Marg,* I, No. 4 (1946-47).

Ettinghausen, R. "The Character of Islamic Art". *The Arab Heritage,* Edited by Nabih A. Paris. New Jersey: Princeton University Press. 1944.

Firminger, W. K. "Notes on Malda, Gaur and Pandua', BPP(1914).

George Michell, "The Revival of Temple Architecture in Bengal in the late-sixteenth- century", *Journal of Bengal Art*, vol. 2, Dhaka, 1997, p.196

Goetz, Hermann, "Indo-Iranian Art-Indo-Moslem Schools", *Encyclopedia of World Art.* VIII.

---------- "Islamic Art". *Encyclopaedia Britanniea.* Vol. XII,

Gordon, D. H. Early Indian Terracottas", *JESOA*, II,(1943).

Grabar, Oleg. "The Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem". *Art Orientalls*, 3 (1959)

---------- "The Visual Arts", *The Cambridge History of Iran*, Vol. IV. Edited by R. F. Frye. Cambridge : University Press, 1975.

Hallyde, M. "Indo-Iranian Art". *Encyclopedia of world Art,Vol. VIII*

Hasan, S. M. "Some Inter-relations between Persian Isamic and Pre-Mughal Bengal Architecture" *Shilpakata, I* (1978).

Husain, A. B. M, "A Study of the Firuza Minar at Gaur", *JASP*, 8, No. 2 (1963)

---------- "Monuments of Husain Shah's Reign", *Rajshahi University Studies.* 3 (1970).

---------- "Kumarpur Tomb", *JVRM*, I (1972)

---------- "Jahanabad Tomb", *JVRM*, 3 (1974)

---------- "The Ornamentation of the Sultani Architecture in Bengal". *Silpakala-I* (1978).

Husain, Shahanara, "The Terracotta Plaques from Paharpur'' *JASP*, 8, No. 2 (1963).

---------- "The Terracotta Find-spots of Pre-Muslim Bengal", *JASP*, 15, No. 2 (1970).

Isa, Ahmad Muhammad. "Muslims and Taswir", *The Muslim World*, 45(1985)

Khan, M. H. "Potter's Art in Bengal: An Integrated Study", *JIBS*, 8 (1985)

King, L. B. B, "On the Present State of the Ruins of Gaur". (Letter to Government of Bengal, 29 March, 1875). *PASB* (1875)

Kramrischi, Stella, "Indian Terracottas". *JISOA*, 7 (1939).

---------- "Pala and Sena Sculpture" *Rupam*, 40 (1929).

Kuhnel, E. 'Arabesque", *Encyclopedia of Islam.* New Edition, Vol. I.

Latham,A. 'Terracottas of the Ruined Temples of Bengal" *Indian Arts and Letters*, 25 (1951).

Marshall,J. 'The Monuments of Muslim India". *The Cambridge History of India.* Vol. III. Edited by W. Haig. Cambridge : University Press, 1928.

McCutchion, D., "Hindu-Muslim Artistic Continuities in Bengal". *JASP* 13, No 3 (1968)

---------- "Pinnacled Temples of Bengal', *Quest*$_t$ 71 (1971).

---------- "Field Guide to the Ancient Monuments and Museums of East Bengal". *Calcutta Review. 3*$_t$ No. I (1972).

---------- "The Krishnalila on the Temples of Bengal", *JISOA*, NS. 7 (1975-76).

Md. Alamgir, 1993, "The Jor Bangla Temple at Maheswarpasha", *Journal of The Asiatic Society of Bangladesh*, vol. 38, no.2, december pp. 201-214

Lavli Yasmin , Narail Jelar Jor-Bangla Mandir [Jor-Bangla Temples of Narail District] (in Bengali), in Pratnattava, vol. 9, Dhaka June 2003, pp.27-30

Mukherji, S., "The Temples of East Bengal", *Marg*,7, No. 1(1953)

Najma Khan Majlis, "19th Century Zamindar Baris (Manor Houses) of Bangladesh: Some Observations", *Journal of Bengal Art*, vol. 13 & 14, 2008-2009, pp. 151-160

---------- "Stucco Decoration of Some Historical Buildings of Dhaka: An Appraisal (Late Nineteenth-Early twentieth Century)", *Journal of Bengal Art*, vol. 3,1998, pp. 179-186

"An Attempt at the Interpretation of the Themes and Style of Some Terracotta Plaques from Paharpur: Some Suggestion for their Documentation", *Proceedings of International Seminar on Elaboration of An Archaeological Research Strategy for Paharpur World Heritage Site and its Environment (Bangladesh)*, Dhaka: Ministry of Cultural Affairs, Government of Bangladesh and UNESCO, Dhaka

Perween Hasan, 1997, "Reflection on Early Temples Form of Eastern India", in *Journal of Bengal Art*, vol. 2 , Dhaka, pp. 211-12

Piggott, S. "The Earliest Buddhist Shrines". *Antiquity*, 17, No. 65 (1943).

Qader, M. A. "'The Newly Discovered Madrasah Ruins at Gaur and Its Inscription". *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh.* 24-26 (1979-81).

Rashid, M. H. "Bangladesh : A Profile in the Light of Recent Archaeological Discoveries". *Bangladesh Historical Studies*, 3 (1978).

Santra, T. "Late Mediaeval Temples of West Bengal: An Account of Their Architects and Builders". *Bangladesh Lalit-Kala, I,* No. 2 (1975).

Sanyal, H. "Temples of Bengal". *Eastern Railway Magazine* (issues between Feb 1963-July

1964).

---------- "Regional Religious Architecture in Bengal*'. *Marg*, 27 (1974).

---------- "Temple Building in Bengal from the Fifteenth to the Nineteenth Century". *Perspectives in Social Science, I : Historical Dimensions.* Edited by B. De. Calcutta, 1977

Saraswati, S. K., "Temples of Bengal". *JISOA, 2,* No. 2 (1934).

---------- "Indo-Muslim Architecture of Bengal". *JISOA,* 9(1941).

Severine Sanz, 2000. Notes on the Rekha Deul in the Preislamic Bengal, *Pratnattava*, vol. 6, Dhaka, June, pp.73-80

Sutapa Sinha, "Rediscovering Gaur A Medieval Capital of Bengal, *Journal of Asiatic Society of Bangladesh (Hum),* Harun-or-Rashid (ed.), vol. 54 No.1, June 2013, pp. 27-65

---------- "The Gunmant Mosque of Gaur: A Revisit", *Journal of the Asiatic Society,* vol-LV, number: 1-2, 2013 pp. 28-46

Tarafdar, M. R. "Some Aspects of the Mamluk Buildings and Their Influence on the Architecture of the Succeeding Periods", *JASP*, II, No. 2 (1966).

---------- "Notes on Indo-Muslim Architecture". *JASP* II, No.2 (1966).

Tibawi, A. L. "Origin and Character of al-Madrasah", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies,* 20, Pt. II (1962).

Wilber, D. N. "The Development of Faience Mosaic in Islamic Architecture in Iran". *Ars Islamica, 6* (1939).

Wali, M. A. "Archaeological Remains in Rajshahi". *JASB,* 73 (1904).

---------- "The Antiquities of Burdwan". *JPASB* (NS).3 (1913).

Wise, J. "Notes on Sunargaon, Eastern Bengal". *JASB,* 43, No. I (1874).

---------- "The Barah Bhuiyas of Eastern Bengal". *JASB,* 43, No. 2 (1875).

বাংলা প্রবন্ধাবলী:

মমতাজুর রহমান তরফদার, "তোমে পেরেসের বিবরণে বাংলাদেশ", সালাহউদ্দীন আহমেদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১, পৃ. ১৮৪-২০৮

মোঃ শামসুল হক, " ভারতীয় স্থাপত্য ইতিহাসের বাংলার স্থাপত্যের অবস্থান", সালাহউদ্দীন আহমেদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১, পৃ. ২৭৫-৩০৪

মোশাররফ হোসেন, "ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের কতিপয় অলঙ্করণ: উৎস ও ক্রমবিকাশ", সালাহউদ্দীন আহমেদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১, পৃ. ২৪৭-২৬১

আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, "সুলতানী বাংলার স্থাপত্য শিল্প একটি পর্যালোচনা", *ইতিহাস*, ১০ম বর্ষ, ১ম-৩য়, সংখ্যা, পৃ: ২৩-২৪

হিতেশরঞ্জন সান্যাল, "বাঙ্গালীর ধর্মীয় স্থাপত্য চর্চা (পঞ্চদশ -সপ্তদশ শতক)", *ইতিহাস*, ষষ্ঠ বর্স, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রাহায়ণ,১৩৭৯, পৃ.২৬৫-২৮০

কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ", *Rajshahi University Studies, Part-A, Arts & Law*, vol.31, 2003, pp.169-200

---------- "পুটিয়ার দোচালা মন্দির",*আই.বি.এস জার্নাল*, ১০ম সংখ্যা,১৪০৯, পৃ. ১৭-২৪

----------"বাংলার মন্দির স্থাপত্যে মুসলিম প্রভাব", *গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য়সংখ্যা, ১৯৯৭-৯৮, পৃ. ১৭১-১৮৫

----------"পুটিয়ার পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী", *Rajshahi University Studies, Part-A, & Law*, vol.32, 2004, pp. 225-241

----------"বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপাদান", *Rajshahi University Studies, Part-A, Arts & Law*, vol, 33, 2005,pp.54-65

---------- "পুঠিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঃ একটি পর্যালোচনা", *Rajshahi University Studies*, Part-A, Vol. 25, 1997, pp.91-101